~ www.amarboi.com ~

সদত হসন মন্টো

রচনা সংগ্রহ

ভূমিকা ও সম্পাদনা রবিশংকর বল

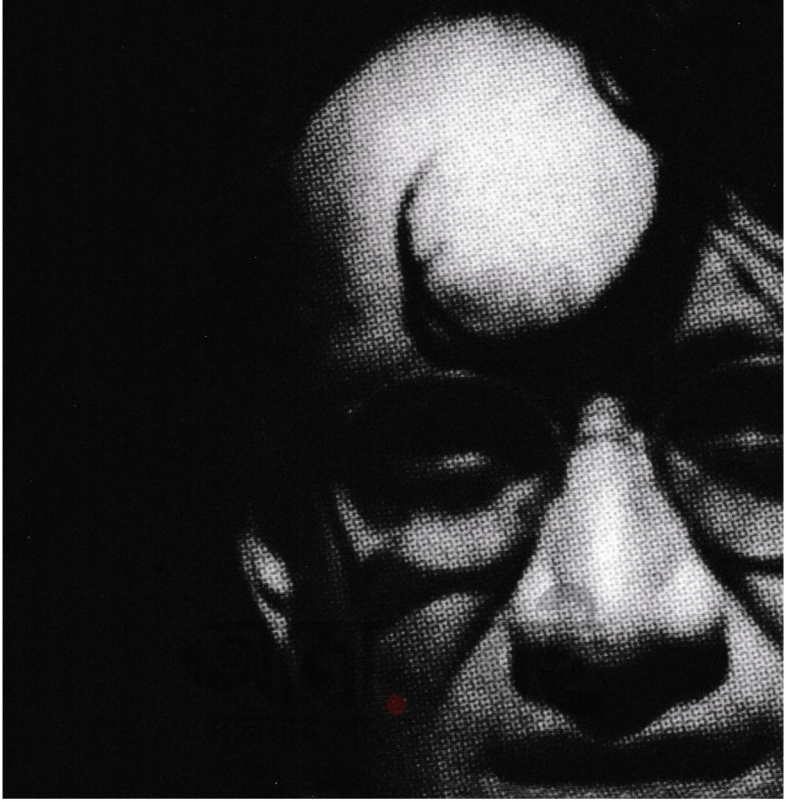

~ www.amarboi.com ~

সদত হসন মন্টো

রচনা সংগ্রহ

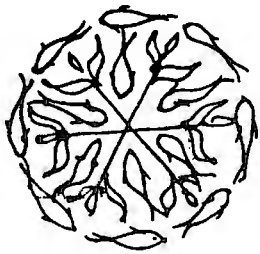

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সদত হসন মন্টো
রচনা সংগ্রহ

ভূমিকা ও সম্পাদনা
রবিশংকর বল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭৩০ ০৭৩

~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

.....

ভারত ও পাকিস্তানের গৃহহীন মানুষদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সম্পাদকের অন্যান্য বই

দশটি গল্প
দোজখ্‌নামা
ছায়াপুতুলের খেলা
এখানে তুষার ঝরে
স্মৃতি ও স্বপ্নের বন্দর
পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মন্টো, একটি ক্ষত

নহ্ গুল-এ নগমহ্ হুঁ, নহ্ পরদহ্-এ সাজ়,
মৈঁ হুঁ অপনী শিকস্ত্-কী-আবাজ়।।
(রাগিণীর আলাপ নই, সেতারের তার নই,
আমি কেবল একটি আওয়াজ, পরাজয়ে ভেঙে পড়ার আওয়াজ।)

—মির্জা গালিব (অনুবাদ : আবু সদীয় আইয়ুব)

সদত হসন মন্টো (১৯১২-১৯৫৫) তাঁর কবরে উৎকীর্ণ করার জন্য একটি সমাধিলিপি লিখেছিলেন : 'এখানে শুয়ে আছে সদত হসন মন্টো। তার সঙ্গে কবরস্থ হয়েছে গল্প লেখার সব শিল্প ও রহস্য ... টন টন মাটির নীচে শুয়ে সে ভাবছে, কে মহান গল্প লেখক : খোদা না সে।' তাঁর সমাধিতে অবশ্য এই কথাগুলি খোদাই করা নেই। কেননা পাকিস্তানের কট্টরপন্থীদের ভয়ে মন্টোর পরিবার লেখাটি উৎকীর্ণ করাননি। মন্টোর চরিত্র ও কথা বলার তির্যক ভঙ্গিটি অবশ্যই এই সমাধিলিপিতে রয়ে গেছে, কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমুখ আমরা লক্ষ না করে পারি না। গল্প লেখাটা তাহলে মন্টোর কাছে, শুধুই সাহিত্যের বিষয় নয়, লেখা অস্তিত্বের এমন এক উন্মোচন যে মন্টোর চ্যালেঞ্জটা অন্য কোনও লেখকের সঙ্গে নয়, স্বয়ং খোদার সঙ্গে। আল্লাহ্ও তো তাঁর কলমে আমাদের নিয়ে কিস্সা লিখে চলেছেন। পবিত্র কোরান-এ তিনি তো আমাদের কাছে কলম হাতে নিয়েই অবতীর্ণ হন। বন্ধু লেখক অহমদ নাদিম কাসিমিকে মন্টো লিখেছিলেন, 'চিন্তার স্তরে আমি এমন এক জায়গায় পৌঁছেছি, যেখানে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, এই সব অর্থহীন। যেখানে মনে হয়, বুঝতে পারছি, আসলে কিন্তু বুঝতে পারছি না। অনেক সময় মনে হয়, সারা পৃথিবী আমার হাতের তালুতে, আবার অনেক সময় নিজেকে এত ফালতু মনে হয়, যেন একটা পিঁপড়ে হাতির শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

অস্তিত্বের এই যে অনির্ণেয় অবস্থা এবং তা থেকে জন্ম নেয় যে-উদ্বেগ, তার মর্মমূলকে অনুভব না-করলে মন্টোর সাহিত্যকে আমরা নানা খোপে আটকে ফেলব, যা এতদিন ধরে চলে আসছে। মন্টোর জন্মশতবর্ষে আমাদের দায়, সবরকম ছাপ্পা থেকে তাঁকে মুক্ত করে একজন নগ্ন মন্টোর মুখোমুখি

~ www.amarboi.com ~

দাঁড়ানো। কুকুর যেভাবে গর্ত খোঁড়ে, গন্ধমূষিক যেভাবে সুড়ঙ্গ তৈরি করে, মন্টো সেভাবেই লিখে গেছেন। কাফ্‌কা সম্পর্কে তাঁদের বইতে জিল দ্যলু ও ফেলি গুতারি লিখেছিলেন, 'How to become a nomad and an immigrant and a gypsy in relation to one's own language? Kafka answers : steal the baby from the crib, walk the tightrope.' উর্দু ভাষার সাহিত্যে মন্টো সত্যিই একজন নোমাড, একজন অভিবাসী, একজন জিপসি। এভাবেই তিনি তাঁর সমসাময়িক রাজিন্দর সিং বেদী, কৃষণ চন্দর, অহমদ নাদিম কাসিমি, ইসমত চুঘতাইদের থেকে আলাদা হয়ে যান। তিনি যে দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটেন, এ-কথা মন্টো নিজেও একবার বলেছিলেন। মন্টোর কথায়, 'স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি ওপরে থাকে আমার শরীরের তাপমাত্রা আর তা থেকেই বুঝবেন, আমার ভিতরে কী আগুন জ্বলছে।' গোপীচাঁদ নারাং তাঁর লেখায় একটি জরুরি কথা বলেছেন, 'Manto was a supreme rebel, he was up against *doxa*, be it in arts, literature, coustoms, manners, social norms, morality or whatever.' যে-কোন মহিমময়তা, অর্থাৎ doxa-র বিরুদ্ধে মন্টো। তাই তাঁকে নিয়ে নিরন্তর কাটাছেঁড়া, বিচারশালার কাঠগড়ায় দাঁড় করানো।

মন্টোর বিখ্যাত গল্প 'বু' (গন্ধ) ১৯৪৪-এ অদব-এ লতিফ-এর বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাহোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'প্রভাত'-এ লেখা হয়েছিল, এই ধরনের গল্প কমবয়সী ছেলেমেয়েদের মন নোংরা করে দেয় এবং জনরুচিকে দূষিত করে। এমনকী পত্রিকার সম্পাদক মন্টোকে তিন বছর জেলবন্দি করার দাবি তোলেন। অন্যদিকে আলি সর্দার জাফরির মতো 'প্রগতিশীল' লেখক বলেন, এইসব গল্প দুর্গন্ধে ভরা, আর সেজন্যই প্রতিক্রিয়াশীল। দেখা যাচ্ছে, কট্টরপন্থী ও মার্কসবাদী 'প্রগতিশীল'— একইভাবে সরব মন্টোর গল্পের বিরুদ্ধে।

১৯৪৮-এ পাকিস্তানে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পর মন্টো আবার গল্প লিখতে শুরু করেন। দেশভাগ তিনি মেনে নিতে পারেননি, ফলে বম্বে থেকে লাহোরে পৌঁছে অনেকদিন মন্টো এক বিকারের মধ্যে থাকেন। নিজেই সেসব দিনের কথা লিখেছেন, 'তিন মাস আমি কিছুই স্থির করে উঠতে পারিনি। মনে হচ্ছিল, একটা পর্দার ওপর একই সময়ে অনেকগুলো ছবি দেখানো হচ্ছে। সব জড়িয়ে গেছে : কখনও বম্বের নানা বাজার আর রাস্তাঘাট, কখনও করাচির ছোট, দ্রুতগামী ট্রাম, আর খচ্চরে টানা দুলকি চালের গাড়ি, কখনও বা লাহোরের রেস্তোরাঁর হৈ-হট্টগোল। বুঝতে পারছিলাম না, আমি কোথায় আছি। সারাদিন চিন্তায় ডুবে আমি চেয়ারে বসে থাকতাম।' এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে মন্টো আবার লিখতে শুরু করেছিলেন। 'খোল দো' গল্পকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল

~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তান সরকার। এমনকী 'নকুশ' নামে যে-পত্রিকা গল্পটি ছেপেছিল, সেটিকেও ছ'মাসের জন্য নিষিদ্ধ করা হল। এরপর 'ঠান্ডা গোস্ত' গল্পের কপালেও জুটল অশ্লীলতার অভিযোগ। ফয়েজ আহমদ ফয়েজের মতো বিদ্রোহী কবি প্রেস অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এই গল্পকে অশ্লীল না বললেও গল্পটি যে সাহিত্যের উচ্চতর লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি, জীবনের মূল সমস্যার কোনও সমাধান দেখাতে পারেনি, এমন কথা বললেন।

বলা যাক, মন্টো ও তাঁর গল্প নিয়ে কেউ সুস্থির থাকতে পারছেন না, এমনকী ফয়েজের মতো কবিও নন। কারো চোখে মন্টো কমিউনিস্ট, কেউ তাঁকে মনে করেন, প্রতিক্রিয়াশীল। একটি ঘটনা তো আরও আশ্চর্যের। ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারিতে বম্বে থেকে প্রকাশিত 'কওমি জঙ্গ'-এর এক নিবন্ধে আলি সর্দার জাফরি 'বু' গল্পের প্রশংসা করেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরেই 'প্রগতিশীল' জাফরি সাহেব একই গল্পকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে আক্রমণ করলেন। কেন? এর পিছনে কী খেলা কাজ করছিল? আমরা জানি না। শুধু বুঝতে পারি, গল্প লেখক মন্টো দিনে দিনে অসহায় হয়ে পড়ছেন, তাঁর কোনও বর্ম নেই। একদিকে বলা হচ্ছে, তাঁর গল্প পাকিস্তানের জাতীয় শান্তি বিঘ্নিত করছে, অন্যদিকে তাঁকে শুধু পাকিস্তান নয়, এই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ গল্প লেখকের শিরোপা দেওয়া হচ্ছে। তাঁকে ঘিরে এই যজ্ঞে ঘি ছিটিয়েছেন মন্টো নিজেও। তির্যক মন্টো কথায় কথায় নিজেকে প্রথম শ্রেণির 'ফ্রড' হিসেবে দাবি করেছেন।

এইসব জাল সরিয়ে, আজ আমরা নগ্ন মন্টো ও তাঁর গল্পের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই। সাহিত্যের বিষয় কী? এই মৌলিক প্রশ্ন মন্টো তোলেন এবং উত্তরও দেন। মানুষের জীবনে দুটি আদি ও অকৃত্রিম ক্ষিদের সঙ্গে সাহিত্যের বিষয়কে জুড়ে দেন তিনি। খাদ্য ও যৌনতা। মন্টো মনে করেন, মানুষের সব কাজ দুটি মৌলিক ক্ষিদে এবং সেই ক্ষিদে থেকে জন্ম নেওয়া দুটি সম্পর্কের মধ্যে ধরা যায়। পেট ও খাদ্যের সম্পর্ক আর মানুষ ও মানুষীর সম্পর্ক। মন্টো লেখেন, "যেসব সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও যুদ্ধ-সম্পর্কিত সমস্যা আজ আমাদের ঘিরে আছে, তাদের সকলের গভীরে রয়ে গেছে এই দুই 'ক্ষিদে'। বর্তমান যুদ্ধের মুখের ওপর থেকে ওড়না সরালে মৃতদেহের পাহাড়ের পিছনে আসলে জাতীয়তাবাদের 'ক্ষিদে' ছাড়া আর কিছুই নেই।" মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকে এভাবেই দেশ-কাল-ইতিহাসের সঙ্গে জুড়ে দেন মন্টো। দেশভাগ নিয়ে মন্টোর গল্প যে তাঁর সমসাময়িক লেখকদের থেকে অন্য পথে চলে যায়, তা এ-কারণেই। ইংরেজি অনুবাদে মন্টোর এক গল্পসংগ্রহের ভূমিকায় এম আসাদুদ্দিনের কথাগুলি আমাদের কাছে জরুরি হয়ে ওঠে।

~ www.amarboi.com ~

আসাদুদ্দিন সাহেব লিখেছেন, 'While other writers on partition employed a narrative strategy that depended on the all too familiar "balancing act" between the different forms of communal violence, Manto's stories look at the violence and barbarity of partition as a plain and simple descent into the heart of darkness inherent in man. He stares violence in the face and is too clear-sighted to seek refuge in the rhetorical consolations of spititual redemption or healing as many of his fellow writers did.' দেশ-ভাগ প্রসূত হিংসা ও বর্বরতা যে মানুষের গভীর অন্ধকার প্রদেশ থেকেই উঠে আসে, মন্টো তা জানেন। তাই তাঁর গল্পে কোন আশাবাদ নেই। 'শরিফন' গল্পের কাসেম তার কন্যা শরিফনকে নিহত দেখে এক হিন্দুকন্যা বিমলাকে যেভাবে হত্যা করে, তার পিছনে কোনও মতাদর্শ নেই, আছে অন্ধ প্রবৃত্তি, প্রতিশোধস্পৃহা। রাজনৈতিক উন্মাদনার সময়ে মানুষের প্রবৃত্তির উন্মাদনাও কেমন ফেটে পড়ে, মন্টোর দেশভাগের গল্পে তারই নানারকম ছবি ধরা আছে।

মন্টো মহিমাকীর্তন অর্থাৎ doxa-তে বিশ্বাস করতেন না, গোপীচাঁদ নারাং তো সে-কথা বলেছেনই। মানুষ মহান এমন কোনও ধারণাতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ যে তাঁর নিজস্বতায় ভাস্বর, এই উপলব্ধি মন্টোর লেখা আড়াইশোর বেশি গল্পে ছড়িয়ে আছে। নিজস্বতার আলোর সঙ্গে তো মহিমার কোনও সম্পর্ক নেই। ফলে মন্টোর মতো লেখককে সব মতাদর্শের বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়। কেন গল্প লেখেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর প্রতিরোধহীন উচ্চারণ : 'লেখকের অনুভূতি যখন আহত হয়, তখনই সে কলম তুলে নেয়।' ক্ষত। ক্ষত থেকে এক একটি গল্পের জন্ম। আজকের লেখক কে? মন্টো বলেন, 'আজকের লেখক তৃপ্তিহীন মানুষ। তাঁর পরিবেশ, ব্যবস্থা, সমাজ, এমনকী নিজের সত্তা নিয়েও তাঁর পরিতৃপ্তি নেই।' যে-মহিলা সারাদিন শস্য পিষে রাতে ভাল ভাবে ঘুমোতে পারে, সে গল্পের নায়িকা হতে পারে না। বরং যে বেশ্যা সারা রাত জেগে থাকে আর দিনে ঘুমনোর সময় হঠাৎ দুঃস্বপ্ন দেখে, তার দরজায় এসে কড়া নাড়ছে তারই বয়স্ক প্রতিমূর্তি, সে-ই রেণ্ডিই মন্টোর নায়িকা। এমনটাই তো বলেন মন্টো।

এইসব গল্প যেন অনেক উদ্‌ভ্রান্ত আত্মার যাত্রাপথের খণ্ডচিত্র। বা কবি ফিরাজ গোরখপুরী যেমন বলেছেন, পাপের নদীর দুই পারে জন্ম নেওয়া উদ্ভিদ। কী এই পাপ? পরিত্যক্ত হওয়া। যেমন তাঁর প্রিয় কবি মির্জা গালিবের ভবিতব্য। মন্টোর প্রায় সব গল্পের চরিত্ররাই তো পরিত্যক্ত মানুষ-মানুষী। তারা কেউ এই সমাজের মূল স্রোতে নেই। হয় তারা দেশচ্যুত, উদ্বাস্তু; নয়তো বেশ্যা, দালাল আর এই মাংস-ব্যবসার সঙ্গে জড়িত মানুষজন। মন্টোর আড়াই শতাধিক গল্পের প্রধান চরিত্র এরাই। তাঁর গল্পে এত বেশ্যা কেন?

~ www.amarboi.com ~

মাহমুদাবাদের রাজাসাহেব এই প্রশ্ন করেছিলেন। মন্টোর উত্তর : 'রেণ্ডিদের কথা বলা যদি অশ্লীল হয়, তবে তাদের অস্তিত্বও অশ্লীল। তাদের কথা বলা যদি নিষিদ্ধ হয়, তবে এই পেশাকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত। রেণ্ডিদের মুছে দিন, তাদের কথাও আর আসবে না।' বেশ্যাদের নিয়ে কোনও গল্পেই মন্টো ভাবাবেগে ডুবে যান না, তাদের ওপর মহত্ত্ব আরোপ করেন না, শুধু চিত্তপ্রসাদের ছবির মতো, কালি-কলমের আঁচড়ে তাদের ফুটিয়ে তোলেন। তাদের ছবি আঁকাই নয়, কোথায় যেন, আমার মনে হয়, এইসব রেণ্ডিদের লাইনেই এসে দাঁড়ান তিনি, তাদের সঙ্গে সংলাপে মুখরিত হয়ে ওঠেন। একই ভাবে কথা বলেন এই উপমহাদেশের গৃহচ্যুত মানুষদের সঙ্গেও। আর অভিযোগের পর অভিযোগ উঠতে থাকে, মন্টো সবকিছু নগ্ন করে দিচ্ছেন। মন্টোর উত্তর : 'এই সমাজের চোলি আমি কেন খুলতে যাব, সে তো আগের মতোই নগ্ন। তবে আমি তা ঢাকতেও চাই না, কেননা কাজটা দর্জির, লেখকের নয়।' মন্টোর গল্পগুলি, আদতে, সোমনাথ হোরের 'ক্ষত' সিরিজের সব ছবি। দেশভাগ ও প্রান্তিক মানুষের জীবনের ক্ষত। এইসব ক্ষত আসলে মন্টো নামের একজন লেখকের আত্মার নানা মুহূর্ত। মন্টো আসলে, এক ক্ষত।

সদত হসন মন্টোর এই রচনাসংগ্রহ-এর পঁচিশটি গল্প, একটি নাটক ও চারটি গদ্য পড়ে পাঠকরা নিজের মতো করে মন্টোকে বুঝে নেবেন। তাই গল্প ও অন্যান্য লেখার বিস্তারিত আলোচনা আমি করতে চাইনি।

শেষে কয়েকটি কথা বলবার। অনেক মন্টো-বিশেষজ্ঞ বলেন, পাকিস্তানে গিয়ে মদ্যপ হওয়ার কারণে মন্টো নাকি তেমন ভাল গল্প লিখতে পারেননি। কিন্তু এই রচনাসংগ্রহের পঁচিশটি গল্পের মধ্যে মাত্র ছয়টি অবিভক্ত ভারতবর্ষে, ১৯৩৪-৪৭ সালে লেখা, বাকি উনিশটি মন্টোর পাকিস্তান বাসকালে (১৯৪৮-৫৫) লিখিত। নাটক এবং অন্যান্য গদ্যগুলিও পাকিস্তান-পর্বেই লেখা। মদ্যপ ছাপ মেরে মন্টোর সৃষ্টিশীলতাকে অগ্রাহ্য করার অপপ্রচার নিশ্চয়ই এতে বন্ধ হবে।

দুই, মন্টোর অনেক অতিপিরিচিত গল্প 'টোবা টেক সিং', 'খোল দো' ইত্যাদি যা আগে বাংলায় অনুদিত হয়েছে, এই সংগ্রহে খুব সচেতন ভাবেই রাখা হয়নি। ছাপ্পাহীন এক অন্য মন্টোকে আমরা খুঁজতে চেয়েছি। তাই 'খালেদ মিঞা', 'বুনো ঝোপের পিছনে', 'শাহদৌলার ইঁদুর', 'ভূত', 'পেরিন', 'বিসমিল্লা' এইরকম অনেক গল্পই এই সংগ্রহে পাওয়া যাবে, যা বাঙালি পাঠক আগে পড়েননি। যেমন পড়েননি মন্টোর আশ্চর্য প্রেমের নাটক 'ঘূর্ণি'। পড়েননি মন্টোর নিজেকে নিয়ে ও নিজের লেখা সম্পর্কে গদ্য। চাচা স্যামকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠিও কি আগে অনদিত হয়েছে? আমরা মন্টোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কার্ডিওগ্রাফির ছবিটাকেই ধরতে চেয়েছি, যা তাঁর নানারকম রচনায় ফুটে ওঠে।

মন্টোর রচনাগুলি যাঁরা অনুবাদ করেছেন, তাঁরা কেউই উর্দু জানেন না, এবং আমিও জানি না, ফলে ইংরেজির ওপরেই ভরসা করতে হয়েছে। অনুবাদকেরা প্রায় সকলেই নামী লেখক-কবি, আবার কেউ কেউ মন্টোর আগ্রহী পাঠক হিসাবে অনুবাদে উৎসাহিত হয়েছেন। তবে প্রায় সব লেখাই বলরাজ মনরা ও শরদ দত্ত সম্পাদিত এবং রাজকমল প্রকাশন প্রকাশিত মন্টোর পাঁচ খণ্ডের হিন্দি 'দস্তাবেজ'-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। অনুবাদকদের আমার ধন্যবাদ জানাই। যা-কিছু ভুল রয়ে গেল এই সংগ্রহে, তার দায় একান্তই আমার। কৃতজ্ঞতা জানাই তরুণ লেখক শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নাট্যকর্মী উমা ঝুনঝুনওয়ালাকে। কবি সুদীপ বসু এই কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। কাজটা যে সহজ ভাবে ক'রে উঠতে পারা গেল, তার জন্য আমার স্ত্রী সীমার সর্বক্ষণের সাহচর্য ও প্রণোদনা কাজ করে গেছে। মন্টো আমার কাছে শুধু একজন লেখক নন, আমার ভালবাসার মানুষ। তাঁর রচনার বঙ্গানুবাদের সম্পাদনা নয়, আমি এই সামান্য সংগ্রহের মধ্যে তাঁকে ছুঁতে চেয়েছি। মন্টোর জন্মশতবর্ষে এমন একটি সংগ্রহ প্রকাশ করার জন্য দে'জ পাবলিশিং-এর সুধাংশুশেখর দে ও শুভঙ্কর দে-কেও ধন্যবাদ জানাই। তাঁরা এই কাজটি আমাকে করতে দিয়ে বাধীত করেছেন। সবশেষে সালাম জানাই মন্টোসাবের আত্মাকে, যাঁর সঙ্গে গত পাঁচ-ছয় বছর আমি সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছি।

ইনশাআল্লা
রবিশংকর বল
আষাঢ়, ১৪১৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

১৯৩৪—'৪৭

গল্প

দশ টাকা ১৭
আমার নাম রাধা ২৮
বাবু গোপীনাথ ৪৪
গন্ধ ৫৬
কালো শালোয়ার ৬২
ওপর, নীচে আর মাঝখানে ৭৪

১৯৪৮—'৫৫

গল্প

খালেদ মিয়া ৮১
বুনো ঝোপের পিছনে ৮৮
পেরিন ৯৬
আল্লার দোহাই ১০২
লাল রেইনকোট পরা মহিল' ১০৭
সিয়া হাশিয়ে ১১৩
কবির কাঁদছেন ১২১
য়াজিদ ১২৫
শরিফন ১৩৪
১৯১৯-এর একটি দিন ১৩৭
ঠান্ডা গোস্ত ১৪৫
একশো মোমবাতির আলোয় উজ্জ্বল এক রাত ১৫০
শাহদৌলার ইঁদুর ১৫৭
সহায় ১৬৩
রাম খিলবান ১৬৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তুতু ১৭৬
সাতটি জাদুফুল ১৮০
মোজেল ১৮৭
বিসমিল্লা ১৯৯

নাটক

ঘূর্ণি ২০৫

প্রবন্ধ

ঝলসানো সূর্যের তাপে ২৩১
মন্টো কে ২৩৪
আমার পাঠকের প্রতি ২৩৮
শ্যামচাচাকে লেখা চিঠি ২৪৪

সদত হসন মন্টো (১৯১২-১৯৫৫) ২৪৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
১৯৩৪—'৪৭

গল্প

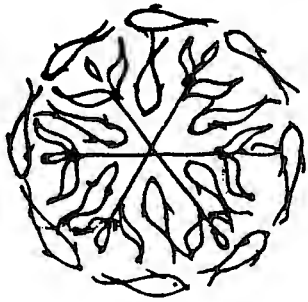

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মন্টো ও শফিয়া বেগম

কন্যার সঙ্গে মন্টো

~ www.amarboi.com ~

সাদত হসন মন্টো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শফিয়া ও কন্যার সঙ্গে মন্টো

সেই তির্যক দৃষ্টি

~ www.amarboi.com ~

লেখায় মগ্ন

মন্টো, বম্বে ১৯৩৮

~ www.amarboi.com ~

দশ টাকা

গলির এক কোণে বসে, ছোট-ছোট মেয়েদের সঙ্গে খেলা করছিল ও। বস্তির মধ্যে, ওর মা ওকে খুঁজে-খুঁজে হন্যে হয়ে যাচ্ছিল। ওদিকে, কিশোরি তাদের ঘরটাতে, অপেক্ষা করছিল, আর, তার জন্য কে যেন চা আনতে গেছিল তখন। বস্তির তিনটে তলার আনাচে কানাচে খুঁজছিল সরিতার মা। মরতে কোথায় যে ঢুকে বসে আছে মেয়েটা! বাথরুমে নয় তো? 'সরিতা—সরিতা', সেখানেও একবার ডাক পেড়ে এল সে। তারপর, বুঝতে পারল, ও বস্তিতেই নেই! সরিতা তখন গলির কোণটাতে ডাঁই-করা আবর্জনার স্তূপের পাশে, বাচ্চা মেয়েগুলোর সঙ্গে মেতে উঠেছে খেলায়।

ওর মা তখন আতঙ্কে। ঘরে বসে অপেক্ষা করছে কিশোরি। কথা মতো, দু-জন লোককেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, যাদের বেশ টাকাকড়ি আছে বলে মনে হয়, বড় বাজারটার মুখে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ওদের, ওরা অপেক্ষা করছে সেখানে। কোথায় উধাও হল সরিতা? সিরসিরে এক আতঙ্ক ছেয়ে ফেলে সরিতার মাকে। পেটখারাপের অজুহাত আর কতবার দেবে! তাছাড়া, সে এখন সেরেও গেছে। গাড়ি চেপে মানুষজন তো আর রোজ-রোজ আসবে না ওদের কাছে! স্রেফ, কিশোরির বদান্যতা যে মাসে একবার কী দু-বার বাড়ি বয়ে এমন খদ্দের নিয়ে আসে। কিশোরির নিজেরই অস্বস্তি লাগে এখানে ঢুকতে। উঠোনে পানের পিক, বিড়ির টুকরো, যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বড় লোকেরা এ-সব জায়গায় পা রাখতে পারে? তবে কিনা ও বেশ চালাকচতুর বলে, বস্তিতে লোক নিয়ে আসে না বটে, বদলে, সরিতাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে, সাজিয়েগুছিয়ে নিয়ে যায় তাদের কাছে। বলে, 'এ-সময়টাই এমন, পুলিশ আর খোচড়দের ভিড়ভাট্টা লেগেই আছে বস্তিতে। সেদিন প্রায় একশজন লাইনের মেয়েকে ধরে নিয়ে গেল ওরা। এই তো, আমার মাথাতেই কেস ঝুলছে একখানা, যা দিনকাল, সবসময় চোখকান খোলা রেখে ধান্দায় নামতে হয়।'

এতক্ষণে বেদম খেঁপে উঠেছে সরিতার মা। সে যখন হনহন করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে

~ www.amarboi.com ~

নামছিল, তলার ধাপে বসে রোজকার মতোই বিড়ির পাতা কুচোচ্ছে রামদি। ওকে দেখে গজগজ করে উঠল সরিতার মা, 'সরিতাকে দেখেছ? কোন চুলোয় যে সেঁধিয়ে বসে আছে! ওহ্! আজ-ই এমনটা হল। একবার খুঁজে পাই, হাড় গুঁড়িয়ে দেব। বুড়োধাড়ি মেয়ে, সারাদিন শুধু হাঁটুর বয়সী বাচ্চাদের সঙ্গে ধেই ধেই করে নেচেকুঁদে বেড়াচ্ছে।'

রামদি, চুপচাপ, বিড়ির পাতা কেটে যেতে লাগল। তাছাড়া, সরিতার মা তো আর ওকে সত্যি-সত্যি শোনাতে চায়নি কথাগুলো। রাগ করে ছুটোছুটির সময় যাকে সামনে পায় তাকেই এসব কথাগুলো উগড়ে দিয়ে চলে যায় ও। কিছুদিন পরপরই রামদিকেও শুনতে হয় এই গজগজানি! সরিতার মা বস্তির মেয়েদের বলেই রেখেছে, তার সরিতাকে সে চাকরি-করা ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে দেবে। আর, সেইজন্যই তো ওকে লেখাপড়া শেখানোর তোড়জোড় এত। মিউনিসিপ্যালিটি সদ্য একটা স্কুল খুলেছে এখানে, সরিতার মার বাসনা, মেয়েকে সেখানে ভর্তি করাবে। সে বলে, 'তোমরা তো জান, দিদি, ওর বাবা সবসময় চাইত, ও লেখাপড়া শিখুক!' এই অবধি বলে ফোঁৎ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরিতার মা, তারপর তার মৃত স্বামীর গল্প শোনাতে বসে সকলকে। শুনে-শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে ওদের। যে-কেউ যদি, রামদিকে একবার শুধু জিগ্যেস করে, 'আচ্ছা, সরিতার বাবা তো রেলে কাজ করত, তা বড়সাহেব যখন ওকে অপমান করল, তারপর কী হল বল তো?', অমনি রামদি গড়গড় করে বলে যাবে, 'তারপর তো সরিতার বাবা রাগে ফেটে পড়ে আর কী! তখনই সাহেবকে বলল, "আমি তোমার চাকর নই, আমি সরকারের চাকরি করি। আমাকে যখন-তখন মেজাজ দেখানোর কোনও এক্তিয়ার নেই তোমার। আর শোন, আবার যদি যা-তা কথা বলেছ আমাকে, একটানে তোমায় চোয়াল উপড়ে নিয়ে গলার নাচে ঢুকিয়ে দেব, হ্যাঁ?" তারপর আর কী, যা হবার তা-ই হল! সাহেব আবার চটেমটে লাল হয়ে সরিতার বাবাকে অপমান করতে লাগল, সরিতার বাবা ধাঁই করে কষে একটা ঘুঁসি মারল বড়সাহেবের মুখে, তখন, সাহেবের মাথা থেকে টুপিটা ছিটকে মাটিতে পড়ে দশটুকরো হয়ে গেল আর সাহেব দিনের আলোতেও চোখেমুখে অন্ধকার দেখতে লাগল। তবে কী না, সাহেব তো আর ফেলনা লোক নয়! তার পায়ে ছিল আর্মিদের বুটজুতো, সপাটে সরিতার বাবার পেছনে এমন একটা লাথি মারল, মাটিতে পড়ে গিয়ে, পিলে ফেটে, ওই রেললাইনের ধারেই বেঘোরে মরে গেল লোকটা। তা, সরকার অবশ্য কেস করেছিল সাহেবের বিরুদ্ধে, কড়কড়ে পাঁচশোটা টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পেয়েও ছিল সরিতার মা। কিন্তু, এমন কপাল! লটারি খেলার সর্বনাশা নেশায় ধরল তাকে, আর পাঁচ মাসের মধ্যেই সব টাকা উড়ে গেল!'

সরিতার মার মুখে এই গল্পটা লেগেই থাকে। যদিও, এটা আদৌ সত্যি না মিথ্যে, তা কেউ জানে না। তাছাড়া, বস্তিতে আলাদা করে ওকে দরদ দেখাবে কে, যেখানে এদের প্রত্যেকের জন্যই দরকার একটু সহানুভূতি। কেউ কারো বন্ধু নয় এখানে। পুরুষেরা, বেশিরভাগ-ই, দিনে পড়ে-পড়ে ঘুমোয়, রাতে জাগে। কাছের কারখানায় রাতের শিফটে কাজ করে ওরা। একসঙ্গে থাকে বটে সবাই, কিন্তু কেউ-ই কাউকে নিয়ে ভাবে না।

~ www.amarboi.com ~

বস্তির সবাই, মোটামুটি, জেনে গেছে, যে, সরিতার মা তার কচি মেয়েটাকে বেশ্যাগিরি করতে পাঠায়। কিন্তু এরা কেউ-ই কারো ভালমন্দে নাক গলায় না, তাই, সরিতার মা যখন আগ বাড়িয়ে বলতে আসে, 'আমার মেয়ে ধোয়া-তুলসিপাতা,' তখনও এরা মুখ বুজে থাকে, প্রতিবাদ করে না কোনও।

একদিন সকালবেলা তুকারাম সরিতার জন্য কিছু আগাম টাকা দিতে এসেছে যখন, সরিতার মা গলা ছেড়ে আর্তনাদ শুরু করে দিল, 'ওমা কী হবে গো, এই জঘন্য লম্পট লোকটার কিছু একটা ব্যবস্থা কর তোমরা। আমার কুমারী মেয়েটাকে নোংরা চোখে চাটছে, হে ভগবান! ওর দুচোখ অন্ধ করে দাও। আর, হ্যাঁ গো, শুনতে পাচ্ছ তুমি, আমি কিন্তু একদিন এর একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়ব। তোমার পীরিতের বরের মাথা আমি জুতোর হিল মেরে ফাটিয়ে দেব। বাইরে যা খুশি করে বেড়াক গে, এখানে তো সভ্যভব্য হয়ে থাকতে হবে, না কি?'

চেঁচামেচি শুনে, তুকারামের টেরা বউ তার ধুতির গিঁট বাঁধতে বাঁধতে, ঝগড়ায় নামতে এগিয়ে এল এবার, 'তুই ডাইনি মাগি, আর একটা কথা বলে দেখ! তোর কুমারি মেয়ে যখন হোটেলের ছোঁড়াগুলোকে চোখ মেরে বেড়ায়, আমরা কিছু দেখতে পাই না, না? তোর বাড়িতে যেসব বাবুরা আসে, তাও আমরা জানি না, ভাবিস? ও রোজ সেজেগুজে বাইরে যায় কেন, শুনি? এরপরও, তুই বলেই এখানে তোর মানসম্মান নিয়ে থাকতে আসিস, যা না, অন্য পাড়ায় উঠে যা না তোরা!'

তুকারামের টেরা বউকে নিয়েও তো রসালো গল্পের অন্ত নেই। কেরোসিন তেলের ডিলার যখন কেরোসিন নিয়ে বস্তিতে আসে, ও তাকে ওদের কামরায় ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়, একথা কে না জানে! সরিতার মা বরাবরই এই ব্যাপারটা চাউর করে বেড়াতে চায়, আজ সুযোগ পেয়ে ঘেন্না-মাখানো গলায় আবার চিল-চিৎকার জুড়ল, 'আর, তোর নাগর, ওই যে কেরোসিনের ডিলার, ঘরে কম করে দু'ঘন্টা খিল এঁটে যে দুজনে বসে থাকিস, করিসটা কী? নাক ডুবিয়ে কেরোসিনের গন্ধ নিস বুঝি, অ্যাঁ?'

সরিতার মা আর তুকারামের বউয়ের মধ্যে এই থুতু-ছোঁড়াছুঁড়ি অবশ্য বেশিদিন জমেনি। তার আগেই, একদিন সরিতার মা দেখতে পেয়ে গেছিল ওর প্রতিবেশিনী নিকষ অন্ধকারে কার সঙ্গে যেন কী একটা লেনদেন করছে! আর, ঠিক পরদিন-ই তুকারামের বউ দেখতে পেল, সরিতা সেজেগুজে একজন পুরুষের সঙ্গে মোটরগাড়ি চেপে চলেছে। ফলে, দুই মহিলার মধ্যে একটা চুক্তি হয়ে গেল, নিঃশব্দে। তাই, আজ যখন সরিতার মা তুকারামের বউকে জিগ্যেস করল, 'মেয়েটাকে দেখেছ নাকি?' টেরা চোখ একটু সরু করে, তুকারামের বউ গলির ও-প্রান্তে তাকিয়ে বলল, 'ওই তো, ময়লার গাদার পাশে, ম্যানেজারের মেয়েগুলোর সঙ্গে খেলছে বসে' বলেই, গলাটা একটু খাদে নামিয়ে ফের বলল, 'কিশোরিকে এইমাত্র ওপরে যেতে দেখলাম যেন, তুমি দেখনি?'

সরিতার মা চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিচু গলায় জবাব দিল, 'সে তো

~ www.amarboi.com ~

ঘরের মধ্যেই বসে আছে, কিন্তু এখন সরিতাকে পাই কোথায়? মেয়েটা একটুও কিছু ভাবে না, বোঝেও না, সারাদিন শুধু খেলে বেড়াচ্ছে।' বলতে-বলতে সরিতার মা ততক্ষণে ময়লার গাদার দিকে এগিয়ে গেছে। সিমেন্টের পেচ্ছাপখানাটার পাশ দিয়ে মাকে আসতে দেখেই সরিতা লাফিয়ে উঠল। ওর মুখচোখের হাসি নিভে গেছে ততক্ষণে। মা খপ করে হাতটা টেনে ধরল ওর, 'বাড়ি চল, তোকে আজ মেরেই ফেলব! এইসব ছাইপাঁশ নিয়ে খেলা করার চেয়ে ভাল কিছু খুঁজে পাস না তুই?' তারপর যেতে যেতে একটু সুর নরম করে বলল, 'কিশোরি এসেছে, সেই কখন থেকে বসে আছে। সঙ্গের মোটরগাড়িতে লোকজনও আছে। যা, তুই চটপট ওপরে গিয়ে সেজেগুজে নে। নীল জর্জেট শাড়িটা পরিস কিন্তু। আর শোন, চুলটা তো পুরো কাকের বাসা হয়ে আছে। তুই আগে জামা বদলে নে, আমি চুল বেঁধে দেব'খন।

বড়লোকেরা গাড়ি চেপে এসেছে শুনলেই আহ্লাদে মন নেচে ওঠে সরিতার। আসলে, গাড়ির চালকের চেয়ে গাড়ির প্রতিই ওর টান বেশি। গাড়ি চাপতে ভারি ভালবাসে ও। রাস্তার খোলা হাওয়ায় মোটরগাড়ি যখন গর্জন করতে করতে ছুটে চলে, আর বাতাসের ঝাপটা এসে ওর মুখে আছড়ে পড়ে, সবকিছুই যেন ঘূর্ণি হয়ে যায় তখন। মনে হয় ঝড় এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নির্জন রাস্তায়।

সরিতার বয়স পনেরো হতে চলল, কিন্তু তেরো বছরের বালিকার মতোই ওর হাবভাব। বড়দের সঙ্গে একটুও সময় কাটাতে ভাল লাগে না, বরং ছোটদের সঙ্গে বোকা-বোকা সব খেলাধুলোতেই ওর আনন্দ। কালো পিচের রাস্তায় চক দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে খুব মজা পায় ওরা। আর, ঘন্টার পর ঘন্টা, এই খেলাতে এমনই মশগুল হয়ে থাকে, যে কেউ দেখলে ভেবে নিতে পারে, পথের ট্রাফিক বুঝি ওদের এই আঁকাবাঁকা রেখার নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত হয়! সরিতা কখনও কখনও বাড়ি থেকে পুরনো বস্তার ফালি নিয়ে আসে, ও আর ওর কচিকাঁচার দল সারাদিন ধরে, একটুও ক্লান্ত না হয়ে টুকরোগুলোর ধুলোবালি সাফ করে, ফুটপাথে বসার জন্য পেতে রাখে তারপর।

সরিতা দেখতে কিছু আহামরি সুন্দরী নয়। ওর চামড়া, একটু ময়লা-হয়ে-আসা গমরঙের, কিন্তু মসৃণ, আর বম্বের জোলো আবহাওয়ার কারণেই বোধহয় বেশ চকচকে। তার পাতলা ঠোঁটদুটো কালচে, তিরতির করে কাঁপতে থাকে, ওপরের ঠোঁটে কুচি-কুচি ঘামের দানাগুলোও কেঁপে ওঠে তখন। দারিদ্র্যে থাকলেও, ও শীর্ণ নয়। ছোটখাটো, মিষ্টি আর সুগঠিত শরীর। দেখে মনে হয়, যা কিছু দুর্দশা, ওর ঝকঝকে চেহারার কাছে এসে থমকে থেমে গেছে। ওর মলিন স্কার্ট যখন হাওয়ায় উড়ে যায়, পথচলতি লোকজন একবার আড়চোখে দেখে নেয়, কী সুশ্রী পায়ের গোছ, পালিশকরা কাঠের মতো চেকনাই! রোমবিহীন, ছোট ছোট রোমকূপ, দেখলে কমলালেবুর কথা মনে হয়, একটু চাপ দিলেই রস ফেটে পড়বে!

হাতগুলোও সুন্দর। গোল-গোল ছাঁদের। শস্তার সেলাই-করা ঝলঝলে ব্লাউজ ঝোলে সেখানে। ঘন লম্বা চুলে নারকেল তেলের চিটচিটে গন্ধ। বেতের মতো চ্যাটালো একটা

~ www.amarboi.com ~

বিনুনি হয়ে আছড়ে পড়ে পিঠের ওপর। সরিতার কিন্তু এই লম্বা চুল নিয়ে বিরক্তির শেষ নেই। খেলাধুলোর সময় চুল নিয়ে নানাভাবে বিব্রত হয়ে পড়ে ও।

সরিতার জীবনে না আছে কোনও উদ্বেগ, না আছে দুশ্চিন্তা। দুবেলা পেটপুরে খেতে পায় ও। ঘরের কাজকর্ম সব মা-ই সামলায়। শুধু, সকালবেলা বালতি ভর্তি করে জল এনে দিতে হয় ওকে, আর, সন্ধেবেলা, একপয়সার তেল কিনে, সেই তেল ভরে বাতি জ্বালতে হয়। অভ্যেস মতো, আপনা আপনি-ই ওর হাত চলে যায় খুচরো পয়সার কাপে। তারপর ও ল্যাম্প নিয়ে নীচে নামতে থাকে।

সত্যি বলতে কী, কিশোরির ঠিক করে দেয়া ধনী লোকেদের সঙ্গে হোটেলে কিংবা আলো-আঁধারি জায়গাগুলোতে মাসের মধ্যে চার-পাঁচবার যে তাকে যেতে হয়, নিছক বেড়ানো ছাড়া এটাকে আর কিছুই ভাবতে শেখেনি সরিতা। অন্য কোনও চিন্তা মাথায় খেলেও না তার। ও হয়তো ভাবে, কিশোরি সব মেয়েদেরই বাড়ি বাড়ি ঘুরে, বড়লোকদের সঙ্গে ঘুরতে পাঠায় তাদের। ওরলির ঠাণ্ডা কনকনে কিংবা জুহুর ভিজে স্যাঁৎসেঁতে বেঞ্চিগুলোর ওপর যা কিছু ঘটে যেতে থাকে, ওর মনে হয়, সব মেয়েদের ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটে। একবার তো সরিতা মাকে জিগ্যেসও করেছিল, 'মা, শান্তা তো এখন দিব্যি বড় হয়ে গেছে, ওকে আমার সঙ্গে পাঠাও না কেন? লোকেরা আমাকে অনেক ডিম খেতে দেয়, আর, শান্তা ডিম খেতে এত ভালবাসে।'

সরিতার মা কোনওমতে উত্তর দিয়েছিল, 'বেশ তো, ও না হয় একবার তোর সঙ্গে যাবে। ওর মা পুনে থেকে ফিরুক আগে!' সুখবরটা শান্তাকে শোনাবার জন্য তর সইছিল না সরিতার, পরদিন ও যখন বাথরুম থেকে বেরোচ্ছে সরিতা ছুটে গিয়ে ওকে জানাল, 'সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, তোর মা পুনে থেকে ফিরলেই তুইও আমার সঙ্গে ওরলি যাবি।' যেন খুব সুন্দর একটা স্বপ্নের বিবরণ দিচ্ছে, এভাবে, শান্তাকে একটু একটু করে রাতের ঘটনাগুলি বলতে থাকে সরিতা, আর, শান্তার মনে হয় সারা শরীর জুড়ে ছোট-ছোট ঘণ্টা বেজে উঠছে। শুনতে-শুনতে, অস্থির হয়ে ওঠে শান্তা, যেন কিছু শোনা বাকি রয়ে গেল তখনও, এমনভাবে ওর কাঁধ খামচে ধরে বলে, 'চল, নীচে বসে-বসে বাকিটা শুনব।' সেখানে, পেচ্ছাপখানার ঠিক পাশে, গিরিধারী, ব্যবসাদার, নারকেলের ময়লা ছোবড়াগুলোকে চটের বস্তার ওপর শুকোতে দিয়েছে যেখানে, অনেক রাত অবধি সরিতা, শান্তা গল্প করে চলে। উত্তেজনায় গায়ে কাঁটা দেয় ওদের।

এখন, ঝটপট, একটা কাপড় ঝুলিয়ে বানানো পর্দার পেছনে দাঁড়িয়ে নীল জর্জেট পরে নিল ও। গায়ে সুড়সুড়ি লাগছিল বটে, কিন্তু ডানা-মেলা পাখির মতো মন উড়ে বসছিল গাড়িতে চাপার ভাবনায়। লোকগুলো কেন এ-ধরনের ব্যবহার করে ওর সঙ্গে, কোথায়-ই বা নিয়ে যায় ওরা ওকে, এ-সব ভাবনা আদৌ জাগে না সরিতার মনে, খালি একটাই চিন্তা, গাড়িতে ওঠা থেকে ওর হোটেলের দরজায় নামা পর্যন্ত কতটুকু-ই বা সময়। হোটেলের ঘরে, চার দেয়ালের মধ্যে বিশ্রী লাগে ওর। ঘরগুলোতে দুটো করে লোহার খাট পাতা থাকে। যেগুলোর একটাও ওর ঘুমোনোর জন্য নয়।

~ www.amarboi.com ~

জর্জেট শাড়ি পরে, কুচির ভাঁজ গুছিয়ে নিয়ে একপলকের জন্য কিশোরির সামনে থামল ও। 'কিশোরি, দেখ দেখ, পেছন থেকে ঠিকঠাক লাগছে তো আমাকে?' উত্তরের অপেক্ষা না করেই এগিয়ে গিয়ে ভাঙা স্যুটকেশটা খুলে ফেলল। ওর মধ্যে, জাপানি পাউডার আর রুজ রাখা থাকে। একটা ধুলোমাখা আয়না বের করে জানলার শিকে ঝুলিয়ে দেয় ও। একটু ঝুঁকে, গালে রুজ আর পাউডারের মিশ্রণ বুলিয়ে নেয়। সেজেগুজে, মুচকি হেসে, প্রশংসা পাওয়ার জন্য কিশোরির দিকে ফিরে তাকায়।

ওর ঝলমলে নীল শাড়ি, যেমন তেমনভাবে ঠোঁটে লেপে-দেয়া লিপস্টিক, পেঁয়াজি রঙের পাউডার-ঘষা কালো গাল, সব মিলিয়ে ওকে এখন দেখাচ্ছে, দেওয়ালির দিন খেলনার দোকানে যেসব রঙচঙে মাটির পুতুলগুলো সাজানো থাকে, তাদেরই কোনও একটার মতো।

সরিতার মা ঘরে ঢুকল। মেয়ের চুল দ্রুত হাতে আঁচড়ে দিতে-দিতে বলল, 'শোন মা, ওদের সঙ্গে ভালভাবে কথা বলবি, যা-যা করতে বলবে, করবি, কেমন? মোটরগাড়ি চেপে এসেছে যখন, নিশ্চয়ই হাতে অনেক টাকাকড়ি আছে।'

কিশোরিকে বলে সে, 'তাড়াতাড়ি পৌঁছে দাও, ওকে। বেচারিদের যে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে—'

বড় বাজারটার প্রায় মুখে, লম্বা একটা কারখানার দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে হলুদ রঙের গাড়িটা। সামনেই একটা ছোট বোর্ড লাগানো আছে, সেখানে লেখা : এখানে প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ। গাড়ির মধ্যে তিনজন হায়দ্রাবাদি নাকে রুমাল চেপে কিশোরির জন্য অপেক্ষা করছে। ওরা চেয়েছিল অন্য কোথাও গাড়ি রাখতে, কিন্তু দেয়ালটা যে বিরাট লম্বা, শুধু তা-ই নয়, তার সর্বত্র জুড়ে রয়েছে পেচ্ছাপের গন্ধ। গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বসেছিল যে, সে-ই সবার আগে দেখতে পেয়ে বন্ধুদের বলল, 'ওই তো কিশোরি আসছে, কিন্তু, সঙ্গে ....', রাস্তার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ও আবার বলল, 'আরে! এ তো দেখছি একটা বাচ্চা মেয়ে, তোরা দেখ, ওই যে নীল শাড়ি-পরা!'

কিশোরি আর সরিতা গাড়ির সামনে এলে, পেছনে বসে-থাকা ছোকরা দু-জন তাদের টুপি খুলে নিল, তারপর সরিতাকে নিজেদের মাঝখানে বসার জন্য জায়গা করে দিল। কিশোরি এগিয়ে গিয়ে, দ্রুত, পেছনে ধাক্কা মেরে সরিতাকে ঠেলে পাঠাল গাড়ির মধ্যে, তারপর দরজা বন্ধ করে, স্টিয়ারিং-এ বসে-থাকা ছেলেটিকে বলল, 'মাপ করবেন, আসলে ও ওর এক বন্ধুর বাড়ি গেছিল, তাই একটু দেরি হয়ে গেল...যাকগে, দেখে নিন বাবু, সব ঠিক আছে তো?' যুবকটি ঘাড় ঘুরিয়ে সরিতাকে দেখে নিয়ে, কিশোরিকে বলল, 'চলবে!' তারপর সিটের পাশে হেলে গিয়ে অন্য জানলা থেকে ফিসফিস করে কিশোরিকে জিগ্যেস করল, 'মেয়েটা কোনও ঝামেলা পাকাবে না তো?'

কিশোরি বুকে হাত রেখে জবাব দিল, 'আজ্ঞে না স্যার, আমি আছি তো!' ছেলেটা এবার পকেট থেকে একটা দু-টাকার নোট বার করে ওর হাতে দিয়ে বলল, 'ফুর্তি মারাও গে যাও!'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিশোরি হাত নেড়ে চলে যেতেই কাফায়ত গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করল।

পাঁচটা বাজে। মোটরগাড়ি, বাস, ট্রাম আর পথচলতি লোকের ভিড়ে বম্বের বাজার একদম গমগম করছে। দুটো জোয়ান লোকের মাঝখানে প্রায় মিশে গিয়ে তার উরুদুটো চেপে রেখে, তার ওপর টানটান করে হাত মেলে সরিতা কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু মাঝপথেই থেমে গেল। আসলে, গাড়িচালক যুবককে ও বলতে চাইছিল, 'ভগবানের দোহাই, আরও জোরে গাড়ি ছোটাও, দম আটকে আসছে আমার।'

অনেকক্ষণ ধরে কেউ কোনও কথা বলছিল না। গাড়ি চালাচ্ছে যে, সে চালিয়েই যেতে লাগল। আর, পেছনের সিটে বসে-থাকা বাকি দু-জন হায়দ্রাবাদি ঘাবড়ে গিয়ে, ক্রমাগত লম্বা কালো কোটের আড়ালে ঘামতে থাকল, জীবনে প্রথম কোনও অল্পবয়সী মেয়ের গায়ে লেপ্টে বসে আছে ওরা! এই মেয়েটা ওদের একেবারে নিজস্ব, কোনও ভয় বা উদ্বেগ ছাড়াই ছুঁয়ে দেখতে পারবে ওকে!

স্টিয়ারিং-এ বসে-থাকা ছেলেটি, গত দু বছর হল, বম্বেতে। দিনের আলোয় কিংবা রাতের অন্ধকারে সরিতার মতো বহু মেয়ে দেখেছে সে। তাই, ততটা ঘাবড়াচ্ছে না। ওর এই হলুদ গাড়িতে চড়ে নানা ধরনের মেয়েরাই ঘুরে বেড়িয়েছে এর আগে। হায়দরাবাদ থেকে ওর যে-দুই বন্ধু এসেছে, তার মধ্যে শহাব বম্বে পুরো ঘুরে দেখতে চায়। কাফায়ত বন্ধুর আমোদ আহ্লাদের জন্যই কিশোরিকে একজন মেয়েছেলে যোগাড় করার কথা বলেছিল। তারপর, আনোয়ারকেও কাফায়ত জিগ্যেস করেছিল, 'কি রে, তোরও একটাকে চাই নাকি?' লজ্জা ঝেড়ে ফেলে, আনোয়ার কিছুতেই মুখ ফুটে বলে উঠতে পারেনি, 'হ্যাঁ, চাই!'

কাফায়ত আগে দেখেনি সরিতাকে। আসলে, কিশোরি বেশ কিছুদিন পর একটা নতুন মেয়ে নিয়ে এল। তাছাড়া কাফায়ত এমনিও ওর দিকে কোনও মনোযোগ দিচ্ছে না, কারণ, পুরুষমানুষ একসময়ে শুধুমাত্র একটাই কাজ করতে পারে! ও যদি এখন মেয়েটার দিকে ঘন-ঘন তাকায়, তাহলে গাড়ি চালাবে কী করে? শহর ছেড়ে গাড়ি যখন শহরতলির রাস্তা ধরল, সরিতা প্রায় লাফিয়ে উঠল! কোনও মতে দম চেপে বসেছিল এতক্ষণ, আচমকা গাড়ির গতি বেড়ে যাওয়ায়, হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা নামে মুখে এসে পড়ায় এবার তার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন! হাত পা নেচে উঠল, আঙুলগুলো তিরতির করে কাঁপছে! এক মনে পেছনে ছুটে-যাওয়া গাছগুলোকে দেখতে লাগল সে।

আনোয়ার আর শহাবেরও আড়ষ্টভাব কেটে গেছে অনেকটা। শহাব ভাবল, মেয়েটার ওপর ওর-ই তো প্রথম দাবি, তাই আস্তে করে সরিতার পেছনে হাত ছোঁয়াল সে। সুড়সুড়ি লেগেছে বলে সরিতা ধপাস করে গিয়ে পড়ল আনোয়ারের কোলের ওপর। হলুদ গাড়িটার জানলা ছাপিয়ে দূরে, অনেকদূরে ভেসে গেল ওর হাসির শব্দ। আবার শহাব হাত বাড়ানোর চেষ্টা করতেই, ঝুঁকে পড়ে, আরও জোর হাসিতে ভেঙে পড়ল সরিতা। আনোয়ার, জড়োসড়ো হয়ে শুকনো মুখে গাড়ির এককোণে, চুপচাপ সিঁটিয়ে বসে আছে তখন।

~ www.amarboi.com ~

শহাবের মন নেচে উঠল খুশিতে। ও কাফায়তকে বলল, 'এটা তো একটা খুদে বিচ্ছু, দেখছি!' বলতে-বলতেই দ্বিগুণ উৎসাহে সরিতার উরুতে চিমটি কেটে বসল শহাব। আর, আনোয়ারকেই হাতের নাগালে পেয়ে সরিতা ওর কান মলে দিল। হাসিতে ফুলে ফেঁপে উঠল মোটরগাড়ি।

যদিও সামনের আয়নায় সবই ফুটে উঠছে, তবু কাফায়ত বারবার পেছনে তাকিয়ে দেখছিল। মজায়, খুশিতে গাড়ির গতি বাড়িয়েই চলছিল সে।

সরিতার হঠাৎ ইচ্ছে হল, গাড়ির বনেটের ওপর, যেখানে একটা লোহার পরি রাখা আছে, সেখানে এবার চেপে বসবে সে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে, শহাব তাকে টান দিল পেছন থেকে। কিন্তু সরিতা ততক্ষণে কাফায়তের গলা জড়িয়ে ধরেছে। অকারণেই, কাফায়ত চুমু খেল ওর বাহুতে, সরিতার সারা শরীর কেঁপে উঠল, একলাফে গিয়ে বসল গাড়ির সামনের সিটটাতে। বসেই, কাফায়তের টাই নিয়ে খেলা করতে করতে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, 'এই, তোমার নাম কী গো?'

'আমার নাম? উমম্, আমার নাম কাফায়ত।' বলে, ও হাত বাড়িয়ে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিল সরিতার হাতে। ওর নাম নিয়ে আর একটুও মাথা না ঘামিয়ে, নোটটা কুঁচকে-মুচকে সরিতা সটান চালান করে দিল ব্লাউজের মধ্যে। ছেলেমানুষের মতো খুশিতে ঝলমল মুখে ও বলল, 'তুমি না খুব ভাল লোক। তোমার টাইটাও বেশ দেখতে!'

এই ঘটনার পর, সরিতার সবকিছুই ভাল লাগতে শুরু করে দিল। মনে হল, যা কিছু কালো, সেগুলোও সব আলো হয়ে উঠবে এখনই! আর এমনটাই ঘটছে তখন...মোটরগাড়ি বেদম জোরে ছুটছে...ঘূর্ণির মতে ঘুরপাক খাচ্ছে চারিপাশ।

হঠাৎ, গানও গেয়ে উঠতে ইচ্ছে হল ওর, খুব। কাফায়তের টাই নিয়ে খেলা করা থামিয়ে গলা ছেড়ে গেয়ে উঠল ও, 'তুমি ভালবাসা শিখিয়েছ আমাকে, ঘুমিয়ে-পড়া এই মনটাকে জাগিয়ে তুলেছ!'

কিছুক্ষণ, এই সিনেমার গান চলল। তারপর, পিছন ফিরে ও ছায়ার মতো চুপ করে বসে-থাকে। আনোয়ারকে নিয়ে পড়ল এবার। 'আরে! তুমি একটাও কথা বলছ না কেন? গল্প কর, গান কর আমাদের সঙ্গে!' আবার সরিতা লাফ মেরে পেছনের সিটে ফিরে এল। শহাবের চুলে বিলি কাটতে-কাটতে বলল, 'এখন আমরা সবাই মিলে গান গাইব, ওই যে, দেবিকারানি যে গানটা গাইত, "হৃদয়ের জঙ্গলে আমি যে একটি চড়ুই, ছোট্ট ছোট্ট গান গাই..." ঈশশ্, দেবিকারানি কী সুন্দর, তাই না?'

সরিতা এবার উরুর নীচে হাতদুটো চেপে রেখে, চোখ পিটপিট করে বলল, 'অশোককুমার আর দেবিকারানি, দুজনে খুব কাছে কাছে দাঁড়িয়ে, দেবিকারানি বলছে, "বনের মধ্যে আমি, একটি চড়ুই, ছোট্ট ছোট্ট গান গাই", অশোককুমার তখন বলছে কী, "তবে গাও।"...'

সরিতা গানটা গেয়ে উঠল।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ও থামতে, শহাব কর্কশ গলায় গান জুড়ল, 'আমিও বনের পাখি হব, বনে-বনে গান গেয়ে যাব।'

দ্বৈতসংগীত শুরু হয়ে গেল ওদের, হঠাৎই। সঙ্গত করার ধরনে কাফায়ত মাঝে মাঝেই হর্ন বাজাচ্ছিল। সরিতা হাততালি দিচ্ছিল। আর তখন, তার সরু গলার সোপ্রানো, শহাবের হেঁড়ে গলার গান, হর্নের প্যাঁক-প্যাঁক, হাওয়ার তুমুল শব্দ ও ইঞ্জিনের গর্জন, সব মিলেমিশে অর্কেস্ট্রা বেজে উঠল যেন!

সরিতা, শহাব, কাফায়ত, সবাই খুশি। ওদের খুশি-খুশি ভাব দেখে, আনোয়ারও খুশি হতে চাইছিল। আগেকার বাধো-বাধো হাবভাবের জন্য নিজেই অনুতাপ করছিল মনে মনে। ওর ঘুমিয়ে-পড়া মন, জেগে উঠে, এই উল্লাসের শরিক হতে চাইছে এখন।

গান গাইতে-গাইতে, আনোয়ারের টুপিটা খুলে মাথায় পরে নিল সরিতা। সামনের সিটে লাফ দিয়ে চলে গিয়ে পুঁচকে আয়নার তাকিয়ে দেখতে লাগল, কেমন মানিয়েছে ওকে। আনোয়ার ভাবছিল, 'এই টুপিটাই কি আমি পরেছিলাম, এতক্ষণ?'

কাফায়তের পুরুষ্টু উরুতে একটা চাপড় মেরে সরিতা বলল, 'আচ্ছা শোন, তোমার শার্ট-প্যান্ট, আর, ওই টাইটা যদি আমি পরে নিই, আমাকে একদম ভদ্রলোকদের মতো দেখাবে তাই না?'

এ-সব শুনতে-শুনতে, কী করবে কিছুই ভেবে না পেয়ে, আনোয়ারের কাঁধ খামচে ধরে শহাব বলল, 'তুই একটা আস্ত গাধা!' একমুহূর্তের জন্য আনোয়ার নিজেও মনে-মনে বলল, 'ঠিক কথা।'

কাফায়ত তখন সরিতাকে জিগ্যেস করছে, 'তোমার নাম কী?' টুপির ফিতেটা চিবুকে গলিয়ে নিতে-নিতে সরিতা উত্তর দিল 'আমার নাম? আমার নাম তো সরিতা।'

শহাব পেছনের সিট থেকে বলে উঠল, 'তুমি তো মেয়ে নও সরিতা, জ্যান্ত একটা ইলেকট্রিক তার!'

আনোয়ারও কিছু একটা বলতে চাইছিল, তো, তার আগেই সরিতা চেঁচিয়ে গান ধরল, 'প্রেমনগরীতে আমি ভাবি বাসা বাঁধি... চুলোয় যাক এ পৃথিবীঈঈঈ।'

পৃথিবীর সেই টান, ওদের সকলকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছিল। সরিতার বিনুনি-বাঁধা চুল, খুলে গিয়ে, অবাধ, উদ্দাম, কালো ধোঁয়ার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। সরিতা আজ বেজায় খুশি।

সবাই খুশি। আনোয়ারও মেতে উঠেছে এখন। গান থেমে যাবার পরও তার রেশ থেকে গেছিল গাড়ির মধ্যে, আর, ওরা সকলেই ভাবছিল, যেন, খুব জোর বৃষ্টিপাত, থমকে থেমে গেছে হঠাৎ!

'আর কোনও গান?' কাফায়ত জানতে চাইল সরিতার কাছে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরেকটা। ওরকম একটা সিনেমার গান, যা লোকজনের মুখে-মুখে চলে।' পেছন থেকে জবাব দিল শহাব।

সরিতা আবার শুরু করল, 'বাড়িতে এসেছে আজি বসন্ত। আমি পথ হাঁটছি, মাতাল!'

~ www.amarboi.com ~

গাড়িও প্রায় মাতাল, তখন। টাল খেতে-খেতে পথ চলছিল। রাস্তা যেখানে সোজা গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখানেই সমুদ্র। সূর্যাস্তের পর কনকনে হাওয়া বইছে এবার।

গাড়ি থেমে-যাওয়া মাত্র, সরিতা দরজা খুলল। লাফিয়ে নেমে পড়ে সমুদ্রের তীর বরাবর দৌড়তে শুরু করে দিল। কাফায়ত আর শহাবও ওর পেছন-পেছন ছুটতে লাগল। খোলা হাওয়া, সামনেই মস্ত সমুদ্র, আর বালি ফুঁড়ে গজিয়ে-ওঠা বিশাল সব তালগাছ...সরিতা বুঝতে পারছিল না, আসলে, কী চাইছে সে! আকাশে মিলিয়ে যেতে? সমুদ্রে মিশে যেতে? কিংবা, এতটাই উঁচুতে উড়তে, যেখান থেকে তালগাছগুলোর মাথা দেখা যায়।...আর তারপর, আবার সেই পাগল হাওয়া, ইঞ্জিনের গর্জন, গাড়ির তুমুল গতি, হর্নের আওয়াজ...আহ! সবকিছু আজ তার কাছে আনন্দের।

তখন, তিন হায়দ্রাবাদি যুবক ভিজে বালিতে বসে-বসে বিয়ারের বোতল খুলছে। কাফায়তের হাত থেকে বোতল ছিনিয়ে নিল সরিতা, 'দাঁড়াও! দাঁড়াও! আমি ঢেলে দিচ্ছি।'

গেলাস উপচোল ফেনায়। ফেনা দেখে উত্তেজনা জেগে উঠল সরিতার, বাদামি ফেনায় আঙুল ডুবিয়ে সে জিভে ঠেকাল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তিতকুটে স্বাদে মুখ কুঁচকে উঠল ওর। হো-হো করে হেসে উঠল কাফায়ত, শহাব। হাসতে হাসতেই আড়চোখে দেখে নিল কাফায়ত, আনোয়ারও হাসছে এখন।

পাক্কা ছ-বোতল বিয়ার খেল ওরা। কিছুটা পেটে ঢুকল, কিছুটা ফেনা হয়ে বালিতে পড়ল। সরিতা গান গাইছে তো গাইছেই! এক মুহূর্তের জন্য আনোয়ারের মনে হল, সরিতাও যেন বিয়ার দিয়ে বানানো! সমুদ্রের জোলো হাওয়ায় ওর কালো চিবুক ভিজে গেছে। বেদম খুশি হয়েছে মেয়েটা। আনোয়ারও এতটাই খুশি, ও চাইছিল গোটা সমুদ্রটাই বিয়ারে ভরে যাক। সরিতাকে সঙ্গে নিয়ে ও তাতে সাঁতার কাটবে।

দুটো খালি বোতল ঠোকাঠুকি করে, জোরে, বাজাচ্ছিল সরিতা। শব্দে, মজা পাচ্ছিল সবাই, ওরা আবার হাসতে শুরু করে দিল সকলে মিলে।

হাসাহাসির মধ্যেই সরিতা কাফায়তকে বলল, 'চল, আমরা গাড়ি চালাব এবার।'

সবাই উঠে পড়ল। ভিজে বালিতে বিয়ারের খালি বোতলগুলো গড়াগড়ি খাচ্ছে। ওরা ছুটতে-ছুটতে গাড়িতে গিয়ে বসল। আবার, তুমুল হাওয়া, গাড়ির হর্ন, কালো ধোঁয়ার মতো, সরিতার, ভেসে-বেড়ানো-চুল! গান চলছে। হাওয়া কেটে এগিয়ে চলল মোটরগাড়ি। সরিতা গান গাইতে লাগল। এবার সে পেছনের সিটে, আনোয়ার ও শহাবের মাঝখানে। আনোয়ারের মাথা এদিক থেকে ওদিকে টাল খাচ্ছিল। খুব দুষ্টু মেয়ের মতো সরিতা শহাবের চুলে বিলি কেটে দিতে লাগল, আর, দেখতে-দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল শহাব। সরিতা, আনোয়ারের দিকে তাকাল। সে-ও ঘুমে কাদা! সরিতা ওদের মাঝখান থেকে উঠে সামনের সিটে গিয়ে বসে পড়ল।

ফিসফিস করে বলল, 'তোমার দু-বন্ধুকেই তো ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি, এবার তোমাকে দি?'

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুচকি হাসি হাসল কাফায়ত। 'তাহলে গাড়ি চালাবে কে, শুনি?' সরিতাও হাসল।' ও তো এমনি-এমনিই চলবে।'

অনেকক্ষণ, ওরা নিজেরা গল্পগুজব করল। বাজার এসে গেল এক সময়। তারপর যখন দেয়ালটা পার হচ্ছে ওরা, যেখানে বোর্ডে লেখা আছে, 'এখানে প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ', সরিতা বলল , 'আমি এখানেই নেমে যাব।'

গাড়ি থামল। কাফায়ত কিছু বলার কিংবা করার আগেই সরিতা লাফ দিয়ে নেমে এল বাইরে। ওকে হাত নেড়ে, হাঁটতে শুরু করে দিল। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে, চুপ করে বসেছিল কাফায়ত। সারাদিনের কথাই ভাবছিল বোধহয়।

সরিতা, থেমে, ঘুরে দাঁড়িয়ে, ফিরে এল আবার। ব্লাউজের মধ্যে থেকে দশ টাকার নোটটা বার করে, ওর পাশে রেখে দিল।

কাফায়ত ঠাট্টার সুরে বলল, 'এটা আবার কী, সরিতা?'

'এটা...মানে, এই টাকাটা আমি নেব-ই বা কেন?' উত্তর দিয়েই ছুটে চলে গেল সে। কাফায়ত তখনও চেয়ে আছে নোটটার দিকে।

পিছনে ফিরে তাকাল কাফায়ত। এই দোমড়ানো-মোচড়ানো নোটটার মতোই, সেখানে, পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে ওরা দু-জন, শহাব আর আনোয়ার।

ভাষান্তর : চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার নাম রাধা

এটা সেই সময়কার গল্প, যখন যুদ্ধের দামামা এত সমারোহে বেজে ওঠেনি। আজ থেকে প্রায় আট-ন বছর আগের কথা, এখনকার মতো নয়, জীবনের টানাপোড়েনগুলো তখনও অনেকটা শান্তভাবে মেনে নিতাম আমরা।

আমি একটা ফিল্ম-স্টুডিওতে কাজ করতাম। মাস গেলে মাইনে পেতাম চল্লিশ টাকা। বেশ নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কেটে যাচ্ছিল। বেলা দশটা নাগাদ স্টুডিওতে ঢুকে পড়তাম। নিয়াজ মহম্মদ ভিলেনের বেড়ালটাকে দু-পয়সার দুধ খাওয়াতাম, সস্তা সিনেমার জন্য সস্তা সংলাপ লিখতাম, বুলবুল-বঙ্গাল নামে পরিচিত এক বাঙালি অভিনেত্রীর সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ারকি করতাম একটু, তারপর তখনকার সবচেয়ে বড় চিত্রপরিচালক দাদা গোরেকে তেল মারতে বসে যেতাম। আর, শেষে রোজকার মতো বাড়ির পথ তো ধরবই!

স্টুডিও-মালিকের নাম হার্মজি ফ্রামজি, নাদুসনুদুস, লাল টুকটুকে গাল, পেটুক ও মদখোর একটা লোক। হিজড়ে-মার্কা এক মাঝবয়সী অভিনেত্রীর প্রেমে সে ছিল পাগল। তাছাড়াও অভিনয়ে নামতে-আসা প্রত্যেকটা নতুন মেয়ের বুকের মাপ নিয়ে সে কল্পনাবিলাসে ডুবে থাকত। আরও একজন মুসলমান মেয়েছেলে আসত এখানে। সে এসেছিল, কলকাতার বউবাজার অঞ্চল থেকে। একই সঙ্গে পরিচালক, সাউন্ড-রেকর্ডিস্ট, আর চিত্রনাট্যকারের সঙ্গে চক্কর চালাত, যাতে করে এদের সকলেই ওকে সুনজরে দেখে।

সেই সময়, জঙ্গলসুন্দরী-র শুটিং চলছে। নিয়াজ মহম্মদ ভিলেনের হিংস্র বেড়ালগুলোকে, খোদা জানেন, কর্মচারীদের চাপে রাখার জন্য কিনা, কোথা থেকে আমদানি করা হয়েছিল এদের, দু-পয়সার দুধ খাওয়ানোর পর, তখন আমার কাজ চোখ বুজে সংলাপ লিখে-যাওয়া। এই ফিল্মটার মাথামুণ্ড কিছুই আমি জানি না, শুধু মাছিমারা কেরানির মতো, কাগজকলম হাতে দাঁড়িয়ে থেকে, ছাইপাঁশ যা লিখতে বলা হত, লিখে যেতাম। হ্যাঁ, যাতে পরিচালক মশাই বুঝতে পারেন, তাই উর্দুতে লিখতে হত।

~ www.amarboi.com ~

সে যাই হোক, জঙ্গলসুন্দরী-র শুটিং চলছে যখন, একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, হার্মজি ফ্রামজি নাকি এই সিনেমার খলনায়িকার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য এক নতুন মুখ আনছে। নায়কের রোল অবশ্য আগেই রাজকিশোরকে দেওয়া হয়েছে।

রাজকিশোর রাওয়ালপিণ্ডির ছেলে। সুন্দর, পেটানো চেহারা। ওর চোখে পড়ার মতো পুরুষালি শরীরটার কথা সবাই বলাবলি করত। ওর খেলোয়াড়-সুলভ, সুগঠিত দেহ নিয়ে আমিও ভাবতাম বটে, কিন্তু আমাকে তা টানত না মোটেই। আসলে আমি রোগা-পাতলা মানুষ। এরকম চেহারাই আমার পছন্দ হত।

রাজকিশোরকে আমি ঘৃণা করতাম, এমনটা কিন্তু নয়। খুব কম লোককেই, জীবনে, আমি ঘেন্না করেছি। তবে কিনা ওকে যে আমি খুব একটা পছন্দ করতাম তাও তো নয়, এর কারণগুলো ধীরেসুস্থে আপনাদের বলব আমি।

রাজকিশোরের কথা বলার ধরন ও উচ্চারণ একেবারেই রাওয়ালপিণ্ডির বাসিন্দাদের মতো। বেশ লাগে আমার। পাঞ্জাবি ভাষাটার মধ্যে যে সুর আর সৌন্দর্য আছে, রাওয়ালপিণ্ডির লোকজনের মুখের ভাষাতে সেটা আরও বেশি করে ধরা পড়ে। ধরুন, সেখানকার কোনও স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে কথা বলছে, মনে হবে... মনে হবে যেন, যে শুনছে, মিষ্টি আমের রসে মুখ ভরে যাচ্ছে তার। রাজকিশোরের ক্ষেত্রে অবশ্য আমটামের উপমা টানার কথা বলছি না, আর সেটা হয়তো ওকে বিশেষ পছন্দ করি না বলেই।

আগেই বলেছি, সুন্দর, সুঠাম চেহারার যুবক সে। কিন্তু, ব্যাপারটা যদি সেখানেই থেমে থাকত, চুকে যেত। আমারও আপত্তি থাকত না কোনও। কিন্তু সমস্যা হল, নিজের চেহারা নিয়ে এতটাই সচেতন ছিল রাজকিশোর আর এতটাই লোক-দেখানো হাবভাব, আমি একদম সহ্য করতে পারতাম না।

সুগঠিত চেহারা থাকা এক জিনিস, আর সেটা দেখিয়ে অন্যদের কাছ থেকে ফায়দা লুটতে গেলে ব্যাপারটা অসুখের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। রাজকিশোর ভয়ঙ্করভাবে এই অসুখে ভুগত। ওর থেকে দুর্বল চেহারার লোকেদের অনাবশ্যকভাবে শরীর দেখিয়ে মুগ্ধ করত ও।

হ্যাঁ, আমি নিজেই রুগ্ন, দুর্বল। একটা ফুসফুস তো হাওয়া প্রায় টানতেই পারে না। কিন্তু, খোদা জানেন, আমি কখনও অন্যদের আমার এই দুর্বলতা দেখিয়ে বেড়াই না। আমি কি জানি না, শক্তি দেখিয়ে মুগ্ধ করার মতো, অসুস্থতা দেখিয়েও সুযোগ নেওয়ার মতো, অন্যায়? আর, সৌন্দর্য? আমি মনে করি, নিভৃতে তার তারিফ করতে হয়। লোক জানিয়ে, হইচই করে নয়।

বেশি-বেশি সুস্বাস্থ্যও কিন্তু রোগের মতো। রাজকিশোর টগবগে ফুটন্ত যৌবন নিয়ে, অশ্লীলভাবে, এখানে-সেখানে প্রদর্শনী করে বেড়াত। এই ধরুন, আপনার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে একই সঙ্গে হাতের পেশি ফোলাতে শুরু করে দিয়েছে। মনে করুন, স্বাধীনতার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে, সে কিন্তু সেখানে

~ www.amarboi.com ~

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ততক্ষণে খাদির কুর্তার বোতাম খুলে ফেলেছে, সবাই যাতে চওড়া বুকের খাঁচাটা দেখতে পায়।

খাদির কুর্তার কথা বলতেই মনে পড়ে গেল, রাজকিশোর একজন একনিষ্ঠ কংগ্রেস-সমর্থক। তাই, খাদি পরে। যদিও আমার সন্দেহ আছে, ওর দেশপ্রেমের তুলনায় নিজের প্রতি প্রেম, অনেক বেশি।

অনেকেই ভাববেন, রাজকিশোরকে নিয়ে এভাবে বলাটা আমার ঠিক হচ্ছে না! স্টুডিওর ভেতরে-বাইরে সকলেই শুধু যে রাজকিশোরের চেহারার ভক্ত তাই নয়, তারা পছন্দ করে ওর মতামত, ওর সারল্য, সেই সঙ্গে রাওয়ালপিণ্ডির মিষ্টি-টানে কথা বলা তো আছেই।

বেশিরভাগ অভিনেতার মতো, ও মোটেই অন্যদের প্রতি উদাসীন, কিংবা ধরাছোঁয়ার বাইরের মানুষ নয়। কংগ্রেসের সমাবেশ থাকলে, রাজকিশোর সেখানে একপায়ে খাড়া। সাহিত্য সমাবেশগুলোতেও ও থাকবেই! এমনকী, প্রতিবেশী, কিংবা পরিচিতদের বিপদে-আপদে ওর নিজের ব্যস্ত সময়ের থেকে সময় বের করে নিয়ে ও তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

সিনেমার প্রযোজকরাও ওকে, ওর খাঁটি স্বভাবের জন্য কদর করে। তাদের কথা না-হয় বাদই দিলাম, সাধারণ লোকজনের কাছেও রাজকিশোর একজন নীতিপরায়ণ মানুষ। সিনেমার লাইনে কাজ করবে অথচ বদনাম থাকবে না একফোঁটাও, এ তো আর সোজা কথা নয়। রাজকিশোর সফল অভিনেতা বটেই, কিন্তু এইসব বিরল গুণের জন্য মানুষের মনে ওর জায়গা অনেকটাই উঁচুতে।

সন্ধেবেলা, নাগপাড়ায়, পানের দোকানের বাইরে, আড্ডা মারতে-মারতে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে কেচ্ছার গল্প ফেঁদে বসে সবাই। দেখা যায় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে আছে। কিন্তু রাজকিশোরের প্রসঙ্গ উঠলেই, শ্যামলাল পানওয়ালা খুব কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, 'জানেন, মন্টোসাহেব, আমাদের রাজভাই হল গিয়ে এমন এক অভিনেতা, যার ধবধবে পায়জামায় ছিটেফোঁটাও কাদা লেগে নেই।'

পানওয়ালা কি ওকে 'রাজভাই' বলে ডাকে নাকি? হবেও বা। আমি অবাক হওয়া ছেড়ে দিয়েছি, আজকাল। আসলে, 'রাজভাই'-এর জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও তো সাধারণ লোকের কাছে বিশাল হয়ে পৌঁছয়। ওর আয়-ব্যয়ের হিসেব পর্যন্ত, খোলা-পাতার মতো। বাবাকে কত টাকা দেয়, অনাথাশ্রমে দান করে কত, নিজের খরচাপাতির জন্য-ই বা কত রাখবে, মুখস্থ সকলের।

শ্যামলাল একদিন গল্পের ছলে আমাকে বলেছিল, রাজভাইয়ের না কি সৎমা-র সঙ্গেও খুব ভাল সম্পর্ক। অথচ যখন ওর হাতে কোনও টাকা পয়সা নেই, খুব দুর্দিন চলছে, ওর বাবা অর সৎমা মিলে ওকে ক্রমাগত উৎপীড়ন করে গেছে তখন। তারপর, যখন সময় ফিরল, ও কিন্তু তাদের প্রতি কর্তব্য করতে ভুলে গেল না। ওদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কী না

~ www.amarboi.com ~

করল...বিশাল ঘরবাড়ি, চাকরবাকর। রোজ সকালে রাজ ওর সৎমাকে দেখতে যায়, প্রণাম করে, বাবার সামনে বাধ্য ছেলের মতো মাথা নিচু করে দাঁড়ায়, মুখ থেকে কোনও কথা খসলেই, সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করে। আল্লা জানেন, এসব শুনলেই কেন যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে যায় আমার।

আগেই বলেছি, সেভাবে তো ঘেন্নাও করি না ওকে। আর, ঘেন্না করার অবকাশ-ই বা ও রেখেছে কোথায়! যখন লোকে কেরানিদের নিতান্ত হেলাফেলা করে, সেসব সময়েও ও আমার পাশে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্পগুজব করে গেছে। কী করে যে বোঝাই আমি, সবসময় একটা সংশয় তাড়া করে বেড়ায় আমাকে, মনের অন্ধকার কোণগুলোতে মাঝেমাঝেই বিদ্যুতের মতো চিড়িক মেরে ওঠে, যে রাজ আসলে সবটাই ভান করে যাচ্ছে। ওর পুরো জীবনটা, আসলে, দু-নম্বরি। এটা আমি কাউকেই বলে উঠতে পারব না। এই যে সবাই ওকে দেবতার মতো পুজো করে, এতেই জ্বলে পুড়ে মরি আমি।

রাজের বউ আছে। চারটে বাচ্ছা আছে। খুব যথাযথ স্বামী। দায়িত্বপরায়ণ বাবা। এমন নিখুঁত একটা ঢাকনা দিয়ে ঢাকা ওর জীবন, সেটা খুলে ফেলে, কালো দিকটা দেখানোর কোনও উপায়ই রাখেনি ও।

যেমন দেখতে, তেমনই ওর স্বভাবচরিত্র। তবু, কেন যে আমি সংশয়ে কাটাচ্ছি সারাক্ষণ।

কতবার নিজেই নিজেকে ধমক দিয়েছি। মনে হয়েছে, নিশ্চয়ই আমারই মধ্যে গলদ আছে। বিশ্বসুদ্ধ লোক ওকে নিয়ে এত মুগ্ধ, আমারও তো সেভাবে ওর দিকে আঙুল তোলার কিছু নেই। কী আসে যায়, ওর ঝাঁ-চকচকে দেহ-সৌষ্ঠব নিয়ে নিজেই মজে থাকে যদি। আমার, অমন একখানা চেহারা থাকলে, আমিও হয়তো একই হাবভাব দেখাতাম।

অন্যরা রাজকিশোরকে যে চোখে দেখে, আমি সে-চোখে ওকে দেখে উঠতে পারিনি কখনও, উল্টে উত্যক্ত হয়েছি ওর ব্যবহারে। হয়তো, কিছু একটা বলতে গেছে, আমি যথারীতি সেটা পছন্দ না-করে, তীব্র নখরাঘাত করেছি। আমাদের এই অশান্তির পালায় অনিবার্য ভাবে একটা মুচকি হাসি দিয়ে ছেদ টেনেছে ও। আমার মুখ তত-ই বিস্বাদে ভরে গেছে। আরও বিরক্ত হয়েছি আমি। বদনামের ছিটেফোঁটাও ছোঁয়নি ওকে। বউ ছাড়া অন্য কোনও মেয়েকে জড়িয়ে ভালমন্দ কোনও কথাই ওর সম্পর্কে বলেনি কেউ। এটাও একটা ব্যাপার, সব অভিনেত্রীদেরই ও 'বোন' বলে ডাকত। ওরাও ওকে 'ভাই' বলেই সম্বোধন করে এসেছে বরাবর। কিন্তু, আমার মনে প্রশ্ন জাগত, এত ঘনিষ্ঠতা দেখানোর কি প্রয়োজন আছে? ভাইবোনের সম্পর্ক তো, একান্ত ব্যক্তিগত কিছু। সেখানে সব মেয়েদেরই ঘটা করে 'বোন' বলে ডেকে ও কি ঘোষণা করতে চাইছে, 'রাস্তা বন্ধ', কিংবা 'এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ' এমনতর কিছু?

কোনও মেয়ের সঙ্গে যৌন-সম্পর্কে তুমি যদি না-ই যেতে চাও, তা এত চেঁচিয়ে বলার কী আছে? বউ ছাড়া, অন্য মেয়ে নিয়ে তুমি না-ই ভাব যদি, তা এত করে বিজ্ঞাপন দিয়ে

~ www.amarboi.com ~

বোঝাতে হবে নাকি? এসবের কিছুই বুঝি না আমি। এই না-বোঝাটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি অস্বস্তিতে ফেলত!

যাই হোক, জঙ্গলসুন্দরীর শুটিং চলছে। স্টুডিও-চত্বর সরগরম। এক্সট্রা অভিনেত্রীদের আসা-যাওয়া, আর, তাদের সঙ্গে আমাদের হাসি-মশকরা লেগেই আছে।

একদিন সকালবেলা, আমরা যখন নিয়াজ মহম্মদ ভিলেনের ঘরে বসে গুলতানি মারছি, মেকআপ আর্টিস্ট, যাকে 'ওস্তাদ' বলে ডাকি সবাই, সে এসে খবর দিল, খলনায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবে যে-নতুন মেয়েটা, সে নাকি এসে গেছে, কাজও শুরু করে দেবে। এসময় কাজের চাপ কম থাকায় আমরা ঝিমিয়ে পড়ছিলাম প্রায়, গরম চায়ের মতো এই খবরটা এসে পড়ল। নতুন কোনও মেয়ে এলেই স্টুডিওপাড়া চনমনে হয়ে ওঠে সবসময়। আমরাও হুড়মুড় করে নিয়াজ মহম্মদ ভিলেনের আস্তানা খালি করে মেয়েটাকে দেখতে ছুটলাম সকলে।

সন্ধেবেলা হার্মজি ফ্রামজি যখন, তবলচি ঈশার রুপোর পানের ডিবে থেকে দুখিলি সুগন্ধী পান তার বিরাট গালের মধ্যে ঠেসে, অফিস থেকে বিলিয়ার্ড রুমের দিকে সবে পা বাড়িয়েছে, তখনই আমরা একঝলক, মেয়েটাকে দেখতে পেয়ে গেলাম।

ওর গায়ের রং কালো। এটুকুই শুধু বুঝতে পারলাম। একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে করমর্দন সেরে, খুব দ্রুত, স্টুডিও-র গাড়িতে উঠে চলে গেল। দৌড়ে, নিয়াজ মহম্মদের কাছে গেলাম। সে-ও শুধু পুরু দুটো ঠোঁট দেখতে পেয়েছে। আর, ওস্তাদ, সম্ভবত, কিছুই দেখতে পায়নি, মাথা নেড়ে বিড়বিড় করছিল, 'পোড়াকপাল আমার...', যার মানেটা খুব সুখকর কিছু নয়, আর কী।

চার পাঁচদিন কেটে গেল। নতুন মেয়েটা স্টুডিওতে আসছে না আর। বোধহয় পাঁচ কি ছয়দিন হবে, আমি চা খেয়ে গুলাবের হোটেলের বাইরে পা বাড়িয়েছি, সোজা ওর মুখোমুখি পড়ে গেলাম।

আমি সবসময় মেয়েদের আড়চোখে দেখতে ভালবাসি। পাশ থেকে, হয়তো একটুখানি মুখের আভাস দেখে নিলাম, তা কোনও মেয়ে সটান আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালে, আমি হয়তো চিনতেই পারি না তাকে। তো, এখনও আমরা মুখোমুখি হওয়াতে, ভাল করে বুঝতে পারলাম না। পায়ের দিকে তাকালাম অবশ্য। কায়দা-করা নতুন চটি পরেছিল একটা।

ল্যাবরেটরি থেকে স্টুডিও অবধি পথ, অসংখ্য নুড়ি পাথরে বাঁধানো। ফলে, জুতো সবসময়ই পিছলে যেতে চায়। ও, যেহেতু, পেছনে-না-বাঁধা চটি পরে রয়েছে, ফলে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল বেশ।

এই দেখা হওয়ার পর, মিস নীলমের সঙ্গে একটু একটু করে ভাব জমে উঠল আমার। স্টুডিওর লোকেরা অবশ্য, আমাদের এই ঘনিষ্ঠতার খবর, কিছুই জানত না। ওর আসল নাম রাধা। আমি জিগ্যেসও করেছিলাম একবার, এমন একটা মিষ্টি নাম সে ছুঁড়ে ফেলে

~ www.amarboi.com ~

দিল কেন। ও উত্তর দিল, 'এমনি।' তারপর, আবার বলল, 'এমন একটা ভাল নাম, সিনেমার সঙ্গে জড়াতে চাই না আমি।'

তা বলে, মোটেও ভাববেন না যেন, যে, ও খুব ধার্মিক। না, না, ও একেবারেই ধর্মভীরু কিংবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়। আরে, আমিও তো অত খেয়াল না করেই, কোনও কিছু লেখার শুরুতে ৭, ৮, ৬ এই সংখ্যাগুলো লিখি, মানে বিসমিল্লা বসিয়ে দি। রাধারও সেরকম! নামটার প্রতি অকারণেই একটা বিশেষ দুর্বলতা ছিল ওর।

এখন থেকে, ও নীলম নামেই পরিচিত হতে চায় বলে, এই নামটাই লিখব।

বেনারসের এক বাঈজির মেয়ে নীলম। ওখানকার, আঞ্চলিক টান ছিল ওর কথায়। ভারি মিষ্টি শোনাত। আমার নাম সদত, কিন্তু ও সবসময় ডাকত 'সদক' বলে। আমি একবার বলেছিও ওকে, 'নীলম, তুমি তো সদত উচ্চারণ করতেই পার, তবে, শুধরে নাও না কেন?'

ওর কালো ঠোঁটে একচিলতে হাসি ফুটে উঠল, 'একবার আমি ভুল করলে, সেটা ঠিক করি না আর।'

আমার মনে হয় না, স্টুডিওতে যেসব সাধারণ অভিনেত্রীদের ভিড় লেগে থাকত, তাদের কারো মধ্যে ওর মতো বৈশিষ্ট্য চট করে খুঁজে পাওয়া যায়। সারাক্ষণ, অন্যদের মতো হা-হা, হি-হি করত না। ওর এই গাম্ভীর্য নিয়ে নানা কথাবার্তা চলত সকলের মধ্যে, কিন্তু এটাই ওকে মানাত সব থেকে বেশি।

ওর কালো চামড়ায় রুজের মতো বোলানো থাকত একটা গম্ভীর ভাব। ওর চোখের মধ্যে, ঠোঁটের প্রান্তে লেগে-থাকা বিষাদ, আর পাঁচটা মেয়ের থেকে আলাদা করে চিনিয়ে দিত ওকে।

আমার তো ভেবে অবাক লাগত, এমন একটা মেয়েকে কীভাবে জঙ্গলসুন্দরী-তে খলনায়িকার ভূমিকায় বেছে নেয়া হল। ও তো আদৌ চটুল, লাস্যময়ী নয়। সিনেমার সেটে যেদিন প্রথম ওকে আমি দেখলাম, শরীরের বিশেষ-বিশেষ জায়গায় আঁটোসাঁটো অন্তর্বাস-পরা অবস্থায়, খুব খারাপ লেগেছিল। অন্যের মনোভাব ও চট করে বুঝে নিতে পারত, তাই আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বলল, 'পরিচালক জানাল, তোমাকে তো ভাল মেয়ের অভিনয় করার জন্য নিইনি, তো, এগুলোই পরতে হবে। আমিও মুখের ওপর বলে দিলাম, এগুলো পরার চেয়ে বরং ন্যাংটো হয়ে আপনার সঙ্গে সেটে ঘুরে বেড়াই।'

'তা, পরিচালক এটা শুনে কী বললেন?'

একটা মৃদু হাসি খেলে গেল ওর পাতলা ঠোঁটে। 'কী আর বলবেন? আমার খোলা শরীরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেলেন বোধহয়। এইসব নোংরা পুরুষেরা নিতান্ত নির্বোধ। যা পরে আছি, তাই দেখেই তো ওদের চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার কথা।'

ওর এই ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত কথার আরও অনেক নমুনা দিতে পারি আমি। কিন্তু তার বদলে আমি সরাসরি মূল ঘটনাগুলোতে চলে আসতে চাই, যাতে গল্পটা সম্পূর্ণ করতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বম্বেতে বর্ষা আসে জুন মাস নাগাদ, আর চলে প্রায় সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। প্রথম দু-আড়াই মাস এমন নাজেহাল অবস্থা হয় যে স্টুডিওতে কাজ করাই প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। জঙ্গলসুন্দরীর শুটিং শুরু হল এপ্রিলের শেষ দিকটায়। যখন বৃষ্টি শুরু হল, তখন আমাদের তৃতীয় সেট প্রায় শেষ। একটা ছোট দৃশ্য বাকি ছিল, যেটাতে কোনও সংলাপ নেই বলে বৃষ্টি সত্ত্বেও কাজ চালিয়ে যাওয়া গেল। কিন্তু এটা শেষ হওয়ার পর বেশ কিছুদিনের জন্যই বসে গেলাম আমরা।

স্টুডিওর লোকজনের হাতে গালগল্প করার অঢেল সময়, সারাদিন গুলাবের দোকানে চা খেয়েই কাটিয়ে দিতাম আমি। যে-ই হোটেলে ঢুকত, দেখতাম ভিজে সপসপ করছে। মাছিগুলোও বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে, ভেতরে ভনভন করে বেড়াত। অসম্ভব নোংরা, চারপাশ। চা-ছাঁকার ন্যাকড়া ঝুলছে একটা চেয়ারে, অন্যটায় পেঁয়াজ কাটার ছুরি, কিছুই কাটার নেই, তাই পড়ে আছে। আঁশটে গন্ধ বেরোচ্ছে সেটার থেকে। গুলাব সাহেব কাছেই দাঁড়িয়ে তার মাংসখেকো দাঁত থেকে ভাঙা-ভাঙা বোম্বাই উর্দু উগরে দিচ্ছে কাকে যেন... 'না, আমি... এখান থেকে যাব না,... এখান থেকেই, হ্যাঁ...মস্ত বড় বাস্ট...আপ...ওহ! এত বিরাট মূর্তি, পাখায় ধাক্কা লেগে যাবে তো...', একমাত্র গুলাব সাহেবের শ্যালক হার্মজি ফ্রামজি ছাড়া, ইডেলজি সহ সব নায়িকারাই এই হোটেলের করোগেটেড ছাদের নীচে একবার না একবার দাঁড়িয়েছে এসে। নিয়াজ মহম্মদকে তো দিনের মধ্যে অনেকবারই তার পোষা বেড়াল চুন্নি আর মুন্নির জন্য আসতে হয় এখানে।

রাজকিশোরও একবার এসে ঘুরে যায় রোজ। দরজায় তার বিশাল পেশিবহুল চেহারাটা দেখলেই আমি বাদে আর সকলেরই চোখে উৎসাহ ফুটে ওঠে। ছোট অভিনেতারা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, চেয়ার এগিয়ে দেয়। ও বসলে, চারপাশে মথের মতো ঘুরঘুর করে। কোনও এক এক্সট্রা-অভিনেতা ওর পুরনো অভিনয়গুলো নিয়ে প্রশংসা জুড়ে দেয় হঠাৎ। রাজকিশোর নিজেও, ওর স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে ফিল্মজগতে আসার ইতিহাস বলতে শুরু করে তখন। এসব আমার শুনে শুনে মুখস্থ। ও আসামাত্রই আমি হ্যালো আর গুডবাই প্রায় একসঙ্গে বলে কেটে পড়ি সেখান থেকে।

এক বিকেলে, বৃষ্টি থেমেছে সদ্য, নিয়াজ মহম্মদের বেড়ালগুলোকে দেখে ভয় পেয়ে হার্মজি ফ্রামজির অ্যালসেশিয়ান দু পায়ের মাঝখানে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে আসছে গুলাব হোটেলের দিকে, আমি দেখতে পেলাম, নীলম আর রাজকিশোর একটা মউলসারি গাছের তলায় কথা বলছে। কথা বলতে বলতে একটু একটু দুলছে রাজকিশোর, যেমনটা ও করে থাকে, মন দিয়ে যখন কিছু একটা বলছে, তখন।

নীলম আর রাজকিশোরের দেখা কবে, কেমনভাবে হয়েছিল ঠিক মনে করতে পারছি না, কিন্তু এটা জানতাম, ফিল্মজগতে আমার আগে থেকেই নীলম রাজকিশোরকে চিনত। এক আধবার ওর সুন্দর চেহারা নিয়ে দু-একটা ছেঁদো মন্তব্যও করেছে আমার কাছে।

আমি যখন গুলাব হোটেল থেকে বেরিয়ে রেকর্ডিং রুমের গাড়িবারান্দা অবধি গেছি,

~ www.amarboi.com ~

দেখতে পেলাম রাজকিশোর তার চওড়া কাঁধ থেকে খাদির ব্যাগটা নামিয়ে একটা মোটা নোটবুক বার করছে। আমি জানি, ওটা ওর ডায়েরি।

প্রতিদিন কাজকর্মের পর, সৎমা-কে প্রণাম পর্ব সেরে, শুতে যাবার আগে ও মন দিয়ে ডায়েরি লেখে। পাঞ্জাবি ভাষা ভালবাসলেও ডায়েরি লেখে কিন্তু ইংরেজিতেই, যাতে অন্যদের দেখতে সুবিধে হয়। কোথাও রবীন্দ্রনাথের মতো শিল্পসুষমা, কোথাও-বা গান্ধীজির ধরনে রাজনৈতিক ভাষা, আবার শেক্সপীয়রের নাটকের প্রভাবও আছে কোনও-কোনও লেখায়। আমার কিন্তু মনে হয়, এতকিছু মিলেমিশে গিয়ে, লেখকের নিজস্বতাই তো খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও। এই ডায়েরি হাতে পেলে, আপনার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে, গত দশ-পনেরো বছর ব্যাপী রাজকিশোরের জীবনকথা। কত টাকা সে দান খয়রাত করেছে, কত টাকা গরিব-দুঃখীকে দিয়েছে, কোন কোন সভা সমিতিতে গেছে, কখন কী জামাকাপড় পরেছে কিংবা পরেনি, সব আছে এতে। আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস, ওর কাছ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা ধার নিয়ে আমি আজও ফেরত দিইনি, এরও এন্ট্রি আছে এই ডায়েরিতে। ফেরত দিইনি, কারণ টাকা ফেরত দেয়ার বিষয়টা ও কখনও ডায়েরিতে লিখে রাখবে না।

যাই হোক, ডায়েরি খুলে, সে যেন কী একটা পড়ে শোনাচ্ছিল নীলমকে। এতদূর থেকেও ওর সুন্দর ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে আমি বুঝতে পারছিলাম, শেক্সপীয়রের ভঙ্গিতে ও ঈশ্বরের বন্দনাগান গাইছে। মউলসারি গাছটার তলায়, সিমেন্টের বাঁধানো বেদিতে চুপচাপ বসে আছে নীলম। রাজকিশোরের এই পাঠ, ওর মনে রেখাপাত করছে বলে তো মনে হল না আমার। বরং সে তার লোমশ বুকের দিকে তাকিয়ে আছে। কুর্তার বোতাম খোলা। ওর বাদামি চামড়ার গায়ে ফুটে ওঠা কালো লোমগুলো দিব্যি দেখাচ্ছিল তখন।

স্টুডিও আজ ধুয়ে মুছে সাফ করা হয়েছে। নিয়াজ মহম্মদের বেড়াল দুটোও স্নান করেছে আজ। কাছেই একটা বেঞ্চিতে বসে নরম থাবা দিয়ে মুখ পরিষ্কার করছে ওরা। নীলম আজ একটা ধবধবে সাদা জর্জেট শাড়ি পরে আছে। কালো বাহুদুটিকে ঘিরে সাদা ব্লাউজের হাতা, একটা দারুণ চোখ-টানা বৈপরীত্য ফুটিয়ে তুলেছে, সব মিলিয়ে।

ওকে এত অন্যরকম দেখাচ্ছে কেন আজ?

এক মুহূর্তের জন্য, এই প্রশ্নটা আমার মনে জেগে উঠল। ওর অশান্ত চোখের দিকের তাকিয়ে, পরক্ষণেই, উত্তর খুঁজে পেলাম আমি। ও প্রেমে পড়েছে। আমাকে চোখের ইঙ্গিতে কাছে ডাকল নীলম। এটা-সেটা কথাবার্তার পর, রাজকিশোর চলে গেলে, নীলম আমার দিকে তাকাল, 'আজ তুমি আমার বাড়ি যাবে?'

ছটার মধ্যেই আমরা ওর বাড়ি পৌঁছে গেলাম। ঢুকেই ও ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সোফায়। আমার দিকে একবারও না তাকিয়ে বলল, 'তুমি ভুল ভাবছ।'

ওর কথার নিহিতার্থ বুঝতে পেরে, আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'কী ভাবছি, জানলে কেমন করে?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ম্লান একটা চোরা হাসি খেলে গেল ওর পাতলা ঠোঁটে। 'কারণ, আমরা দু'জনেই যে এক-ই কথা ভাবছিলাম। হ্যাঁ, তুমি হয়তো বেশিদূর এগোওনি, কিন্তু আমি গভীর ভাবে ভাবতে ভাবতে বুঝতে পারলাম, আমরা দুজনেই ভুল।'

'যদি বলি, আমরা দুজনেই ঠিক?'

সোফায় বসে ও বলে উঠল, 'তবে তো আমরা দুজনেই নির্বোধ।' বলতে বলতেই ছায়া ঘনিয়ে এল ওর মুখে। 'সদক, আমি কি ছেলেমানুষ, যে, আমার মনে কী ঘটে চলেছে, তার কিছুই আমি জানি না? আমার বয়স কত হল, বল তো?'

'বাইশ।'

'একদম ঠিক। কিন্তু তুমি এটা জান না, দশ বছর বয়স থেকে আমি ভালবাসা চিনেছি। দশ থেকে ষোল, এই কয়েকটা বছর প্রেম আমাকে ভয়ঙ্করভাবে আঁকড়ে ধরেছিল। তার ফল ভুগছি এখন, দেখতে পাচ্ছো না তুমি?'

আমি, নিশ্চল তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। সে ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'আমাকে বিশ্বাস করছ না, কেমন? জানি তো, হৃদয়টাকে খুলে দেখালেও বিশ্বাস করবে না তুমি! অথচ, তোমাকে যে মিথ্যে বলবে, একমাত্র ভগবান-ই বাঁচাতে পারে তাকে। শোন। জেনে রাখ, আমার প্রেমে পড়ার কখনও কোনও সম্ভাবনা নেই আর। ব্যস্। এইটুকুই বলব শুধু...' কথার মাঝখানে নিষ্পন্দ হয়ে গেল নীলম। আমিও কিছু বলছিলাম না। কারণ এক উৎকট দুশ্চিন্তায় ডুবে আছে ও। হয়তো-বা আমাকে বলা, 'এইটুকু'-র কথাই ভাবছে বসে-বসে।

আবার একটুক্ষণ পরে, গোপন, ফিকে হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। ওর বিষণ্ণ মুখে, অপরাধীর ভাবও ফুটে উঠল যেন। সোফা থেকে লাফ দিয়ে নেমে ও বলতে শুরু করল, 'আমি এইটুকুই বলতে চাই শুধু, যে, এটা প্রেম নয়। কী, তা আমি জানি না, কিন্তু তোমাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি...'

'তার মানে', ওর কথা কেটে তখনই আমি বললাম, 'তুমি নিজেকে নিজে নিশ্চিন্ত করতে চাও?'

সে আবার তেড়েফুঁড়ে উঠল, 'হাঁদা কোথাকার। এভাবে কথা বলতে হয়? তোমাকে নিশ্চিন্ত করার দরকারটাই বা কীসের শুনি? হ্যাঁ, নিজেকে নিজে নিশ্চিন্ত করতে চাইছি বটে। কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠছি না যে। শোন, তুমি আমাকে সাহায্য করবে একটু?' আমার পাশে এসে বসে, নিজের কড়ে আঙুলটা জোরে চেপে ধরে আমাকে জিগ্যেস করল, 'রাজকিশোরকে কেমন লাগে, তোমার? মানে আমি জানতে চাইছি, ওর মধ্যে আমার চোখে পড়ার মতো কিছু আছে কি?' কড়ে আঙুলটা ছেড়ে, এবার সে একটার পর একটা অন্য আঙুলগুলো চেপে ধরতে লাগল।

'ওর কথাবার্তা আমার পছন্দ নয়। অভিনয় পছন্দ ন[illegible]রি আমার ভাল লাগে না। সারাক্ষণ শুধু হাবিজাবি বকে যাচ্ছে।'

বিরক্তমুখে উঠে দাঁড়াল নীলম, 'কী যে হয়েছে আমার, জানি না। কিন্তু আমি চাই,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটুক। ধুলো উড়ুক। উত্তেজনা বাড়ুক। আর শেষকালে, ঘামে কাদা হয়ে নেতিয়ে পড়তে চাই আমি।' হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'সদক, আমাকে কেমন মেয়ে বলে মনে হয় তোমার?'

হাসলাম। 'বেড়াল আর স্ত্রীলোক আমার ভাবনার বাইরের বিষয়।'

'কেন?' প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল ও।

একটু সময় নিয়ে ভেবে বললাম, 'আমাদের বাড়িতে একটা বেড়াল ছিল, বুঝলে? বছরে একবার তার কান্নাকাটি আর মিউমিউ-র ধুম পড়ে যেত। একটা হুলোবেড়াল এল, আঁচড়ে পাঁচড়ে এমন রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটাল দুজনে, সে বলে বোঝানো যাবে না। কিন্তু, সেই আইবুড়ো মেনিবেড়াল চারচারটে ছানা বিয়েলো তারপর।'

নীলম এমন মুখবিকৃতি করল, যেন, কী একটা অখাদ্য খেয়ে ফেলেছে সে। 'থুঃ', থুতু ছিটিয়ে বলল, 'তুমি সত্যিই একটা জঘন্য নোংরা লোক।' তারপর একটু এলাচ চিবিয়ে মুখমিষ্টি করে নিয়ে আবার শুরু করল, 'ছেলেমেয়ের কথা ভাবলেই আমার আতঙ্ক হয়। থাকগে, তারপর?'

নীলম তার পানের বাটা খুলে সরু-সরু আঙুল নেড়ে-চেড়ে আমার জন্য পান সাজতে বসল। খুদে মতো একটা চামচ দিয়ে রুপোর কৌটো থেকে নানারকমের পেস্ট আর পাউডার বার করে, খুব যত্ন করে পানের পাতায় ছড়িয়ে দিল। ভাঁজ করে, তিনকোণা পান বানিয়ে আমার হাতে দিল সে। 'সদত, কী মনে হয় তোমার? বলো', ফাঁকা চোখ মেলে চেয়ে রইল কেমন।

'কী জানতে চাইছ?'

জাঁতিতে সুপুরি কাটতে কাটতে ও উত্তর দিল, 'এই যে, অবান্তর সব কিছু ঘটে চলেছে আমাকে ঘিরে। আমার কী ইচ্ছে করে, জানো? সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দিই। তারপর আবার একটা একটা করে সাজিয়ে তুলব সেগুলো। কিন্তু বারবার যদি এমনটা ঘটতে থাকে,...তুমি জান না, কী ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারি আমি।'

—এত হিংস্রতা দিয়ে কী গড়ে তুলবে তুমি?

সেই একটা চোরা হাসি ফিরে এল নীলমের পাতলা ঠোঁটদুটোতে। 'তুমি একটা নির্লজ্জ পুরুষমানুষ। সব জানো, বোঝো, তবু শান্তভাবে আমাকে খুঁচিয়ে পেট থেকে কথাগুলো টেনে আনতে চাইছ বাইরে।' বলতে-বলতে চোখদুটো লাল হয়ে ওঠে ওর।

'কেন বুঝতে পারছ না, খেপে গেলে আমি ভয়ঙ্কর।' হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল ও, 'এবার যাও, আমি স্নান করব।'

চলে এলাম।

এই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেলেও নীলম রাজকিশোরকে নিয়ে আর কিছুই বলত না আমাকে। কিন্তু, ও কী ভাবছে আমি জানতাম, আমার ভাবনাও ও টের পেয়ে যেত! এরকম নিঃশব্দ টানাপোড়েন অনেকদিন ধরে চলতে লাগল।

~ www.amarboi.com ~

এক সন্ধ্যায় মিউজিক রুমে জড়ো হয়ে জঙ্গলসুন্দরীর পরিচালক কৃপালনি ও আমরা সবাই নায়িকার অভিনয়ের মহলা দেখছিলাম। নীলম শান্তভাবে একটা চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছিল। জনপ্রিয় একটা গান হচ্ছে, সুরটা সুন্দর। মহলা শেষ হওয়ার মুখে কাঁধে খাদির ব্যাগ দুলিয়ে রাজকিশোর ঢুকল। কৃপালনি, সঙ্গীত পরিচালক ঘোষ, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট পি এন মোঘাকে ইংরেজিতে হ্যালো বলে, তারপর নায়িকা ঈডান বাঈকে হাত জোড় করে বলল, 'ঈডানবোন, তোমাকে কাল ক্রফোর্ড বাজারে দেখলাম যেন! তোমার বৌদির জন্য কমলালেবু কিনছিলাম, হঠাৎ তোমার গাড়িটা দেখতে পেলাম', বলতে বলতে ওর খেয়াল হল, পিয়ানোর কাছে বেঁটেমতো একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে নীলম বসে আছে। তখনই ও, হাতজোড় করে নীলমের দিকে তাকানোমাত্র নীলম উঠে দাঁড়াল, 'রাজসাহেব, আমাকে বোন বলে ডাকবেন না', তার বলার মধ্যে এমন একটা ভঙ্গি ছিল, হতচকিত হয়ে গেল স্টুডিও-র সবাই। রাজকিশোর একটু লাল হয়ে গিয়েও নিজেকে যথাসম্ভব সামলে নিয়ে জানতে চাইল, 'কেন? কেন?'

কোনও কথা না বলে নীলম ঘর ছেড়ে হেঁটে চলে গেল। তিনদিন পর, আমি যখন নাগপাড়া দিয়ে হাঁটছি, বিকেল পার হয়ে গেছে। সেদিনের ঘটনা পানওয়ালা শ্যামলালের কানেও পৌঁছে গেছিল। আমাকে জোর গলায় ডেকে বলল ও, 'কুত্তিটার নর্দমার মতো নোংরা মন! রাজভাই বোন বলে ডাকছে যাকে, সে কিনা মুখ ফিরিয়ে নিল! ও হাজার চেষ্টা করেও রাজভাইয়ের পায়জামায় কাদা ছিটোতে পারবে না।'

রাজভাইয়ের পায়জামা নিয়ে আমি সত্যিই পেরে উঠছি না আর। কিন্তু শ্যামলালকে এসব কিছুই না বলে আমি চুপচাপ বসে শুনতে লাগলাম ও ওর খদ্দেরবন্ধুদের সঙ্গে নানা গল্প গুজব করছে, যার মধ্যে সত্যের লেশমাত্রও হয়তো নেই!

সেদিনের সেই মিউজিক রুমের ঘটনাটা এতদিনে স্টুডিওর সকলেরই জানা হয়ে গেছে। প্রথম তিনটে দিন তো এটাই মুখে-মুখে ঘুরত, কেন মিস নীলম রাজকিশোরের বোন বলে সম্বোধন মেনে নিতে পারল না! এ-ব্যাপারে, রাজকিশোরের কাছ থেকে সরাসরি আমি কিছু শুনিনি। ওর এক বন্ধু জানাল, ও নাকি ওর ডায়েরিতে একান্তভাবে প্রার্থনা করেছে, যে, মিস নীলমের হৃদয়, মন যেন পরিশুদ্ধ হয়!

দিন চলে যাচ্ছে। আর উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা ঘটছে না। নীলম এখন আগের চেয়েও গম্ভীর। আর, রাজকিশোরের কুর্তার বোতাম এখন, সবসময়, খোলা। ওর বাদামি বুকের কালো লোমগুলো উঁকিঝুঁকি মারে সবসময়।

বৃষ্টি কমে আসছে। জঙ্গলসুন্দরীর চতুর্থ সেট-ও শুকিয়ে এসেছে। পরিচালক কৃপালনি শুটিং-এর দিনক্ষণ নোটিশবোর্ডে সেঁটে দিয়েছে। এই দৃশ্যে রাজকিশোর ও নীলমের অভিনয়। সংলাপ আমারই লেখা। তাই জানি, কথা বলতে-বলতে একসময় ও নীলমের হাত ধরে একটু চুমু খাবে।

এই দৃশ্যে চুমু খাওয়ার প্রয়োজন ছিল না কোনও। মেয়েদের স্বল্পবাস পরিয়ে যেভাবে

~ www.amarboi.com ~

দর্শক টানা হয়ে, সেভাবেই পরিচালক ভেবে নিয়েছে ছবিতে এই চুমুর দৃশ্য রেখেই সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে!

আমি সেটে আছি। শুটিং শুরু হতে, আমার হৃৎস্পন্দনও বেড়ে চলেছে ক্রমশ। রাজকিশোর আর নীলম, দুজনেই কীভাবে যে নেবে এই দৃশ্যটা! ভাবলেই সিরসিরে একটা উত্তেজনা জেগে উঠছে আমার শরীরে। কিন্তু বাস্তবে, এই ঘটনা ছাড়াই দৃশ্যটির শুটিং হয়ে গেল। প্রতিটা সংলাপের শেষে ইলেকট্রিক বাতি হঠাৎ জোরে জ্বলে ওঠে, নিভে যায়, স্টার্ট আর কাট বেজে ওঠে। এই দৃশ্যটি যখন চূড়ান্তে পৌঁছল, রাজকিশোর প্রেমে গদগদ অভিনয় করে ওর হাত ধরল, কিন্তু চুমু খাওয়ার আগেই ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে নিজের হাতে চুমু খেল সে। তারপর আবার হাত ধরল ওর।

আমি ভেবেছিলাম, নীলম ওর হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, রাজকিশোরের মুখে টেনে একটা চড় কষিয়ে দেবে। রেকর্ডিং রুম, পি এন মোঘার ইয়ারড্রাম্স ফেটে পড়বে সেই চড়ের শব্দে। বরং আমি দেখলাম, একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল নীলমের পাতলা ঠোঁটে। অপমানিত হওয়ার কোনও চিহ্নই নেই সেখানে। নীলমের কাছ থেকে এটা আমি আশা করিনি। কিন্তু, ওকে এ-নিয়ে বলিওনি কিছু। দু-তিনদিন কেটে গেল। একসময় ভেবে নিলাম, ও বোধহয় এ-ঘটনায় আহত হয়নি তেমন! ওর সংবেদনশীল মনে এটা কোনও কারণে দাগ কাটেনি হয়তো-বা। আরও একটা কথা আছে, যে-রাজকিশোর সব মহিলাকেই বোন বলে ডেকে থাকে, ও হয়তো তার গলায় প্রেমের সুর বেজে উঠতে দেখেছে কখনও!

রাজকিশোর কেন নীলমের হাতের বদলে, নিজের হাতে চুমু খেল? সে কি ওকে জব্দ করতে চাইছিল? অপমান করতে চাইছিল ওকে? প্রশ্নগুলো একের পর এক মনে জাগছিল, যার কোনও উত্তর পাচ্ছিলাম না আমি।

দিন চারেক বাদে, নাগপাড়ায় শ্যামলালের দোকানে পান কিনতে গেছি, শ্যামলাল আমাকে অভিযোগ জানাল, 'আরে মন্টো সাহেব, আপনার কোম্পানির খবর আপনি তো কিছুই দেন না আমাকে! কিছুই কি জানেন না, নাকি ইচ্ছে করেই চেপে যান! রাজভাই কী করেছে, খবর রাখেন?'

ওর মুখ থেকেই শুনলাম, 'জঙ্গলসুন্দরী একটা দৃশ্যে ছিল, রাজভাইকে মিস নীলমের ঠোঁটে চুমু খেতে হবে। ভাবুন তো, কোথায় আমাদের রাজভাই আর কোথায় ওই মেয়েছেলেটা! রাজভাই তখনই বলে দিয়েছে, "না মশাই, এটা আমি কিছুতেই করতে পারব না। আমি বিবাহিত, একটা বেশ্যার ঠোঁটে চুমু খেয়ে উঠে, বাড়ি গিয়ে বউয়ের ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াবো কী করে?" ব্যাপারটা বুঝে নিয়েই পরিচালক তখন-তখন দৃশ্যটা বদলে দিল। "ঠিক আছে, মুখে নয়, হাতে চুমু খাবেন আপনি।" কিন্তু বুঝলেন তো, রাজভাই হল গিয়ে জাতশিল্পী, ঠিক সময় মতো, এমন ভাবে নিজের হাতে চুমুটা খেল, লোকে ভাববে, ওই মাগির হাতেই চুমু খেয়েছে বুঝি।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ-সব কিছুই আমি নীলমকে বলিনি। ভেবেছি, ও যখন জানে না কিছুই, শুধু শুধু কানে বিষ ঢেলে, ওর মনোকষ্ট বাড়ানোর মানে হয় না কোনও।

বম্বেতে ঘরে-ঘরে ম্যালেরিয়া। আমার মনে নেই, সেটা কী মাস কিংবা কত তারিখ, শুধু মনে আছে, জঙ্গলসুন্দরীর পঞ্চম সেট গোটাতে হল যখন, তখন বেদম বৃষ্টি পড়ছে। নীলমের হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে খুব জ্বল এল। আমার এমন কিছু কাজ ছিল না স্টুডিওতে, তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর বিছানার পাশে বসে শুশ্রূষা করতাম আমি। ম্যালেরিয়ার তাড়নায় ওর কালো চেহারা কেমন যেন হলদেটে মেরে গেছে। মুখে চোখে অসহায়তার ছাপ।

কুইনাইন ইঞ্জেকসন নেওয়ার ফলে কানে ভাল শুনতে পেত না নীলম। নিজে, দিন দিনে গলার স্বরকে অনেকটা চড়িয়ে নিয়ে কথা বলত আর আমাকে দোষ দিত, আমিই নাকি কালা হয়ে যাচ্ছি।

একদিন জ্বর নেমে এসেছে। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ক্ষীণ স্বরে, ওকে দেখতে আসার জন্য ঈদনবাঈকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে যখন, নীচের রাস্তায় একটা গাড়ির হর্ন বেজে উঠল। চেয়ে দেখলাম, সর্বাঙ্গে যেন শিহরণ খেলে গেল ওর।

একটু পরেই ঘরের ভারী কাঠের দরজা ঠেলে রাজকিশোর ঢুকল, সাদা ধবধবে কুর্তা আর চুস্ত পায়জামা ওর পরনে। পেছন-পেছন ওর বেঢপ চেহারার বউও ঢুকে এল ঘরের ভেতরে।

ঈদনবাইকে রাজকিশোর 'ঈদন বহিন' বলে অভিবাদন জানাল। আমার সঙ্গে হাত মেলাল। ওর ঘরোয়া, ক্লান্ত চেহারার বউয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল সকলের। তারপর নীলমের খাটের পাশটিতে গিয়ে বসল। কিছুক্ষণ, কোনওদিকে না তাকিয়ে এমনিই মৃদু-মৃদু হাসছিল ও। তারপর নীলমের দিকে তাকাল যখন, এই প্রথম ওর চোখে আমি, আবছা, আবেগ দেখতে পেলাম।

আমি বিস্ময় চেপে রাখতে পারছিলাম না, রাজকিশোর যখন, হালকা সুরে বলতে শুরু করল, 'আরে! সেই কবে থেকে ভাবছি, তোমাকে দেখতে আসব, কিন্তু আমার গাড়ির ইঞ্জিন এমন ঝামেলা পাকাচ্ছিল, গত দশদিন ধরে তো কারখানাতেই পড়েছিল এটা। আজ গাড়ি পেলাম, অমনি (চোখের ইঙ্গিতে বউকে দেখিয়ে) বললাম, চল শান্তি, আমরা ঘুরে আসি। ঘরের কাজ পরে হবে। আজ রাখি, একটা শুভদিন। নীলম বোনকে দেখে আসাও হবে, আবার ও আমার হাতে রাখিও বেঁধে দিতে পারেবে।'

সিল্কের ফিতে বাঁধা একটা রাখি বের করল ও কুর্তার পকেট থেকে। নীলমের রুগ্ন মুখ আরও চুপসে গেছে, বিরক্তিতে ভরে গেছে আরও।

রাজকিশোর সেদিকে দিকপাত না করে, ঈদনবাইকে বলল, 'আহ! এত বড় একটা আনন্দের দিনে আমার বোন এমন কাহিল ভাবে আমাকে রাখি পরাবে নাকি? শান্তি, ওকে একটু লিপস্টিক লাগিয়ে দাও। কই, মেকআপ-বক্স কোথায়?' রাজকিশোর দুটো লম্বা লাফ

~ www.amarboi.com ~

দিয়ে তাকের ওপর থেকে পেড়ে আনল ওটা। একটাও কথা বলছে না নীলম। আর্তনাদ চেপে রাখার জন্যই বুঝি-বা ঠোঁট দুটো শক্ত করে এঁটে বসে আছে ও।

অনুগতা স্ত্রীর মতো, শান্তি, নীলমকে সাজাতে বসল। কোনও বাধাই দিচ্ছে না নীলম। দেখে মনে হচ্ছিল, ও যেন একটা মৃতদেহকে সাজিয়ে দিচ্ছে। শান্তি যেমন তেমনভাবে ওর ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষতে শুরু করল যখন, নীলম শুধু একবারই আমার দিকে চেয়ে একটুখানি হেসেছিল, যে-হাসিতে সত্যিই আর্তনাদ লেগে আছে।

আমি ভাবছিলাম, আর নয়। যে-কোনও মুহূর্তে নীলম তার ঠোঁট ফাঁক করে চেঁচিয়ে উঠবে। বৃষ্টিতে যেভাবে পাহাড় ধুয়ে হু-হু করে জলস্রোত নেমে আসে। ওর বাঁধভাঙা আবেগও বুঝি এমনভাবে ধেয়ে আসবে, আমরা সবাই কোথায় ভেসে যাব, কে জানে! কিছুই ঘটল না। ওর রুগ্ন, পাণ্ডুর চামড়ার ওপর রুজ বোলানো হচ্ছে। পাথরের মতো স্থির, নীলম, সবকিছু হয়ে যাওয়ার পর ইস্পতকঠিন গলায় রাজকিশোরকে বলল, 'আসুন, রাখিটা পরিয়ে দিই।'

রাখি বাঁধা হয়ে গেল রাজকিশোরের হাতে। সিল্কের ফিতের ফাঁস বাঁধতে-বাঁধতে একবারের জন্যও কেঁপে উঠল না নীলমের আঙুল। আমি আবার চেয়ে দেখলাম, রাজকিশোরের ঝকঝকে চোখে আবেগের ছায়া। কিন্তু সেটাকে হাসিতে ভাসিয়ে দিয়ে, নিয়মমাফিক, খাম থেকে কিছু টাকা বের করে ও নীলমের হাতে দিল। নীলম ওকে ধন্যবাদ দিয়ে, বালিশের নীচে গুঁজে রাখল টাকাটা।

সবাই চলে গেছে। আমি আর নীলম এ-ঘরে একা। আমার দিকে একবার হেরে-যাওয়া মানুষের মতো তাকিয়েই, মাথাটা বালিশে হেলিয়ে দিয়ে চুপচাপ বিশ্রাম করতে লাগল ও। রাজকিশোর তার ঝোলা ফেলে গেছে। ওটাকে লাথি মেরে একপাশে সরিয়ে দিল নীলম। আমি এরপর ওর বিছানার পাশে প্রায় ঘণ্টাদুয়েক ধরে বসে-বসে খবরের কাগজ পড়লাম। একটাও কথা বলল না ও। আমিও ফিরে এলাম।

কিছুদিন পর, নাগপাড়ায়, মাসে নটাকা ভাড়ায় নেওয়া আমার ছোট ঘরটাতে বসে দাড়ি কামাচ্ছি, প্রতিবেশিনী, পাশের ঘরের মিসেস ফার্নাণ্ডেজের ঘ্যানঘ্যানানি শুনছি, দরজায় কার পায়ের শব্দ শুনলাম যেন। চেয়ে দেখি, নীলম। এক মুহূর্তের জন্য ভাবলাম, চোখের ভুল! ওর গাঢ় লাল লিপস্টিক ঠোঁটে ধেবড়ে গেছে, মনে হচ্ছে ঠোঁট বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

উস্কোখুস্কো চুল। সাদা শাড়ির ফুলছাপগুলো কুঁচকে রয়েছে। ব্লাউজের চার-পাঁচটা হুক খোলা, ওর, নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত কালো বুক দেখা যাচ্ছে।

আমি এতটাই ঘাবড়ে গেছিলাম, কী হয়েছে, কিংবা, আমার বাড়ির হদিশ ও পেল কোথায় এসব কিছুই জিগ্যেস করার কথা মাথায় এল না।

দরজা বন্ধ করে সঙ্গে-সঙ্গে চেয়ার টেনে বসলাম ও [illegible] বলল, 'সোজা, তোমার কাছেই আসছি।'

'কোথা থেকে?' নরম গলায় জানতে চাইলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'বাড়ি থেকে! সব কেলেঙ্কারির শেষ আজ, এটাই জানাতে এলাম।'

'সে আবার কী?'

'জানতাম, যখন কেউ থাকবে না, ও ব্যাগ নেওয়ার অজুহাতে ফিরে আসবে আবার।' বলতে-বলতে চোরা হাসি খেলে গেল ওর লিপস্টিক-থেবড়ানো ঠোঁটে। 'আমি বললাম, "ওই তো, ও ঘরেই ব্যাগটা আছে, নিয়ে যাও।" আমার গলার স্বরে কিছু একটা আন্দাজ করে শঙ্কিতভাবে তাকাল ও। বললাম, "ভয় পাচ্ছ কেন?" কিন্তু ও-ঘরে গিয়ে ওকে ব্যাগ দেওয়ার বদলে ড্রেসিংটেবিলের সামনে সাজতে বসে গেলাম আমি।'

নীলম থামল একটু। সামনের নড়বড়ে টেবিল থেকে জলের গ্লাসটা নিয়ে ঢকঢক করে জল খেল। শাড়ির আঁচলে মুখ মুছে নিয়ে শুরু করল আবার, 'প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে আমি সাজলাম। লিপস্টিকের যত রং ঠোঁটে ঠেসে দেয়া সম্ভব, তা-ই দিলাম, একগাদা রুজ লাগালাম গালে। এক কোণে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে, ও আয়নার মধ্যে দিয়ে দেখে যাচ্ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাকে একটা ডাইনির মতো দেখায়! তারপর দরজায় গিয়ে খিল এঁটে দিলাম।'

'তারপর?'

নীলামের দিকে চেয়ে দেখি ওর চেহারাটা আমূল বদলে গেছে। শাড়ি ঘষে-ঘষে ঠোঁট থেকে সব রং তুলে দিয়েছে সে। হাতুড়ি-পেটা গনগনে লোহার মতো উত্তপ্ত অথচ নিচু গলায় কথা বলছে ও। এখন বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু পুরোপুরি সাজগোজ-করা চেহারায় ওকে যে সত্যি-সত্যি ডাইনির মতো লাগছিল, তাতে সন্দেহ নেই কোনও।

তখনই উত্তর দিল না ও। তক্তপোশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমার ডেস্কে এসে বসল, 'ওকে আমি ছিঁড়েখুঁড়ে শেষ করে দিয়েছি। বুনো বেড়ালের মতো আঁচড়েছি, ও তখন থাবা বসিয়েছে আমার মুখে। অনেকক্ষণ মারামারি করলাম আমরা। ওর গায়েও তো জংলি জানোয়ারের মতো জোর। কিন্তু, তোমাকে তো বলেছি, অত্যন্ত হিংস্র মেয়ে আমি। আমার, ম্যালেরিয়ায় কাবু-হওয়া ভাব, একেবারেই কেটে গেছিল তখন। ধোঁয়া উড়ছিল শরীর থেকে, চোখ বেয়ে আগুন ঝরছিল। হাড়গোড় শক্ত হয়ে উঠছিল ক্রমশ। কেন এমন করছিলাম, জানি না। আমাদের মধ্যে সত্যিকারের অশান্তি তো হয়নি কখনও। ওর সাদা খাদির কুর্তার ফুলগুলো ছিঁড়ে ফালাফালা করে দিচ্ছিলাম, আর ও আমার চুলের গোড়াসুদ্ধ উপড়ে নিচ্ছিল। সব শক্তি দিয়ে ও আমাকে মারতে চাইছিল, কিন্তু আমি জানতাম, আজ আমিই জিতব। শেষকালে, কার্পেটের ওপর, মড়ার মতো পড়ে রইল ও। আমি হাঁফাচ্ছিলাম। নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না, শুধু ওর কুর্তা টুকরো-টুকরো করে দিলাম আমি। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ওর প্রশস্ত বুক দেখতে পেলাম আমি...।' ঝট করে উঠে দাঁড়াল নীলম। এলো চুল, একপাশে সরিয়ে রেখে বলল, 'সদক, শয়তানটার শরীর সত্যি, সুন্দর। কী যে ভর করল আমায়, জানি না। মুখ নামিয়ে ওর শরীরের যেখানে সেখানে কামড়াতে লাগলাম। ও শুয়ে-শুয়ে গুঙিয়ে উঠল, আমার রক্তমাখা ঠোঁট ওর ঠোঁটে ছুঁইয়ে

~ www.amarboi.com ~

খুব জোরে চুমু খেলাম আমি। প্রতিরোধহীন, একটা মেয়ে মানুষের ঠাণ্ডা শরীরের মতো শুয়ে থাকল ও। যখন উঠে দাঁড়ালাম, ওর শরীরের সর্বত্র, দেখি, আমার রক্ত আর লিপস্টিকের দাগ ফুলের মতো নকশা এঁকে দিয়েছে। ঘরের চারদিকে চোখ বোলালাম। মনে হল, এসবের কিছুই সত্যি নয়। হঠাৎ দম আটকে এল। ভয়ে, কাঁটা দিয়ে উঠল গায়ে। দরজা খুলে রেখে, তোমার কাছে চলে এলাম।'

ও নিজেও একটা মৃতদেহের মতো নিথর হয়ে গেল, এরপর। কেমন ভয়-ভয় করছিল আমার। হাত ধরলাম, উত্তপ্ত হাতটা এলিয়ে পড়ল একদিকে।

'নীলম... নীলম।'

বারবার ডাকছি আমি। সাড়া দিচ্ছে না। ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় গলা ফাটিয়ে ডাকলাম যখন ওর সাড়া পেলাম। ওঠার চেষ্টা করে, ও শুধু বলল, 'সদত, আমার নাম রাধা।'

ভাষান্তর : চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাবু গোপীনাথ

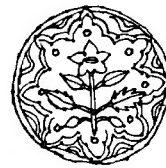

মনে হয় ১৯৪০ সালে বাবু গোপীনাথের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। আমি বম্বের একটা সাপ্তাহিকের সম্পাদক ছিলাম। একদিন, আমি কিছু একটা লিখতে ব্যস্ত ছিলাম, আব্দুল রহিম স্যান্ডো ঝড়ের মতো আমার অফিসে ঢুকল, পেছনে একজন বেঁটে, ছোটখাটো লোক। তার নিজস্ব ভঙ্গিতে আমাকে কুশল জানিয়ে স্যান্ডো তার বন্ধুকে পরিচয় করালো, 'মন্টো সাহেব, বাবু গোপীনাথের সঙ্গে আলাপ করুন।'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে হাত মেলালাম তার সঙ্গে। স্যান্ডো তার নিজের মতো করে বলল, 'বাবু গোপীনাথ, তুমি ভারতের এক নম্বর লেখকের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছো।' শব্দ নির্বাচনে তার একটা বিশেষ দক্ষতা ছিল, যে সব শব্দ অভিধানে না পাওয়া গেলেও, তার বক্তব্য প্রকাশ করতে সক্ষম ছিল। 'উনি যখন লেখেন, লোকজনের হৃদকম্প শুরু হয়ে যায়... এমন এমন কড়ি মানে সুর মেলান যে মন একেবারে সাফ হয়ে যায়...কয়েকদিন আগে আপনি একটা মজার লেখা লিখেছেন...মিস খুরশিদ গাড়ি কিনে ফেলেছেন। আল্লার কী কারসাজি...কি বাবু গোপীনাথ, একেবারে এন্টি কি পেন্টি পু না?'

আব্দুল রহিম স্যান্ডো একজন মৌলিক মানুষ। বেশিরভাগ বাক্য যা সে ব্যবহার করে সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে সেগুলো তার নিজেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। এই ভূমিকা প্রদানের পর সে বাবু গোপীনাথের দিকে তাকাল, যাকে বেশ অভিভূত দেখাচ্ছিল। 'ইনি বাবু গোপীনাথ, লাহোরের মানুষ, এখন বম্বের, সঙ্গে কাশ্মীরের একটা কবুতরিও আছে।'

বাবু গোপীনাথ হাসলেন।

আব্দুল রহিম স্যান্ডো বলে চলল, 'যদি আপনি পৃথিবীর এক নম্বর নিরপরাধ মানুষকে খোঁজেন, এই হল আপনার লোক। প্রত্যেকেই ওনাকে প্রতারিত করে ভাল ভাল কথা বলে। আমার দিকে দেখুন। যা কিছু আমি করি তা হল শুধু কথা বলা আর উনি আমাকে পুরস্কৃত করেন প্রত্যেক দিন পল্‌সনস্-এর চুরি করা মাখন দিয়ে। মন্টো সাহেব, উনি একজন সত্যিকারের অ্যান্টিফ্লুজাস্টিন জাতের লোক, যদি কেউ থাকে ওরকম। আমরা আপনাকে বাবু গোপীনাথের বাড়িতে আশা করছি আজ সন্ধেয়।'

~ www.amarboi.com ~

বাবু গোপীনাথ, যার মনটা মনে হয় অন্য কোথাও ছিল, এখন কথাবার্তায় যোগ দিলেন, 'মন্টো সাহেব, আমি চাই আপনি আসুন।' তারপর স্যান্ডোর দিকে তাকাল, 'স্যান্ডো, মন্টো সাহেব কি, ...ইয়ে, মানে, পছন্দ করেন... তুমি জানো কী জিনিস?'

আব্দুল রহিম স্যান্ডো হাসল। 'অবশ্যই, উনি ওসব পছন্দই করেন, আরও অনেক কিছুই পছন্দ করেন। তাহলে ওই কথাই রইল? আমিও পান করা শুরু করে দিয়েছি কারণ এখন বিনা পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে।'

স্যান্ডো ঠিকানাটা লিখে দিল, আর ছটার সময় আমি ফ্ল্যাটে পৌঁছে গেলাম। পরিষ্কার, সুন্দর জায়গা। তিনখানা ঘর, ভাল ভাল আসবাবপত্র, সবকিছু ঠিকঠাক। স্যান্ডো আর বাবু গোপীনাথ ছাড়া আরও চারজন ছিল সেখানে—দুজন পুরুষ আর দুজন মহিলা, তাদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল স্যান্ডো।

একজন গফ্‌ফর সাঁই, পাঞ্জাবের গ্রামের লোক, পরনে লম্বা ঢিলেঢালা আলখাল্লা, রঙিন পাথরের লম্বা মালা গলায়। 'ইনি বাবু গোপীনাথের আইন-উপদেষ্টা, কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন তো?' স্যান্ডো বলল, 'পাঞ্জাবে, সব পাগলরাই ঈশ্বরীয় লোক। এখানে যিনি এসেছেন, সেই বন্ধুটি হয় একজন ঈশ্বরীয় মানুষ কিংবা তার কাছাকাছি কেউ। বাবু গোপীনাথের সঙ্গে লাহোর থেকে এসেছেন, কারণ ওখানে তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এখানে, তিনি স্কচ্ হুইস্কি খাচ্ছেন, ক্র্যাভেন-এ সিগারেট খাচ্ছেন, আর বাবু গোপীনাথের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করছেন।"

গফ্‌ফর সাঁই চুপচাপ এই বর্ণময় বর্ণনা শুনছিলেন আর মিটি মিটি হাসছিলেন।

অন্য লোকটি গুলাম আলি, দীর্ঘদেহী, খেলোয়াড় সুলভ চেহারা, মুখে বসন্তের দাগ। তার সম্পর্কে স্যান্ডো বলল, 'এ আমার সত্যিকারের শিষ্য, লাহোরের এক বিখ্যাত গায়িকা ওর প্রেমে পড়েছিল, গুলাম আলিকে মজাবার জন্যে তার চেষ্টার অন্ত ছিল না, কিন্তু গুলাম আলির এক কথা—মেয়েরা আমার আকর্ষণের বস্তু নয়। লাহোরের এক মন্দিরতীর্থে বাবু গোপীনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা, তারপর থেকে আর তাঁকে ছাড়েননি তিনি। এক টিন ক্র্যাভেন-এ সিগারেট আর সারাদিনের খাদ্য পান তিনি।'

গুলাম আলি মৃদু-মন্দ হাসলেন।

আমি মহিলাদের দিকে তাকালাম। তাদের মধ্যে একজন বেশ তাজা যুবতী, ফর্সা আর গোলমুখো, স্যান্ডোর কথা মতো, 'কাশ্মীরি কবুতরি।' তার চুল ছোট ছোট, প্রথম দেখে মনে হয় বড় করে ছাঁটা, কিন্তু আসলে তা নয়। তার চোখ দুটো বড় বড় আর উজ্জ্বল, তার অভিব্যক্তি দেখে মনে হয় সে বেশ কাঁচা আর অনভিজ্ঞ। স্যান্ডো তার পরিচয় দিল।

'জিনত বেগম, জেনো বলা হয় ওকে, বাবু-সাহেবের দেওয়া ভালবাসার নাম। কাশ্মীর থেকে তুলে আনা এই আপেলটা লাহোরে এসেছিল শহরের এক নিষিদ্ধ মহিলার হাত ধরে। বাবু গোপীনাথের নিজস্ব গোপন বাহিনী এই পৌঁছনোর খবর দিয়েছিল, আর রাতারাতি তাকে দখল করলেন। বিপদবাধা ছিল অনেক, প্রায়, মাস দুয়েক ধরে শহরের পুলিস ছাপ্পা মেরেছিল, বাবু গোপীনাথের উদারতাকে ধন্যবাদ। স্বাভাবিক ভাবেই, জিত হয়েছিল বাবু গোপীনাথেরই। আর তাই ও আজ এখানে। ধরন তক্তা।'

~ www.amarboi.com ~

অন্য মহিলাটি, শান্তভাবে যে ধূমপান করছিল, সে কালো আর লাল-চোখো। বাবু গোপীনাথ তার দিকে তাকালেন, 'স্যান্ডো, ওর কথা বলো।' স্যান্ডো মহিলার উরুতে চাপড় মারল, বলল, 'জনাব, এ হল মাংসের টিপোটি, পুরোপুরি পাকা, আব্দুল রহিম স্যান্ডো ওরফে সরদার বেগম। আমার প্রেমে পড়েছিল ১৯৩৬ সালে—আর, বছর দুয়েকের মধ্যে, আমার সব শেষ—ধরন তক্তা। আমাকে লাহোর থেকে পালাতে হয়েছিল। যাই হোক, বাবু গোপীনাথ খবর পাঠিয়েছিল যাতে তার কোন বিপদ না হয়। তার রোজকার খাদ্যতালিকায় এক টিন ক্র্যাভেন-এ সিগারেট আর দু-টাকা আট আনা, রোজ সন্ধের মরফিনের জন্য। ও কালো হতে পারে, কিন্তু, ভগবানের দিব্যি, বেশ তৈরি মেয়ে।'

'কী বাজে বকছো', সরদার বেগম বলল। তার গলা শুনে মনে হল কঠিনতম কেজো মহিলার কণ্ঠস্বর।

এসব ভূমিকা শেষ করার পর, আমার মহত্ত্ব নিয়ে বক্তৃতা শুরু করল স্যান্ডো। 'ওসব থাক, স্যান্ডো', আমি বললাম, 'অন্য কিছু নিয়ে কথা বলা যাক।'

স্যান্ডো চেঁচিয়ে বলল, 'হুইস্কি আর সোডা নিয়ে এসো বাবু গোপীনাথ, টাকা বার করো।'

বাবু গোপীনাথ পকেটে হাত দিল, মোটা একটা টাকার বান্ডিল বের করল, এক গোছা নোট নিয়ে স্যান্ডোকে দিল। স্যান্ডো সশ্রদ্ধভাবে সেটার দিকে তাকল, আকাশের দিকে চোখ তুলে বলল, 'ওঃ গড, বিশ্বসংসারের কর্তা, আমাকে সেই দিনটা এনে দাও, যেদিন আমি পকেটে হাত ঢোকাবো আর এইরকম মোটা নোটের বান্ডিল বের করবো। আপাতত, আমি গুলাম আলিকে বলছি দৌড়ে দোকানে যেতে আর দু-বোতল জনি ওয়াকার নিয়ে আসতে।'

হুইস্কি এল, আমরা খেতে শুরু করলাম, আর স্যান্ডো বক বক করে যেতে লাগল একা একা। এক চুমুকে শেষ করল গ্লাসটা, নামিয়ে রাখল। 'ধরন তক্তা', চেঁচিয়ে বলল, 'মন্টো সাহেব, এই হল যাকে আমি বলি সৎ ও সুন্দর হুইস্কি, যার গায়ে লেখা 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক'—আর যেটা গলা দিয়ে জ্বলতে জ্বলতে নামে পাকস্থলী পর্যন্ত। বাবু গোপীনাথ দীর্ঘজীবী হোন।'

বাবু গোপীনাথ কথা বলছিলেন না বিশেষ, মাঝে মাঝে স্যান্ডোর বক্তব্যে সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ছিলেন। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল লোকটার নিজস্ব কোনও মতামত নেই। গফ্‌ফর সাঁইয়ের উপস্থিতি তাঁর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনেরই পরিচয়, স্যান্ডোর ভাষায় যে তার আইনি পরামর্শদাতা। আসল কথা হল, বাবু গোপীনাথ আজন্ম আসল বা নকল পবিত্র মানুষদের ভক্ত। বিভিন্ন কথাবার্তা থেকে আমি বুঝেছিলাম যে লাহোরে থাকার সময় তিনি ফকির, ধর্মীয় ভিখারি বা সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করতেন।

'কী ভাবছেন আপনি?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'কিছু না, কিছুই না।' বলে তিনি হাসলেন, জিনতের দিকে কামুক চোখে তাকালেন। 'এইসব সুন্দর প্রাণীদের কথা ভাবছিলাম। অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করতে দেবে কেন লোকে?'

~ www.amarboi.com ~

স্যান্ডো বুঝিয়ে বলল, 'মন্টো সাহেব, বাবু গোপীনাথ বিরাট মানুষ। লাহোরে এমন কোনও গায়িকা বা বাঈজি নেই যার সঙ্গে ওনার আসনাই হয়নি।'

'মন্টো সাহেব, যৌবন কারও চিরকাল থাকে না।' বাবু গোপীনাথ বিনীতভাবে বললেন।

তারপর লাহোরের বড় বড় পরিবারের আর গায়িকাদের নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হল। বিশেষ বিশেষ পরিবারকে চিহ্নিত করা হল, আভিজাত্য নিয়ে বিশ্লেষণ হল, কোন মেয়ের ফুল খসাতে বাবু গোপীনাথ কত টাকা কোন বছরে খরচ করেছেন তা নিয়েও। এসব দেওয়ানেওয়ার কথা জানত স্যান্ডো, সর্দার, গুলাম আলি আর গফ্‌ফর সাঁই। লাহোরের কোঠাবাড়ির গালগল্প স্বাধীনভাবে চলছিল, সবকিছুই যে আমার তেমন বোধগম্য হচ্ছিল তা নয়, যদিও আলোচনার সারবস্তু ছিল পরিষ্কার।

জিনত একটাও কথা বলেনি। মাঝে মাঝে, হাসছিল সে। এটা পরিষ্কার যে সে এসব কথায় আগ্রহী ছিল না। সে খুব হাল্কা একটা হুইস্কি খেয়েছিল, আমি লক্ষ করলাম সে ধুমপান করছে তা উপভোগ না করেই। বিস্ময়ের ব্যাপার, সে ধূমপান করছিল সব থেকে বেশি। আমি দৃশ্যত প্রমাণ পাইনি যে সে বাবু গোপীনাথকে ভালবাসে, কিন্তু এটা পরিষ্কার যে সে তাঁর সঙ্গে আছে। যাই হোক, তাদের দুজনের মধ্যে কোনওরকম উত্তেজক সম্পর্ক কেউ আবিষ্কার করতেই পারে, তাদের শারীরিক নৈকট্য ছাড়াই।

আটটা নাগাদ, সরদার মরফিন নেওয়ার জন্যে বেরিয়ে গেল, গফ্‌ফর সাঁই তিন পেগ বেশি খেয়ে, মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন, গোলাপগুচ্ছ হাতে নিয়ে। গুলাম আলিকে পাঠানো হয়েছিল খাবার আনতে। স্যান্ডো কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বাবু গোপীনাথ, এতক্ষণে বেশ মাতাল, জিনতের দিকে কামুক ভাবে তাকালেন, বললেন, 'মন্টো সাহেব, আমার জিনত সম্পর্কে আপনি কী ভাবছেন?'

কী উত্তর দিতে হবে জানতাম না বলে, শুধু বললাম, 'খুব সুন্দর'। বাবু গোপীনাথ খুশি হলেন। 'মন্টো সাহেব, ও ভারি ভাল মেয়ে, আর কী সরল সাধাসিধে। গয়নাগাঁটিতে কোনও আগ্রহ নেই, কিংবা অন্যান্য ওসব ব্যাপারে। অনেক বার একটা বাড়ি কিনে দেবার কথা বলেছি। আপনি জানেন তার উত্তরটা কী ছিল? বাড়ি নিয়ে আমি কী করব? দুনিয়ায় আমার আর কে আছে?'

তিনি হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, 'একটা মোটরগাড়ির দাম কত, মন্টো সাহেব?'

'আমার কোনও ধারণা নেই।'

'আমি বিশ্বাস করছি না, মন্টো সাহেব। আমি নিশ্চিত, আপনি জানেন। আপনি নিশ্চয়ই আমাকে জেনোর জন্য একটা গাড়ি কিনতে সাহায্য করবেন। আমি ঠিক করেছি, বম্বেতে থাকতে হলে একটা গাড়ি দরকার।'

জিনতের মুখে ভাবলেশহীন।

বাবু গোপীনাথ মাতাল হয়ে গেছেন ততক্ষণে, ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ছেন। 'মন্টো সাহেব, আপনি পণ্ডিত লোক, আমি একটা গর্দভ ছাড়া কিছু নই। আমি আপনার কী কাজে লাগতে পারি আমাকে বলুন। এটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র যে স্যান্ডো কাল আপনার নাম বলেছিল।

~ www.amarboi.com ~

আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্যাক্সি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আর ওকে বলেছিলাম আমাকে আপনার কাছে নিয়ে যেতে। আমি যদি কোনও অসৌজন্য দেখিয়ে থাকি, আপনি অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি মহাপাতক, পাপী লোক ছাড়া কিছু নই, ভুলে ভরা একজন মানুষ। আপনাকে আর একটু হুইস্কি দিই?'

'না, আমরা সব্বাই যথেষ্ট পানটান করেছি', আমি বললাম।

তিনি আরও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন। 'মন্টো সাহেব, আপনাকে আর একটু খেতে হবে!' এক গোছা নোট বের করলেন তিনি, কিন্তু টাকা দেবার আগেই আমি সব টাকা তাঁর পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম। 'গুলাম আলিকে আপনি একশ টাকা দিয়েছেন আগে, দেননি?' আমি বললাম।

ঘটনাটা হল বাবু গোপীনাথের জন্য আমি দুঃখ পেতে শুরু করেছিলাম। একদল সুবিধাবাদী শোষক তাঁকে ঘিরে ধরেছিল আর তিনি এত সরল! বাবু গোপীনাথ হাসলেন। 'মন্টো সাহেব, ওই একশ টাকার নোট থেকে যেগুলো বেঁচে গেছে সব গুলাম আলির পকেট থেকে বেরিয়ে যাবে।'

কথাগুলো তাঁর মুখ থেকে বেরিয়েছে কি বেরোয়নি, গুলাম আলি ঘরে ঢুকল আর দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করল রাস্তায় কয়েকজন বদমাস লোক তার পকেট মেরেছে। বাবু গোপীনাথ আমার দিকে তাকালেন, হাসলেন, গুলাম আলিকে আর একটা একশো টাকার নোট দিলেন। 'তাড়াতাড়ি কিছু খাবারদাবার আনো।'

পাঁচ-ছবার দেখা হবার পর, বাবু গোপীনাথের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমি অনেক কিছু জানতে পারলাম। প্রথমত, তাঁকে যে বোকা বা শোষক বলে ভেবেছিলাম, সেটা ছিল ভুল। স্যান্ডো, গুলাম আলি আর সরদার, তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল যারা, তারা সকলেই যে স্বার্থপর ও সুযোগসন্ধানী তিনি সেটা ভালভাবেই জানতেন, কিন্তু তাঁর হাবভাব দেখে তাঁর মনের ভেতরকার চিন্তা অনুমান করা যেত না।

একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'মন্টো সাহেব, সারাটা জীবন, আমি কোনও উপদেশ উপেক্ষা করিনি। যখনই কেউ আমায় কিছু বলেছে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমি সেটা গ্রহণ করেছি। হয়তো তারা আমাকে বোকা ভেবেছে, কিন্তু তাঁদের জ্ঞানকে সমীহ করেছি। ব্যাপারটা এভাবে দেখুন। ওদের এই জ্ঞানটা আছে যে আমি এমন একটা মানুষ যাকে বোকা বানানো যাবে। ঘটনাটা হল, আমি আমার জীবনের বেশির ভাগটাই কাটিয়েছি ফকির, সাধুসন্ন্যাসী আর গায়িকাদের সঙ্গে। আমি ওদের ভালবাসি। ওদের বাদ দিয়ে আমি থাকতে পারি না। আমি ঠিক করেছি যখন আমার টাকাপয়সা ফুরিয়ে যাবে, কোনও আশ্রমে বা তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে থাকব। শুধু দুটো জায়গা আছে যেখানে আমার হৃদয় শান্তি পায় : বেশ্যাবাড়ি আর তীর্থক্ষেত্র। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার যখন আমি প্রথম জায়গাটায় আর যেতে পারব না, যেহেতু আমার টাকাপয়সা ফুরিয়ে আসছে, কিন্তু ভারতে তো হাজার হাজার তীর্থক্ষেত্র আছে, যে কোনও একটায় চলে যাব।'

'কোঠাবাড়ি আর তীর্থক্ষেত্র আপনি পছন্দ করেন কেন?' আমি জিগ্যেস করলাম।

~ www.amarboi.com ~

'কারণ দুটো প্রতিষ্ঠানই মায়ায় ভরা। যে নিজেকে ঠকাতে চায় তার কাছে এর চেয়ে ভাল আশ্রয় আর কী আছে?'

'গান গাওয়া মেয়েদের ভাল লাগে আপনার। আপনি কি সঙ্গীতের বোদ্ধা?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'একদমই না। ওটা কোনও ব্যাপারই নয়। সারা সন্ধে আমি একজন মোটা গলার মহিলার গান শুনে কাটিয়ে দিতে পারি, সুখী হতে পারি। ছোটখাটো ব্যাপার নিয়েই আবার সন্ধেগুলো কেটে যায়। কোনও মেয়ে গান গায়, আমি তার সামনে একটা একশো টাকার নোট দেখিয়ে দিই। সে লোভীর মতো আমার কাছে আসে অনেক জড়তা নিয়ে, আমার হাত থেকে টাকাটা তাকে নিতে না দিয়ে, আমার মোজার মধ্যে গুঁজে দিই। সে নিচু হয়ে আস্তে আস্তে টাকাটা বের করে। এই ধরনের বাজে বাজে কাজ আমাদের মতো লোকেরা উপভোগ করে। সবাই জানে, অবশ্যই, যে কোঠাবাড়িতে বাবা-মায়েরা মেয়েদের বেশ্যা তৈরি করে, আর তীর্থক্ষেত্রে মানুষেরা তাদের ঈশ্বরকে বেশ্যা বানিয়ে তোলে।'

আমি খবর নিয়ে জেনেছি বাবু গোপীনাথ একজন কৃপণ সুদখোর মহাজনের ছেলে, উত্তরাধিকার সূত্রে দশ লাখ টাকা পেয়েছেন, যেটা তিনি উড়িয়ে যাচ্ছেন সমানে। তিনি বম্বেতে এসেছেন পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে, আর যদিও এটা খুব একটা খরচের সময় নয়, তাঁর প্রতিদিনের খরচ তেমন কিছু কম ছিল না।

যেমন কথা দিয়েছিলেন, জেনোকে একটা গাড়ি কিনে দিলেন তিনি—একটা ফিয়াট—তিন হাজার টাকায়। একজন চালকও রাখা হল—অবিশ্বস্ত ছোটলোক ধরনের—কারণ বাবু গোপীনাথ এদের সঙ্গেই স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন।

আমাদের ঘন ঘন দেখা হতে লাগল। বাবু গোপীনাথের ওপর আমার আগ্রহ বাড়ছিল। আর উনিও আমার ওপর খুবই শ্রদ্ধাভক্তি দেখাচ্ছিলেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা, বাবু গোপীনাথের সঙ্গীসাথীদের মধ্যে এমন একজনকে দেখলাম যাকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি—মহম্মদ শফিক টুসি। গায়ক আর বুদ্ধিমান লোক বলে তার বিশাল খ্যাতি। শফিকের চরিত্রের আর একটা অস্বাভাবিক দিক ছিল, সেই সময়ের সমস্ত গান গাওয়া মেয়েদের সে পরিচিত প্রেমিক ছিল। যদিও সবাই ঠিক ঠিক জানত না, যে তার অন্যান্য প্রেমট্রেম ছিল, পরপর তিন বোনকে ভালবেসেছে, পাতিয়ালার এক বিখ্যাত গায়ক পরিবারের মেয়েদের।

এটাও কম লোকই জানত যে তাদের মা যৌবনে তার উপপত্নী ছিল। তার প্রথম স্ত্রী, বিয়ের কয়েক বছর পরেই মারা গিয়েছিল, সে পরোয়া করেনি, কারণ সেই স্ত্রী ছিল খুবই ঘরোয়া, আনন্দ দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। গৃহলক্ষ্মীদের জন্য তার মাথাব্যথা ছিল না। তার বয়স চল্লিশ, আর যদিও অনেক গান গাওয়া মেয়েদের সঙ্গ করেছে, সে নিজের গাঁট থেকে কিন্তু এক পয়সাও খরচা করেনি। সে প্রকৃতির পুরুষবেশ্যা।

বেশ্যারা তাকে সবসময় অপ্রতিরোধ্য মনে করত। যখন আমি ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢুকলাম, তাকে দেখলাম জিনতের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। বুঝতে পারলাম না কে তাকে বাবু

~ www.amarboi.com ~

গোপীনাথের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। আমি জানতাম স্যান্ডো ছিল ওর বন্ধু, কিন্তু তাদের তো কথা বলা বন্ধ ছিল। শেষকালে, দেখা গেল দুজনে ঠিক করেছে কিছু, স্যান্ডোই এখানে ওকে আজ নিয়ে এসেছে।

বাবু গোপীনাথ এক কোণে বসেছিলেন, হুঁকো খাচ্ছিলেন। তিনি কখনও সিগারেট খেতেন না। শফিক গল্প বলছিল, বেশির ভাগই অশ্লীল, সবই বেশ্যাদের আর বাঈজিদের নিয়ে। জিনত তেমন আগ্রহ দেখাল না, কিন্তু সরদারের আগ্রহ অসীম। 'আসুন, আসুন,' শফিক আমাকে বলল, 'আমি জানতাম না আপনিও একই পথের পথিক।'

স্যান্ডো চিৎকার করল, 'মৃত্যুর দেবদূতকে স্বাগত। ধরন তক্তা।'

কেউ দেখতে ভুল করেনি যে মহম্মদ শফিক টুসি আর জিনত পরস্পরের দিকে কামুক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। ব্যাপারটা খারাপ লাগল আমার। আমি জিনতের প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েছিলাম, আমাকে 'মন্টো ভাই' বলতে শুরু করেছিল।

যেভাবে শফিক অপাঙ্গে জিনতকে দেখছিল, আমার ভাল লাগছিল না। কিছুক্ষণ পর সে স্যান্ডোর সঙ্গে চলে গেল। আমি বোধহয় জিনতের সঙ্গে একটু খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছিলাম, কারণ শফিক আর জিনতের ব্যাপারে আমার অপছন্দের ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিলাম। সে কান্নায় ভেঙে পড়ল, পাশের ঘরে ছুটে গেল, সঙ্গে গেলেন বাবু গোপীনাথ। কয়েক মিনিট পর, বেরিয়ে এসে বললেন, 'মন্টো সাহেব, আমার সঙ্গে আসুন।'

জিনত বিছানায় বসে ছিল। আমাদের দেখে দু-হাতে মুখ ঢাকল আর শুয়ে পড়ল। বাবু গোপীনাথ খুব তুষ্ট। 'মন্টো সাহেব, এই মেয়েটাকে আমি ভালবাসি। দু-বছর ও আমার সঙ্গে ছিল, আমি সাধু হজরত ঘাউস আজম জিলানির নামে শপথ করে বলছি যে ও আমাকে ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কোনও সুযোগই দেয়নি। অন্য মেয়েরা, যাদের ও ডেকে আনতো, আমাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে তারা, বছরের পর বছর, কিন্তু ওর টাকার ওপর কোনও লোভ নেই। কখনও-সখনও, আমি কয়েক সপ্তাহের জন্য বাইরে যেতাম, হয়তো অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে, ওকে কোনও টাকা-কড়ি না দিয়েই। জানেন ও কী করত তখন? গয়নাগাঁটি বন্ধক দিয়ে চালিয়ে নিত যতদিন না আমি ফিরে আসি।

'মন্টো সাহেব, একবার আপনাকে বলেছিলাম, বেশিদূর যাওয়া আমার আর হবে না। আমার টাকাকড়ি প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আমি চাই না আমি চলে গেলে ওর জীবনটা নষ্ট হয়ে যাক। তাই ওকে আমি প্রায়ই বলি, জেনো, অন্য মেয়েদের দেখো, দেখে শেখো। আজ, আমার টাকা আছে, কাল আমি ভিখারি হয়ে যাব। মেয়েরা কেবল একজন ধনী প্রেমিক নিয়ে চলতে পারে না; তাদের অনেকজনকে দরকার। আমি চলে যাবার পর তুমি যদি অন্য কোনও টাকাওয়ালা বাবু না পাও, তোমার জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। তুমি গৃহবধূর মতো জীবনযাপন করছো, সারাদিন ঘরে বন্দি হয়ে আছো। এরকম করলে চলবে না।

'কিন্তু মন্টো সাহেব, এই মেয়েটা কোনও কম্মের নয়। আমি লাহোরে গফ্‌ফর সাঁইয়ের সঙ্গে কথা বলেছি, তিনি ওকে বম্বে নিয়ে আসার উপদেশ দিয়েছিলেন। দুজন বিখ্যাত

~ www.amarboi.com ~

অভিনেত্রীকে তিনি চিনতেন যারা লাহোরের বাঈজি ছিল। লাহোর থেকে আমি সরদারকে পাঠিয়েছিলাম জেনোকে কয়েকটা কায়দাকানুন শেখাবার জন্যে। গফ্‌ফর সাঁইও এসব ব্যাপারে খুব দক্ষ।

'বম্বেতে আমাকে কেউ চেনে না। ও ভয় পাচ্ছিল ওর জন্য আমার অসম্মান হবে, কিন্তু আমি ওকে বলেছি, বোকামি কোরো না। বম্বে একটা বড় শহর, কোটিপতিতে ভর্তি। আমি তোমাকে একটা গাড়ি কিনে দিয়েছি। একজন ধনী লোক খুঁজে নিচ্ছো না কেন যে তোমার দেখাশোনা করতে পারবে?

'মন্টো সাহেব, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, এটা আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা যে জেনো নিজের পায়ে দাঁড়াক। ব্যাঙ্কে ওর জন্যে আমি দশ হাজার টাকা জমা রাখতে রাজি আছি, কিন্তু আমি জানি দিন দশেকের মধ্যে সরদার ওকে কপর্দকহীন করে দেবে। মন্টো সাহেব, আপনি ওকে বাস্তববাদী হতে বলুন। ওর যখন একটা গাড়ি আছে, সরদার রোজ সন্ধেবেলা ওকে অ্যাপোলো বন্দরের সমুদ্রতীরে নিয়ে যাক, যেখানে অনেক শৌখিন লোক যায়। এভাবে কিন্তু কোনও কাজ হল না। স্যান্ডো আজ সন্ধ্যায় মহম্মদ শফিক টুসিকে নিয়ে এল, আপনি দেখলেন। ওর সম্পর্কে আপনার মত কী?'

মতামত দেব না বলেই ঠিক করলাম আমি। কিন্তু বাবু গোপীনাথ বললেন, 'ওনাকে দেখে তো বড়োলোক বলেই মনে হয়, দেখতেও সুদর্শন। জেনো, তোমার কি ওকে পছন্দ হয়?'

জেনো কিছু বলল না।

আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না বাবু গোপীনাথ কী বলছিলেন আমায় : তিনি জিনতকে বম্বেতে নিয়ে এসেছেন যাতে সে একজন ধনীলোকের সঙ্গিনী হতে পারে, কিংবা, অন্তত বড়োলোক ভাঙিয়ে খেতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তাই ছিল। ওর হাত থেকে তিনি যদি মুক্তি পেতে চাইতেন, সেটা হত তাঁর পক্ষে পৃথিবীর সহজতম কাজ, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তিনি যেটা বলছিলেন, ঠিক সেটাই। ওকে তিনি সিনেমায় নামানোর চেষ্টাও করেছেন, বম্বে যেহেতু ভারতের সিনেমা-রাজধানী। সিনেমার পরিচালক বলে পরিচয় দেয় এমন কিছু লোকের সঙ্গেও তিনি দেখা করেছেন, খাইয়েছেন, কিন্তু লাভ হয়নি কিছুই। ফ্ল্যাটে একটা টেলিফোনও নিয়েছিলেন। কোনও কিছু করেও তেমন একটা লোক পাওয়া গেল না যেমনটা তিনি খুঁজছিলেন।

মহম্মদ শফিক টুসি, যে মাসখানেক ধরে রোজ আসত, একদিন হঠাৎ, উধাও হয়ে গেল। নিখুঁত কায়দা, জিনতকে ভুলিয়ে ভালিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সুযোগটা কাজে লাগাল। বাবু গোপীনাথ আমায় বললেন, 'মন্টো সাহেব, ব্যাপারটা খুবই দুঃখের। শফিক সাহেবের সবটাই সাজানো, আসল মাল কিছুই নেই। জেনোকে সাহায্য করার জন্যে সে কিছুই করেনি বরং তাকে প্রবঞ্চনা করেছে, সব গয়না আর শ-দুয়েক টাকা নিয়ে নিয়েছে। এখন আমি শুনলাম সে আলমাস নামে একটা মেয়ের সঙ্গে লটঘট করছে।'

ঘটনাটা সত্যি। আলমাস পাতিয়ালার বিখ্যাত বাঈজি নাজিরজানের সবচেয়ে ছোট

~ www.amarboi.com ~

মেয়ে। যতগুলো মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে এটা তার মধ্যে চতুর্থ। জেনোর সব টাকা তার পেছনে ঢেলেছে, কিন্তু অন্য মেয়েদের মতো এ-ও বেশীদিন বাঁচেনি। গুজব রটেছিল পরিত্যক্ত হবার পর আলমাস বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল।

যাই হোক, মহম্মদ শফিক টুসিকে একেবারে ত্যাগ করেনি জিনত। সে আমাকে প্রায়ই ফোন করত, টুসিকে খুঁজে দিতে বলত, তার কাছে নিয়ে যেতে বলত। দুর্ঘটনাচক্রে একদিন আমি তাকে আকাশবাণীতে পাকড়াও করলাম। জিনতের কথা আমি যখন বললাম, সে বলল, 'এটাই প্রথম নয়। এরকম অনেক করেছি। সত্যি কথাটা হল জিনত বড় ভাল মেয়ে, আমার রুচির পক্ষে একটু বেশি ভাল। বউ-ধরনের মেয়েদের সম্পর্কে আমার কোনও আগ্রহ নেই।'

টুসি সম্পর্কে নিরাশ হয়ে জিনত সৈকতে যাতায়াত শুরু করল সরদারের সঙ্গে। সপ্তাহ দুয়েক পরে, সরদার দু-জন পুরুষ খুঁজে পেল ঠিক যেরকম তারা খুঁজছিল। তাদের মধ্যে একজন, সিল্কের কারখানা ছিল তার, জিনতকে চারশো টাকা দিয়েছিল, বিয়েও করতে চেয়েছিল, কিন্তু তার কাছ থেকে সেটাই শেষ কথা।

একদিন, হর্নসবি রোডের ধারে, জিনতের গাড়িটা দেখলাম, নাগিনা হোটেলের মালিক মহম্মদ ইয়াসিন গাড়ির পিছনের সিটে বসে আছে। 'গাড়িটা কোথায় পেলে?' আমি বললাম।

'তুমি কি জানো এটা কার?'

'আমি জানি।'

'তাহলে দু-য়ে দু-য়ে চার করো।' সে অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে চোখ টিপল।

দিনকয়েক পরে, বাবু গোপীনাথ গল্পটা বললেন। সরদার সমুদ্রের ধারে কাউকে পাকড়াও করেছিল আর তারা ঠিক করেছিল নাগিনা হোটেলে সন্ধেটা কাটাবে। ওদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল, লোকটা চলে গিয়েছিল, আর সেই সুযোগে হোটেল মালিক ইয়াসিন জিনতের জীবনে ঢুকে পড়ল।

জিনতের সঙ্গে ইয়াসিনের ভাবসাব বেশ ভালই এগোচ্ছিল। সে কয়েকটা দামি উপহারও কিনে দিয়েছিল, আর বাবু গোপীনাথ মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন লাহোরে ফিরে যাবার জন্যে, কারণ তিনি নিশ্চিত ছিলেন ইয়াসিনই সেই লোক জেনোকে যার হাতে বিশ্বাস করে তুলে দেওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশত ঘটনা সেদিকে গড়াল না।

একজন মা আর মেয়ে সম্প্রতি নাগিনা হোটেলে এসে উঠেছিল আর ইয়াসিন দ্রুত বুঝে নিয়েছিল মুরিয়েল নামের মেয়েটা সময় কাটানোর সঙ্গী খুঁজছে। তাই, জিনত যখন সারাদিন হোটেলে বসে ছিল, তাঁর অপেক্ষায়, ওরা দু-জন জিনতের গাড়িতেই সারা বম্বে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বাবু গোপীনাথ আহত হয়েছিলেন।

'এই মানুষগুলো কীরকম, মন্টো সাহেব?' তিনি আমায় জিগ্যেস করলেন, 'আমার মনে হয় কেউ যদি মেয়ে চায় কেউ তো সেটা সৎভাবে বলবে। আমি আজকাল জিনতকে বুঝতে পারি না। ও জানে কী চলছে, কিন্তু কেন বলছে না, ক্রিশ্চান ছুকরিটার সাথে যদি

~ www.amarboi.com ~

মিশতেই হয়, এইটুকু ভদ্রতা তো করতেই পারে যে ওর গাড়িটা ও যেন ব্যবহার না করে অন্তত। আমি কী করতে পারি, মন্টো সাহেব? ও একটা চমৎকার মেয়ে, ভারি সরল। এই পৃথিবীতে কীভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হয় ওকে শিখতে হবে।'

ইয়াসিনের সঙ্গে সম্পর্ক অবশেষে শেষ হয়ে গেল, কিন্তু তার কোনও প্রভাব জিনতের ওপর দেখা গেল না, অন্তত বাইরে থেকে। একদিন আমি ফ্ল্যাটে ফোন করলাম, জানলাম বাবু গোপীনাথ লাহোরে ফিরে গিয়েছেন, গুলাম আলি আর গফ্‌ফর সাঁইকে নিয়ে। তাঁর টাকা শেষ হয়ে গেছে, অল্প কিছু বিষয় সম্পত্তি যদিও এখনও রয়ে গেছে, সেগুলো বিক্রি করে তিনি বম্বে ফিরে আসার কথা ভাবছেন।

সরদারের মরফিন চাই, স্যান্ডোর পলসন মাখন। তারা তাই ফ্ল্যাটটাকে বেশ্যাখানা করে তোলার সিদ্ধান্ত নিল। দু-তিন জন লোককে তারা রোজ ধরে নিয়ে আসত জিনতের যৌন অনুগ্রহ পাবার জন্যে। তাকে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছিল বাবু গোপীনাথ না ফেরা পর্যন্ত। প্রত্যেক দিনের বরাত ছিল শ-খানেক টাকা, যার অর্ধেক জিনতের।

'তুমি কি বুঝতে পারছো তুমি নিজেকে নিয়ে কী করছো?' আমি একদিন তাকে বললাম।

'আমি জানি না, মন্টো ভাই', সে সরলভাবে উত্তর দিল, 'আমি শুধু তা-ই করি যা ওরা আমাকে করতে বলে।'

আমি বলতে চাইলাম যে সে বোকা আর এই দু-জন তাকে নিলামে বেচে দিতে দ্বিধা করবে না, যদি তেমন হয়। যাই হোক, আমি কিছু বললাম না। ও এমন একজন মেয়ে যার কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, আর অবিশ্বাস্য রকম সরল। নিজের মূল্য সম্পর্কে ধারণা ছিল না, জীবন সম্পর্কেও। নিজের শরীর বিক্রি করার জন্যে যদি তার জন্ম হত, সে সেটা অনেক বুদ্ধি আর কায়দা দিয়ে করতে পারত, কিন্তু ওর কোনও ব্যাপারেই আগ্রহ ছিল না, মদ্যপান, ধূমপান, খাওয়া-দাওয়া কিংবা যে সোফাটায় তাকে সারাদিন শুয়ে থাকতে দেখা যেত সেটাতেও, এমনকি টেলিফোনটাতেও, যেটা ব্যবহার করতে সে খুব ভালবাসত।

এক মাস পরে, বাবু গোপীনাথ লাহোর থেকে ফিরলেন। ফ্ল্যাটে গেলেন, কিন্তু দেখলেন সেখানে অন্য লোকজন থাকে। দেখা গেল, স্যান্ডো আর সরদারের পরামর্শে, বান্দ্রার দিকে একটা বাংলোর ওপর তলাটা ভাড়া নিয়েছে জিনত। বাবু গোপীনাথ যখন আমার কাছে এলেন, এই নতুন ব্যবস্থার কথা আমি তাকে বললাম, কিন্তু জিনতের কল্যাণে স্যান্ডো আর সরদার যে ব্যাপারটা চালাচ্ছে সে সম্পর্কে কিছুই বললাম না।

বাবু গোপীনাথ এবারে দশ হাজার টাকা নিয়ে এসেছেন। গফ্‌ফর সাঁই আর গুলাম আলিকে লাহোরে ফেলে এসেছেন। যখন আমাদের দেখা হল, তিনি জোর করলেন ওঁর সঙ্গে জিনতের ফ্ল্যাটে যেতে। রাস্তায় ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে এসেছেন।

বান্দ্রায় যেতে এক ঘণ্টা লাগল। পালি হিল দিয়ে যেতে যেতে, আমরা স্যান্ডোকে দেখলাম। 'স্যান্ডো, স্যান্ডো', বাবু গোপীনাথ চিৎকার করলেন। 'ধরন তক্তা', স্যান্ডো বলল, যখন দেখল কে ডাকছে।

~ www.amarboi.com ~

বাবু গোপীনাথ চাইছিলেন তাকে ট্যাক্সিতে আসতে, কিন্তু স্যান্ডো এল না। সে বলল, 'আপনাকে আমার কিছু বলার আছে'।

আমি ট্যাক্সির মধ্যে বসে রইলাম। দু-জনে কিছুক্ষণ কথা বলল ওরা, তারপর বাবু গোপীনাথ ফিরে এলেন আর ড্রাইভারকে শহরের দিকে ফিরে যেতে বললেন।

তাঁকে বেশ সুখী দেখাচ্ছিল। দাদারের কাছাকাছি আসতে, তিনি বললেন, 'মন্টো সাহেব, জেনোর বিয়ে হতে চলেছে'।

'কার সঙ্গে?' আমি জিগ্যেস করলাম, বেশ বিস্ময়ের সঙ্গে।

'হায়দ্রাবাদের সিন্ধ-এর এক ধনী জমিদারের সঙ্গে। ঈশ্বর ওদের দুজনের মঙ্গল করুন। সময়টাও ঠিকঠাক। আমার কাছে যা টাকাপয়সা আছে তা দিয়ে জেনোর জন্যে কন্যাপণ দেওয়া যাবে।'

গলাটা শুনে আমার কেমন সন্দেহ হল। আমি নিশ্চিত যে এটা বাবু গোপীনাথকে ঠকাবার আর একটা চাল। যাই হোক, দেখা গেল সবই সত্যি। ভদ্রলোক একজন ধনী সিন্ধি জমিদার যার সঙ্গে জেনোর পরিচয় হয়েছিল একজন সিন্ধি সঙ্গীতশিক্ষকের অফিসে, যিনি জেনোকে গান শেখাতে পারেননি।

একদিন তিনি গুলাম হুসেনকে নিয়ে এলেন—সেটাই ওই জমিদারের নাম—জিনতের আড্ডায় আর জেনো তাঁকে তার স্বাভাবিক আতিথেয়তায় অভ্যর্থনা করল। তাঁর আগ্রহে সে গালিবের গজলও গেয়ে শোনালো—'নুকতা চিন হ্যয় গম-এ-দিল উস্‌কো সুনাই না বনা'। গুলাম আলি স্তম্ভিত। সঙ্গীত শিক্ষক জিনতকে এটা বললেন, আর সরদার এবং স্যান্ডো হাতে হাত মেলাল সব ঠিকঠাক করার জন্যে, বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গেল।

একটা বিষয় আর একটা বিষয়ের দিকে যায়, এখন তারা বিবাহিত হতে চলেছে।

বাবু গোপীনাথ তো আনন্দে আটখানা। গুলাম হুসেনের সঙ্গে দেখা করলেন অনেক কষ্টে, নিজেকে স্যান্ডোর বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে। তিনি আমাকে পরে বলেছিলেন, 'মন্টো সাহেব, উনি দেখতে সুন্দর এবং বুদ্ধিমান। লাহোর ছাড়ার আগে, আমি দাতা গঞ্জ বক্সের মাজারে প্রার্থনা করেছিলাম জেনোর জন্য, এবং আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হল। ভগবান ওদের দু-জনকে সুখী করুন।'

বাবু গোপীনাথ বিবাহের সমস্ত আয়োজন করলেন। চার হাজার টাকা গেল গয়নাগাঁটি আর জামাকাপড়ে আর পাঁচ হাজার টাকা নগদ জিনতকে।

জিনতের পক্ষে বিবাহের অতিথি ছিলাম আমি, মহম্মদ শফিক টুসি আর মহম্মদ ইয়াসিন, নাগিনা হোটেলের মালিক। উৎসবের পর, স্যান্ডো ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'ধরন তক্তা'। গুলাম হুসেন সুদর্শন মানুষ। নীল স্যুট পরে সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। বাবু গোপীনাথকে ছোট্ট একটা পাখির মতো লাগছিল।

বিয়ের পার্টি চলছিল, বাবু গোপীনাথ ছিলেন অতিথি-সৎকারক। এক কোণে তিনি আমাকে বললেন, 'মন্টো সাহেব, আপনি দেখুন জিনতকে কনের বেশে কেমন দেখাচ্ছে।'

~ www.amarboi.com ~

পরের ঘরটায় গেলাম আমি। সেখানে জিনত ছিল, পরিচ্ছদ দামি রুপো-বসানো লাল শিল্কের শাড়ি। প্রসাধন কমই ছিল, কিন্তু ঠোঁটের রং ছিল বেশি। সে আমাকে মাথা নুইয়ে কুর্নিশ জানাল। ওকে খুব সুন্দর লাগছিল। যাই হোক, যখন অন্য দিকে তাকালাম, দেখলাম ফুলে ভরা একটা বিছানা, হাসি চাপতে পারলাম না। 'এটা কী ধরনের রসিকতা?' আমি তাকে জিগ্যেস করলাম। 'আপনি আমাকে নিয়ে মজা করছেন, মন্টো ভাই?' জেনো বলল, চোখে জল।

কী প্রতিক্রিয়া জানাব ভাবছি, বাবু গোপীনাথ এলেন। ভালবেসে রুমাল দিয়ে জেনোর চোখের জল মুছিয়ে দিলেন, বললেন, হৃদয়বিদারক এক কণ্ঠে, 'মন্টো সাহেব, আমি আপনাকে সবসময় একজন জ্ঞানী এবং অনুভূতিপ্রবণ মানুষ ভেবেছি। জেনোকে নিয়ে এসব মজা করার আগে, আপনার নিজের কথাগুলো ভেবে দেখার দরকার ছিল।'

আমার হঠাৎ মনে হল তিনি আমাকে যে সম্মান দেখিয়েছেন, তাতে ঘাটতি পড়ার কারণ আছে, কিন্তু তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবার আগে, তিনি হাতটা জিনতের মাথায় রেখে বললেন, 'ঈশ্বর তোমাকে সুখী করুন'।

তিনি ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় দেখলাম, তাঁর চোখ ভেজা, মুখে হতাশার ছায়া।

ভাষান্তর : সোমক দাস

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গন্ধ

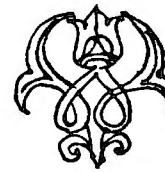

বৃষ্টিমুখর দিন। জানালার বাইরে অশ্বত্থের পাতা বৃষ্টিধারায় স্নান করছিল। সেগুনের সেই স্প্রিংওয়ালা পালঙ্কটি জানালার পাশ থেকে একটু ওদিকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। তাতে এক ঘাটিন (নিচু জাতের) যুবতী রণধীরের শরীরলগ্ন হয়ে শুয়ে আছে।

জানলার বাইরে অশ্বত্থের পাতাগুলি হালকা আঁধারে বৃষ্টিস্নাত হতে হতে কাঁপছিল আর ঝুমকোর মতো বেজে উঠছিল। সেই সঙ্গে সেই নীচবর্গের যুবতীটি কম্পন হয়ে রণবীরের শরীরে মিশে যাচ্ছিল।

সারাদিন এক ইংরেজি সংবাদপত্রের সমস্ত খবর আর বিজ্ঞাপন পড়ার পর, যখন সন্ধে নেমে আসছে, সে একটু স্বস্তি পেতে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখনই ওই ঘাটিন যুবতীকে সে তেঁতুলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। মেয়েটি সম্ভবত পাশের দড়ি কারখানায় কাজ করে। আর বৃষ্টি থেকে বাঁচতেই ওই গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিল। রণধীর গলাখাঁকারি দিয়ে মেয়েটিকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। এবং শেষ পর্যন্ত হাতের ইশারায় তাকে উপরে ডেকে নেয়।

কয়েকদিন থেকে সে তীব্র একাকিত্ব অনুভব করছিল। যুদ্ধের কারণে বম্বের প্রায় সমস্ত খ্রিস্টান ছুকরিরা— যাদের আগে খুব সস্তায় পাওয়া যেত— তাদের অধিকাংশই মহিলা অক্সিলারি ফোর্সে ভরতি হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ফোর্ট এলাকায় নাচের ইস্কুল খুলেছিল। সেখানে কেবল ফৌজি গোরাদের যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হত। রণধীর খুব হতাশ হয়ে পড়েছিল। তার হতাশার একটি কারণ হল, খ্রিস্টান মেয়েদের দুর্লভ হয়ে যাওয়া। আর দ্বিতীয় কারণ, ফৌজি গোরাদের তুলনায় যথেষ্ট সভ্য, শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান আর সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও ফোর্ট এলাকার প্রায় সমস্ত দরজা রণধীরের কাছে স্রেফ একারণে বন্ধ ছিল যে তার গায়ের চামড়া সাদা নয়।

যুদ্ধের আগে রণধীর নাগপাড়া আর তাজ হোটেলের আশেপাশে কয়েকটি খ্রিস্টান মেয়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করেছিল। এরকম মেলামেশার রীতিনীতি সম্পর্কে সে খুব

~ www.amarboi.com ~

ভালরকম ওয়াকিবহাল ছিল। এ-বিষয়ে সে ওইসব খ্রিস্টান ছোকরাদের তুলনায় বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। ওইসব মেয়েরা ফ্যাশনের মাপকাঠিতে খ্রিস্টান ছোকরাদের সঙ্গে রোমান্স করত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও বোকারামকেই বিয়ে করত।

রণধীর মনে মনে হেজলের নিত্যনতুন অহঙ্কারের বদলা নেওয়ার উদ্দেশ্যেই ওই সস্তা নীচবর্গের মেয়েটিকে ইশারা করে উপরে ডেকে নিয়েছিল। হেজল তার ফ্ল্যাটের নীচে থাকত। প্রতি সকালে সে তার উর্দি আর ছাঁটা চুলের উপরে খাকি টুপি তেরছা করে চড়িয়ে বেরিয়ে যেত। আর হেঁটে যেত এমন ঢঙে যেন ফুটপাতের পথচারীরা সকলে তার চলার পথে গালিচা বিছিয়ে দেওয়ার মতো করে শুয়ে পড়ছে!

রণধীর ভাবছিল, সে কেন ওই খ্রিস্টান মেয়েগুলির দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল? এতে কোনও সন্দেহ নেই যে ওরা ওদের শরীরের দর্শনীয় অঙ্গগুলি খোলামেলা প্রদর্শন করে। কোনওরকম আড়ষ্টতা ছাড়াই নিজেদের মাসিক ঋতুস্রাবের অনিয়ম সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করে। নিজেদের পুরনো প্রেমের গল্প শোনায়, আর যখন নাচের সুর বেজে ওঠে তখন পা নাচাতে শুরু করে দেয়। এগুলো সবই ঠিক আছে। কিন্তু যে কোনও মেয়ের মধ্যেই তো এসব গুণ থাকতে পারে।

রণধীর যখন ঘাটিন মেয়েটিকে ইশারা করে উপরে ডেকে নিয়েছিল তখন সে ভাবতে পারেনি যে সে তার সঙ্গে শুয়ে পড়বে! কিন্তু খানিকক্ষণ পর যখন সে মেয়েটির শরীরে ভেজা কাপড় দেখল, তখন তার মনে হল—বেচারির নিউমোনিয়া না ধরে যায়! রণধীর ওকে বলল— ভেজা কাপড় ছেড়ে ফেল, ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে!

মেয়েটি ওর মনোভাব বুঝে গিয়েছিল। চোখমুখ লজ্জারাঙা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রণধীর যখন তার সাদা ধুতি বের করে দিল, তখন সে খানিক ভেবে তার 'কাস্টা' খুলল। ভিজে যাওয়ার কারণে সেটি থেকে ময়লা বেরিয়ে আসছিল। কাস্টা খুলে সে একদিকে রেখে দিল এবং ধুতিটি দ্রুত উরুর উপর রাখল। তারপর মেয়েটি তার ছেঁড়াফাটা চোলি খোলার চেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে মারাঠি ভাষায় রণধীরকে কিছু বলল, যার অর্থ, আমি কী করি, খুলছে না যে!

রণধীর ওর পাশে বসে পড়ে চোলির গিঁট খোলার কাজে লেগে গেল। কিন্তু কিছুতেই যখন খুলল না, বিরক্ত হয়ে একহাতে চোলির একপ্রান্ত ধরল, আর অন্যহাতে অপর প্রান্ত ধরে সজোরে টান মারল। গিঁট খুলে গেল। রণধীরের হাত দু'পাশে সরে গেল। চোলির তলা থেকে দুটি কম্পিত স্তন বেরিয়ে এল। রণধীর মুহূর্ত মধ্যে দেখল, তার হাত দুটি সেই ঘাটিন মেয়েটির দুই স্তনে— কুশলী কুম্ভকার যেমন নরম তাল মাটিতে পেয়ালা বানায়— সেভাবেই দুটি পেয়ালার আকার দিয়ে ফেলেছে। তার সুপুষ্ট বুকে সেই যৌবনাভাষ, সেই আকর্ষক পেলবতা, সেই আর্দ্রতা আর সেইরকমই নরম-গরম শীতলতা, যেরকম কুম্ভকারের হাত থেকে বেরিয়ে আসা কাঁচা তৈজসপত্রে থাকে।

ধূসর রঙের সেই যুবতীর বুক সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক আর অদ্ভুত দ্যুতিময়! কালচে গম রঙের নীচে এক ধূসর বিভার পরত ছিল যা সেই অলৌকিক দ্যুতির জন্ম দিয়েছিল। এবং তা যেন

~ www.amarboi.com ~

দ্যুতি হয়েও ঠিক দ্যুতি ছিল না। ওর বক্ষদেশে স্তনের এই উদ্ভাস যেন পুকুরের গভীর তলদেশে পাঁকের ভিতর জ্বলতে থাকা প্রদীপ শিখা মনে হচ্ছিল।

সে ছিল বৃষ্টিমুখর দিন। জানালার বাইরে অশ্বত্থের পাতা সেরকমই কেঁপে উঠছিল। সেই নীচবর্গের যুবতীটির বৃষ্টিভেজা দুটি পোশাকই ময়লা আবর্জনার মতো মেঝেতে পড়েছিল। আর সে রণধীরের গায়ে গা লাগিয়ে শুয়েছিল। ওর নগ্ন, ময়লা শরীরের উষ্ণতা রণধীরের শরীরে সেই সুখস্পর্শ সৃষ্টি করছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় নাপিতের নোংরা অথচ গরম হামামে স্নান করলে যেরকম হয়।

পুরো রাতটাই সে রণধীরের গায়ে গা লাগিয়ে শুয়েছিল। দু'জনে যেন একে অপরের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। সারারাতে ওরা খুব জোর দু-একটি কথা বলেছিল। কেননা, যা কিছু ওদের বলার বা শোনার ছিল, সবই শ্বাস-প্রশ্বাস, ঠোঁট আর হাতের ব্যবহারে হয়ে যাচ্ছিল। রণধীরের হাত সারারাত ওর বুকের উপর বাতাসের স্পর্শের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। ওর ছোটো ছোটো স্তনাগ্র আর মোটা রোমকূপ যা স্তনবৃন্তকে চারপাশ থেকে এক কালো বৃত্তের মতো ঘিরে ছিল, তার হাতের বায়বীয় স্পর্শের ফলে তা জেগে উঠেছিল এবং সারা শরীরে এমন কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল যে রণধীর নিজেও মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠেছিল।

এরকম কম্পনের সঙ্গে রণধীরের পরিচয় অন্তত অসংখ্যবার হয়েছে। বেশ কিছু মেয়ের নরম, কঠিন বুকের সঙ্গে নিজের বুক ঠেকিয়ে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। সে এমন মেয়ের সঙ্গেও রাত কাটিয়েছে যে একেবারে আনকোরা, আনাড়ি। সে মেয়ে রণধীরের সঙ্গে শুয়ে নিজের ঘর-সংসারের সব কথাই শুনিয়ে দিয়েছে, যা আসলে অন্যের কাছে বলা উচিত নয়। আবার এমন মেয়ের সঙ্গেও রণধীর শারীরিক সম্পর্ক করেছে, যে সমস্ত পরিশ্রম নিজেই করত, রণধীরকে কষ্ট করতে দিত না। কিন্তু এই নীচবর্গের মেয়েটি—যে বৃষ্টিতে ভিজে তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়েছিল, আর যাকে সে হাতের ইশারায় উপরে ডেকে নিয়েছিল—সম্পূর্ণ অন্যরকম।

সারা রাত রণধীর ওর শরীর থেকে অদ্ভুত রকমের গন্ধ পাচ্ছিল। সেই গন্ধ একই সঙ্গে সুগন্ধ এবং দুর্গন্ধ মনে হচ্ছিল। সারা রাত সে সেই গন্ধ পান করেছে। ওর বগল থেকে, ওর বুক থেকে, ওর চুল থেকে, পেট থেকে...। ওর সর্বাঙ্গ থেকে সেই গন্ধ— যা একই সঙ্গে দুর্গন্ধ আর সুগন্ধ— রণধীরের প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাসে মিশে যাচ্ছিল। সারা রাত সে ভেবে কুলকিনারা পায়নি যে এই নীচবর্গের মেয়েটি তার এত কাছে থেকেও বেশি ঘনিষ্ঠ হতে পারত না যদি ওর শরীর থেকে এই গন্ধ না পাওয়া যেত! এই গন্ধ তার মন আর মস্তিষ্কের প্রত্যেক স্তরে ছড়িয়ে গিয়েছিল। ওর সমস্ত পুরনো ও নতুন স্মৃতির ভিতর ছড়িয়ে পড়েছিল।

আসলে সেই গন্ধই মেয়েটির প্রতি রণধীরকে এক রাতের জন্য প্রবৃত্ত করেছিল। দু'জনেই একে অন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছিল। অথৈ গভীরতায় নিমগ্ন হয়েছিল যেখানে পৌঁছে সে এক বিশুদ্ধ মানবিক অনুভূতিতে পরিণত হয়েছিল। সেই অনুভূতি, তা সে মুহূর্তের জন্যে হলেও, অন্তহীন বলে মনে হচ্ছিল। আসলে সেই অনুভূতি যেন ওড়ার জন্য

~ www.amarboi.com ~

প্রস্তুত হয়েও স্থির ও জড়বৎ ছিল। ওরা দু'জন এমন এক পাখি হয়ে গিয়েছিল, যারা আসলে আকাশের নীলিমায় উড়তে থাকলেও, দেখে মনে হত যেন স্থির হয়ে আছে।

সেই গন্ধটি যা ওই নীচবর্গের মেয়েটির প্রতিটি রোমকূপ থেকে নির্গত হচ্ছিল— রণধীর তা গভীরভাবে উপলব্ধি করলেও, তা বিশ্লেষণ করতে অক্ষম ছিল। ... যেরকম, কখনও কখনও মাটিতে জল ছিটিয়ে দিলে একরকম সোঁদা গন্ধ পাওয়া যায়...। কিন্তু না, সেই গন্ধ ছিল ভিন্ন কোনও ধারার। ওতে ল্যাভেন্ডার আর আতরের কৃত্রিমতা ছিল না। তা ছিল সম্পূর্ণ আসল, একেবারে নিজস্ব ধারার। নারী আর পুরুষের সম্মিলিত সম্পর্কের মতো আসল আর আদিম।

ঘামের গন্ধের প্রতি রণধীরের ছিল প্রচণ্ড বিরাগ। সে সাধারণত স্নানের পর বগলে সুগন্ধী পাউডার লাগাত। অথবা এমন কোনও ওষুধ ব্যবহার করত, যাতে ঘামের গন্ধ চাপা পড়ে যায়। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, সে বেশ কয়েকবার সেই নীচবর্গের মেয়েটির রোমভর্তি বগলে চুমু খেয়েছিল। তার একটুও ঘেন্না হয়নি। উপরন্তু অপূর্ব এক আস্বাদ অনুভব করেছিল। ওর বগলের নরম চুল ঘামে ভিজে গিয়েছিল। সেখান থেকেও সেই গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল যা ভালভাবে অনুভব করার চাইতেও অধিক পরিমাণে অননুভূত থেকে যাচ্ছিল। রণধীরের মনে হচ্ছিল, সে এই গন্ধটি চেনে। গন্ধটির অর্থও সে বোঝে। কিন্তু অন্য কাউকে সে তা বোঝাতে পারে না।

সেরকমই বৃষ্টিমুখর দিন ছিল। জানালার বাইরে সে যখন তাকিয়েছিল, অশ্বত্থের পাতাগুলি কাঁপতে কাঁপতে স্নান করছিল। বাতাস বয়ে যাচ্ছিল শনশন শব্দে। অন্ধকার ছিল। কিন্তু তাতে চাপা ধূসর আলো মিশে গিয়েছিল। যেন তারাদের ক্ষীণ আলো বৃষ্টিবিন্দুর গায়ে লেগে নীচে নেমে এসেছে। এরকমই এক বৃষ্টির দিন ছিল তা, যখন রণধীরের ওই ঘরে কেবল একটিমাত্র সেগুনকাঠের পালঙ্ক ছিল। কিন্তু এখন সেটির পাশে আরও একটি পালঙ্ক রাখা হয়েছে। এবং ওই কোণার দিকে নতুন ড্রেসিং টেবিলও রয়েছে। দিনটি কিন্তু সেরকমই এক বর্ষার দিন। আবহাওয়া পুরোপুরি সেরকম। বৃষ্টিবিন্দুর সঙ্গে তারাদের ক্ষীণ আলোও নেমে এসেছে। কিন্তু চারপাশের বাতাসে হেনার আতরের তীব্র সুগন্ধ জমাট হয়ে চেপে বসেছে।

অন্য পালঙ্কটি খালি ছিল। আর সেই পালঙ্কে, যার উপর রণধীর ঘাড় তুলে শুয়েছিল, সেখান থেকে সে জানালার বাইরে অশ্বত্থের কাঁপতে থাকা পাতায় বৃষ্টিবিন্দুর নাচ দেখছিল। একটি টুকটুকে ফর্সা মেয়ে বিছানাটিকে তার নগ্ন শরীর দিয়ে ঢেকে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওর লাল সিল্কের শালোয়ার অন্য পালঙ্কের উপর পড়েছিল। শালোয়ারের গাঢ় লাল রঙের ফিতের একপ্রান্ত পালঙ্কের নীচে ঝুলছিল। সেই পালঙ্কে তার অন্য কাপড়চোপড়ও পড়েছিল। ওর সোনালি ফুলকাটা কামিজ, বক্ষবন্ধনী, জাঙ্গিয়া আর দোপাট্টা— সবকিছুরই রং ছিল গাঢ় লাল। আর সবকিছুই হেনাগন্ধী আতরের তীব্র গন্ধে ম ম করছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মেয়েটির কালো চুলে কুমকুমের গুঁড়ো ধুলোর মতো লেগেছিল। তার মুখমণ্ডলের লালিমা, প্রসাধন আর কুমকুম গুঁড়ো— সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক নিষ্প্রাণ, নিষ্প্রভ রং তৈরি করেছিল। ওর ফর্সা স্তনে বক্ষাবরণীর কাঁচা রং জায়গায় জায়গায় লাল দাগ এঁকে দিয়েছিল।

স্তন দুটি ছিল দুধের মতো সাদা। আর তাতে এক-আধটু নীল আভার ছোঁয়া ছিল। বগলের চুল চেঁছে ফেলা হয়েছিল। সেখানে লালচে আভা দেখা যাচ্ছিল। রণধীর বেশ কয়েকবার সেই মেয়েটির দিকে তাকাল। দেখে তার মনে হল, সে যেন এখনই কোনও বন্ধ বাক্সের পেরেক তুলে মেয়েটিকে বার করে এনেছে। যেভাবে বইপত্র আর চিনেমাটির বাসন সে পার্সেল বাক্সের ভিতর থেকে বার করে থাকে। তাতে বইয়ের উপর চাপ পড়ার দাগ আর বাসনপত্রে ঘসটানির দাগ পড়ে যায়। ঠিক সেরকমই ওই মেয়েটির শরীরের বেশ কয়েক জায়গায় দাগ পড়েছিল।

রণধীর যখন মেয়েটির আঁটোসাঁটো বক্ষপেটিকার ফিতে খুলেছিল, তখন তার পিঠে আর বুকের নরম মাংসে তার দাগ দেখেছিল। এবং কোমরের আশেপাশে গভীর হয়ে বসে যাওয়া ইজারবন্দের দাগ। ভারী সুচলো জড়োয়া নেকলেসের কারণে তার বুকের কয়েক জায়গায় আঁচড়ানোর দাগ ছিল, যেন নখ দিয়ে বেশ জোরে জোরে চুলকানো হয়েছে।

সেরকমই বর্ষার দিন ছিল। অশ্বত্থের কচি নরম পাতায় সেরকমই বৃষ্টিপাতের শব্দ হচ্ছিল, যেরকম রণধীর সেদিন সারারাত শুনেছিল। আবহাওয়াও সুন্দর ছিল। শীতল বাতাস বইছিল। কিন্তু তাতে হেনার আতরগন্ধ মিশে গিয়েছিল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত রণধীর সেই ধবধবে ফরসা মেয়েটির কাঁচা দুধের মতো সাদা স্তনে বাতাসের স্পর্শের মতো তার হাত বুলিয়ে যাচ্ছিল। ফলে তার আঙুলগুলি সেই ফরসা শরীরে কয়েকবার চকিত কাঁপুনি অনুভব করেছিল। সেই নরম শরীরের কয়েকটি খাঁজের অন্তর্গত কাঁপুনিও সে লক্ষ করেছিল। আর যখন সে তার বুক মেয়েটির বুকের উপর চেপে ধরেছিল, তখন তার শরীরের প্রতিটি রোমকূপ মেয়েটির শরীর-সেতারে বেজে ওঠা ঝঙ্কার শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু শরীরের সেই ডাক, সেই আবেদন কোথায়? সেই ডাক যা সে ঘাটিন মেয়েটির শরীর-গন্ধে শুনতে পেয়েছিল? সেই ডাক ছিল দুধের জন্য কেঁদে ওঠা শিশুর কান্নার চাইতেও অধিক সংবেদনশীল। সেই ডাক শ্রবণেন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করে নিঃশব্দ হয়ে গিয়েছিল।

রণধীর লোহার শিক লাগানো জানালা থেকে বাইরে তাকিয়েছিল। ওর খুব কাছেই অশ্বত্থের পাতা কেঁপে যাচ্ছিল। কিন্তু সে ওই পাতার কাঁপনের অপর প্রান্তে— অনেক ... অনেক দূরে দেখার চেষ্টা করছিল। সেখানে সে এক ধূসর বাদল দিনে এক অদ্ভুত বিমিশ্র আবছা আলো দেখতে পাচ্ছিল। যেরকম আলো সে ঘাটিন মেয়েটির স্তনে লক্ষ করেছিল। সেই আলো ছিল গোপন কথার মতো লুকানো, কিন্তু উন্মুক্ত।

রণধীরের বাহুবন্ধনে এক টুকটুকে ফর্সা মেয়ে শুয়েছিল যার শরীর দুধ আর ঘি মাখানো ময়দার মতো তুলতুলে, মোলায়েম। তার শরীর থেকে হেনার আতরের খুশবু পাওয়া যাচ্ছিল। ওকে একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। কিন্তু এই দমবন্ধ-করা আর মরণোন্মুখ গন্ধ

~ www.amarboi.com ~

রণধীরের কাছে অত্যন্ত অসহনীয় মনে হল। খানিকটা টোকো গন্ধ ছিল সেটা। অদ্ভুতরকমের টোকো, যেরকম বদহজমের ঢেঁকুর তুললে পাওয়া যায়।

রণধীর তার বাহুপাশে শুয়ে থাকা মেয়েটির দিকে তাকাল। দুধ কেটে যাওয়ার পর সাদা নির্জীব ফুটকিগুলি যেভাবে বর্ণহীন জলে জমাট বাঁধে, সেভাবেই ওই মেয়েটির নারীত্ব সাদা কলঙ্কচিহ্ন হয়ে তার অস্তিত্বের মধ্যে স্থির হয়ে গিয়েছিল।... আসলে, সেই গন্ধ রণধীরের মনের গভীরে ঘাঁটি গেড়ে বসে গিয়েছিল। গন্ধটি ওই ঘাটিন মেয়েটির শরীর থেকে কোনও বাহ্যিক প্রচেষ্টা ছাড়াই আপনা-আপনি বেরিয়ে এসেছিল। সেই গন্ধ ছিল হেনার আতর-গন্ধের চেয়েও হালকা আর স্বতঃস্ফূর্ত। সে গন্ধ শোঁকার দরকার হয় না, আপনা আপনি নাকে চলে আসে আর তার সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।

রণধীর শেষবারের মতো চেষ্টা করে মেয়েটির দুধসাদা শরীরে হাত বুলাতে লাগল। কিন্তু সে কোনও উত্তেজনা অনুভব করল না। তার সেই নববিবাহিতা স্ত্রী, যে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে, বি.এ. পাস, এবং যে মেয়ে তার কলেজের শতেক ছেলের 'হৃদয়ের রানি'— সেই মেয়ে রণধীরের শিরায় রক্তের গতি দ্রুত করতে পারল না। নিঃশেষ হয়ে আসা হেনার সুগন্ধের ভিতর রণধীর সেই গন্ধ খুঁজে বেড়াতে লাগল, যা সে এমনই এক বর্ষার দিনে, জানালার বাইরে অশ্বত্থের পাতা যখন বৃষ্টিতে স্নান করছিল, তখন সেই ঘাটিন মেয়েটির ময়লা শরীর থেকে পেয়েছিল।

ভাষান্তর : মবিনুল হক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কালো শালোয়ার

দিল্লি আসার আগে সে অম্বালা ক্যান্টনমেন্টে থাকত। সেখানে অনেক শ্বেতাঙ্গ খদ্দের তার কাছে আসত। তাদের কাছ থেকেই সে কিছু ইংরেজি বাক্য শিখেছিল। সুলতানা ওই কথাগুলি কথাবার্তায় ব্যবহার করত না। কিন্তু দিল্লি আসার পর, যখন তার জীবনধারণ সহজ হয়ে উঠছিল না, সে তার প্রতিবেশী তামানচাজানকে একদিন বলে ফেলল, 'দিস লাইফ? ভেরি ব্যাড, তুমি তোমার পেটের জন্যও বেশি কিছু রোজগার করতে পারবে না।'

আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে সে খুব ভালই ছিল। ব্রিটিশ টমি সোলজাররা মদ্যপ অবস্থায় তার কাছে প্রায়ই আসত। তিন চার ঘণ্টার ভিতরে সে ন'দশ জনকে সামলে কুড়ি তিরিশ টাকা রোজগার করতে পারত। এই টমিরা তার সঙ্গে তার অন্য স্বজাতির চেয়ে ভাল ব্যবহার করত। সত্যি যে সুলতানা তাদের ভাষা বুঝত না, কিন্তু তার এই অজ্ঞতাই তাকে সাহায্য করত অনেকটা। যদি তাদের কেউ অতিরিক্ত কিছু দাবি করত, সে বলত, 'সায়েব, তুমি কী বলছ তা আমি বুঝতে পারছি না।' আর তারা যদি তার উপর খুব বেশি চাপ সৃষ্টি করত, সে তার নিজের ভাষায় তাদের গালাগালি দিতে আরম্ভ করত। তারা হতবুদ্ধি হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকত। সে উর্দুতে বলতে, সায়েব, তুমি একটা গোমূর্খ, একটা সত্যিকারের বেজন্মা, তুমি কি বুঝতে পারছ? দরদী গলায় সে এই কথা বলত। শুনে টমি সোলজাররা হাসত, আর সেই সময় তাদের বেজন্মার মতোই দেখাত।

কিন্তু দিল্লি আসার পর থেকে একজন টমিও তার কাছে আসেনি। সে এখানে তিন মাসের মতো রয়েছে, সে জানে এই শহরে রাজা মহারাজারা বাস করেন, কিন্তু তিন মাসে মাত্র ছ'জন খদ্দের তার কাছে এসেছে। মাত্র ছ'জন, মানে মাসে দু'জন। খোদা দেখেছেন সব, সে মাত্র আঠেরো টাকা আট আনা রোজগার করেছে ওই ছ'জন খদ্দেরের কাছ থেকে। খোদাই জানেন কেন ওই খদ্দেরদের একজনও তার দাম তিন টাকার বেশি বলে ভাবতে পারেনি। সে তাদের পাঁচজনকে বলেছিল, তার দাম দশ টাকা, তখন অবাক হয়ে প্রত্যেকের কাছেই শুনেছিল, তিন টাকার এক পয়সাও বেশি হতে পারে না তার দাম। পরে

~ www.amarboi.com ~

যখন ছ'নম্বর এল তার কাছে, সে বলল, 'দ্যাখো, আমি প্রত্যেকবার তিন টাকা দাম ধার্য করেছি এই কাজের জন্য, তার এক পয়সাও কম নয়, এখন তুমি কী করবে ভেবে দ্যাখো, তুমি থাকতে পার, যেতেও পারো।'

লোকটি তর্কে না গিয়ে থেকে গেল। যখন তারা অন্য ঘরে গেল, খদ্দেরটির কোট খুলে নিতে নিতে সে বলল, 'আর এক টাকা দিতে হবে দুধের জন্য।'

লোকটি তাকে এক টাকা না দিয়ে পরিবর্তে রাজার মুখের প্রতিকৃতিওয়ালা নতুন চকচকে আট আনার একটি মুদ্রা দেয় পকেট থেকে বের করে। সেও আপত্তি না করে মুদ্রাটি নিতে নিতে ভাবে, ভালই তো, কিছু না পাওয়ার চেয়ে এই ভাল।

তিন মাসে সাড়ে আঠোরো টাকা—আর তার ওই ঘরের ভাড়া মাসে কুড়ি টাকা। তার বাড়ির মালিক ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে ওই ঘরকে বলত ফ্ল্যাট। ওই ফ্ল্যাটের টয়লেটে একটা চেন ছিল যা টানলেই তীব্র বেগে জল বেরিয়ে এসে ময়লায় সমস্ত পায়খানা ভর্তি করে দিত। এই সময় এক ভয়ানক আওয়াজ হত, যার ফলে প্রথমে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। প্রথম দিনে যখন সে ওই টয়লেটে ঢুকে পায়খানায় বসে, আচমকা কোমরে এক তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা বোধ করায় ঝুলন্ত চেনটি ধরে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। চেনটি দেখে তার মনে হয়েছিল যেহেতু ফ্ল্যাটটি তাদের জন্য সংস্কার করা হয়েছে, ওই চেনটি তাদের ওঠার সুবিধের জন্যই লাগানো হয়েছে। কিন্তু চেন ধরে টান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনতে পায় মাথার উপরে আর তার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র জলোচ্ছ্বাস। সে এত ভয় পেয়েছিল যে আর্তনাদ করে ওঠে। খুদা বক্স তখন পাশের ঘরেই ছিল তার ফোটোগ্রাফির সরঞ্জাম নিয়ে। সে একটা পরিষ্কার বোতলে হাইড্রোকুইনোন ভরছিল। সেই সময় সুলতানার আর্তনাদ শুনতে পেয়ে সে দ্রুত বেরিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে, তুমি কি চিৎকার করছিলে?'

সুলতানার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গিয়েছিল। সে বলতে থাকে, 'কী জঘন্য এই টয়লেট, ওখানে ওই চেনটা ঝুলছে রেলের কামরায় যেমন থাকে, কেন? আমি কোমরে একটা ব্যথা অনুভব করে ভাবলাম চেনটা ধরে উঠব, কিন্তু ওটা ধরা মাত্তর যেন ভয়ঙ্কর একটা বিস্ফোরণ হয়ে গেল, কী ভীষণ শব্দ...'

খুদা বক্স হাসতে লাগল মাথা তুলে। তারপর সে বোঝাতে লাগল, 'এটা নতুন ধরনের টয়লেট, তুমি চেন টানা মাত্তর সব ময়লা মাটির তলায় চলে যাবে।'

খুদা বক্স আর সুলতানা কী করে পরস্পরকে চিনেছিল তা এক দীর্ঘ কাহিনি। সে রাওয়ালপিণ্ডির লোক। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশের পর সে লরি চালানো শেখে। রাওয়ালপিণ্ডি-কাশ্মীর রুটে সে চার বছর লরি ড্রাইভারের কাজ করে। তারপর সে একটা মেয়েকে নিয়ে সেখান থেকে লাহোরে চলে এসে তাকে বেশ্যাবৃত্তিতে লাগিয়ে দেয়। দু' তিন বছর এইভাবে যাওয়ার পর মেয়েটি আর একজনকে নিয়ে তার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। মেয়েটি আম্বালায় আছে জানতে পেরে খুদা বক্স আম্বালায় আসে তার খোঁজে। আম্বালাতেই তার সঙ্গে সুলতানার দেখা হয়। সুলতানার তাকে পছন্দ হয়। তাদের মিলিত হওয়ার কাহিনি হল এই।

~ www.amarboi.com ~

খুদা বক্সের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সুলতানার ব্যবসা উত্তুঙ্গে ওঠে। সে ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক নারী, তাই সিদ্ধান্তে আসে যে খুদা বক্স হল সেই মানুষ যার ভিতরে এক দৈব ক্ষমতা আছে, সেই কারণেই তার ব্যবসা বেড়ে গেছে। এই ঘটনাই খুদা বক্সকে তার চোখে আলাদা করে দেয়।

খুদা বক্স ছিল কঠোর পরিশ্রমী। সে কোনও কিছু না করে সারাদিন অলস হয়ে বসে থাকার কথা ভাবতেই পারত না। সে এক ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে বন্ধুতা করেছিল। ফোটোগ্রাফারটি রেল স্টেশনের বাইরে পোলারয়েড ক্যামেরায় ছবি তুলত। এই লোকটি খুদা বক্সকে ফোটোগ্রাফির কিছু পাঠ দিয়েছিল। খুদা বক্স তখন সুলতানার কাছ থেকে ষাট টাকা নিয়ে একটি ক্যামেরা কিনে ফেলে। ক্রমে ক্রমে সে একটি পর্দা কেনে, দুটো চেয়ার আর ফিল্ম ডেভলপের জন্য কিছু জিনিশ কিনে নিজের স্টুডিও করে নেয়। সে ভালই কাজ করছিল, খুব তাড়াতাড়ি আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে। তার স্টুডিওতে সে টমি সোলজারদের ছবি তুলত। মাসের ভিতরে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার বড় বৃত্তের ভিতরে সে পরিচিত হয়ে ওঠে। সুতরাং সে সুলতানার কাছেও যায়। তার ফলে অনেক টমিও যায় সেখানে। সুলতানার আয় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়।

সুলতানা নিজের জন্য কানের দুল কেনে। আটটা সোনার বালাও কিনতে পারে। প্রত্যেকটির ওজন সাড়ে পাঁচ তোলার মতো হবে। সে দশ পনেরটা ভাল শাড়ি কিনল। তাদের ঘরের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবও কেনে। মোদ্দা কথা আম্বালাতে সে বেশ ভাল ছিল। ঠিক সেই সময়, ওপরঅলাই জানেন কেন, খুদা বক্সের মাথায় দিল্লি যাওয়ার পরিকল্পনা ঘুরতে লাগল। সুলতানা কী করে তা প্রত্যাখ্যান করে? সে বিশ্বাস করত তার সৌভাগ্যের কারণই খুদা বক্স। সে আনন্দের সঙ্গেই সম্মতি দেয়। সে ভেবেছিল, দিল্লির মতো বড় শহর, যেখানে রাজা মহারাজারা বাস করেন, সেখানে তার ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠবে। তার সখীদের কাছে দিল্লির গুণগান শুনেছিল সে। আর খাজা নিজামুদ্দিনের দরগার কথা শুনে সে মনে মনে খুবই আধ্যাত্মিক টান অনুভব করে দিল্লির প্রতি। দ্রুত বড় বড় জিনিশ সব বিক্রি করে তারা দিল্লির দিকে রওনা হয়। দিল্লিতে তারা মাসিক কুড়ি টাকা ভাড়ায় একটি ফ্ল্যাট নেয়।

রাস্তার ধরে এক দীর্ঘ সারির নতুন বাড়িগুলির ভিতরে তাদের বাড়িটিও। পৌর নিগম শহরের এই অংশটির পরিকল্পনা করেছিল বেশ্যালয়ের জন্য, যাতে তারা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়তে না পারে। বাড়িগুলির নীচের তলায় দোকানপাট, তার উপরে দুটি করে তলা। যেহেতু একই নকসা ব্যবহার করা হয়েছিল প্রত্যেকটি বাড়ি নির্মাণে, প্রথম প্রথম সুলতানার খুব অসুবিধে হত নিজের বাড়ি চিনতে। সেই সময় এক লনড্রিওয়ালা তার ফ্ল্যাটের নীচে দোকানঘর নিয়ে লনড্রি খুলে 'এখানে কাপড় কাচা হয়' লিখে একটি সাইন বোর্ড লাগিয়ে দেয়। ওইটিই তার বাড়ির চিহ্ন-নির্দেশক হয়ে যাওয়ার কারণে নিজেদের ফ্ল্যাটিটিকে দ্রুত খুঁজে পেতে তার সুবিধে হয়। ওই ভাবেই সে আরও অনেক চিহ্ন-নির্দেশক স্থির করে নিয়েছিল বিভিন্ন প্রয়োজনে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তার বন্ধু হিরা বাঈ, যে একসময় রেডিওতে গান গেয়েছিল, তার বাড়িটি ছিল একটি দোকানের উপর যে দোকান খুব বড় বড় অক্ষরে লিখে দিয়েছিল যে সেখানে কয়লা বিক্রি হয়।

~ www.amarboi.com ~

তাছাড়া, 'ভদ্রলোকের জন্য অসাধারণ রন্ধন হয়' এই ঘোষণা যে দোকানে ছিল তার উপরে সুলতানার আর এক বন্ধু মুখতার থাকত। যে কারখানাটিকে বিছানার জন্য চওড়া চওড়া ফিতে বানাত, তার উপরে থাকত নুরি। নুরি সেই কারখানার মালিককে নিয়মিত সঙ্গ দিত। আর যেহেতু কারখানার মালিককে তার কারখানাটির উপর রাতে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হত, সে নুরির কাছে রাতে থেকে যেত।

প্রথমে যখন তুমি একটি দোকান চালু করবে, তুমি কখনওই আশা করতে পারবে না, খরিদ্দাররা ঠিকঠাক আসতে থাকবে—প্রথম মাসে কোনও খরিদ্দার না পেয়ে নিজেকে এই ভাবে প্রবোধ দিয়ে সুলতানা নিশ্চিন্ত বোধ করেছিল। কিন্তু দুমাস যাওয়ার পরও যখন কেউ তাকে কোনও প্রস্তাব দিল না, সে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সে খুদা বক্সকে জিজ্ঞেস করল, 'এর মানে কী বলতে পারো? আমরা পুরো দুমাস এখানে রয়েছি, একজনও আমাদের কাছে এল না, আমি জানি এখন ব্যবসায় মন্দার দিন, কিন্তু এমন মন্দা নয় যে একজনও সারা মাসে ফিরেও তাকাবে না তোমার দিকে।'

এতদিন কিছু না বললেও খুদা বক্স এই ব্যাপার নিয়ে মনে মনে সমস্যার ভিতরে ছিল। এখন সুলতানা নিজেই বিষয়টির অবতারণা করলে সে বলল, 'আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি, আমার মনে হয় মানুষ এখন যুদ্ধ নিয়েই বেশি ব্যস্ত, তার বাইরে কিছু ভাবতে পারছে না অথবা এমনও হতে পারে...'

যা হোক সে তার পরের কথাটি বলতে যাচ্ছে যখন, তারা শুনতে পায় কেউ সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। খুদা বক্স এবং সুলতানা উৎকর্ণ হয়ে থাকে। একটু পরেই দরজায় টোকা পড়ে। খুদা বক্স তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দেয়, লোকটি ভিতরে প্রবেশ করে। এইটিই ছিল তাদের প্রথম খদ্দের এবং তারা তিনটাকা দাম ধার্য করে সেই খদ্দেরের জন্য। তার পর আরও পাঁচজন আসে, তার মানে তিন মাসে ছ'জন এবং সুলতানা পেল সাড়ে আঠেরো টাকা।

মাসে কুড়ি টাকা ফ্ল্যাট ভাড়া। জল এবং ইলেকট্রিসিটি বিলের খরচ আলাদা। এবং গৃহস্থালির অন্যান্য খরচ—খাদ্য, পানীয়, কাপড়চোপড়, ওষুধে। কোনও আয় নেই। তিন মাসে সাড়ে আঠেরো টাকা আয়ের ভিতরেই পড়ে বলে মনে করা যায় না। সুলতানা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিল। পাঁচ তোলা করে আটটি বালা একে একে বিক্রি হয়ে গেল। যখন শেষ বালাটি বিক্রির জন্য পড়ে ছিল, সে খুদা বক্সকে বলল, 'শোনো, আমরা আম্বালায় ফিরে যাই, এখানে আমাদের জন্য কিছুই নেই, আর যদি কিছু থেকেও থাকে, আমার এখানে ভাল লাগছে না। আম্বালায় তুমিও ভাল আয় করতে। চলো আমরা ফিরে যাই, আমাদের সব লোকসান পুষিয়ে নেব ওখানে। এটা আমার শেষ গয়না। যাও বিক্রি করে এস, এর ভিতরে আমি গোছগাছ করে নিই। আমরা আজ রাতের ট্রেনেই রওনা হব।'

খুদা বক্স তার কাছ থেকে গয়নাটা নিয়ে বলল, 'না, সুলতানা, আমরা ফিরছি না, আমরা আমাদের ব্যবস্থা এই দিল্লিতেই করে নেব। তুমি তোমার সব গয়না এখানেই ফেরত পাবে, আল্লাতালার উপরে বিশ্বাস রাখো, তিনিই দেন আর এখানে আমাদের তিনিই কোনও উপায় বের করে দেবেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুলতানা কোনও কথা না বলে তার শেষ বালাটি হাত থেকে খুলে তাকে দিয়ে দিল। নিজের খালি হাত দেখে তার ভিতরে গভীর বিমর্ষতা এল। কিন্তু সে আর কী বা করতে পারত? পেটের জন্য তাদের কোনও না কোনও উপায় খুঁজে বের করতে হবেই।

পাঁচ মাস কেটে গেল। কিন্তু তাদের ব্যায়ের এক চতুর্থাংশও আয় হয়ে ওঠেনি। সুলতানা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে লাগল। এই সময়ে খুদা বক্স দিনের বেশির ভাগটাই বাইরে কাটিয়ে আসত, তার ফলে সে আরও ভেঙে পড়তে লাগল। যদিও সেখানে আরও প্রতিবেশী ছিল যাদের কাছে গিয়ে সুলতানা কিছুটা সময় কাটিয়ে আসতে পারত, কিন্তু দীর্ঘ সময় কাটানোর জন্য অন্যের বাড়ি গিয়ে বসে থাকা তার পছন্দ হত না। সুতরাং ধীরে ধীরে সে তার যাওয়া কমিয়ে দিতে লাগল। পরিবর্তে সে তার শূন্য ঘরে একা একা বসে থাকত। কখনও সে সুপারি কুচোত, কখনও পুরনো শাড়ি-কাপড় সেলাই করত একা একা। মাঝে মাঝে ব্যালকনিতে গিয়ে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়াত, উদ্দেশ্যহীন ভাবে তাকিয়ে থাকত চলমান রাস্তার দিকে, ওপারের রেল ইয়ার্ডের মাল গাড়ির ইঞ্জিনের দিকে। রাস্তার ওপাশে একটা গুদাম ঘর ছিল এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি লম্বা। গুদাম ঘরের ডান দিকে পাকা ছাদের নীচে সমস্ত রকম জিনিসের গাটরি স্তূপাকার হয়ে ছিল। বাঁ দিকে একটা খালি জায়গা দেখা যায়, যেখানে রেলের অসংখ্য লাইন গলাগলি করে আছে। সুলতানা যখন দেখত রেল লাইনের লোহার পাত রৌদ্রে ঝকঝক করছে, সে তার হাতের দিকে তাকাত, দেখত নীল হয়ে থাকা শিরাগুলি রেল লাইনের মতো ফুটে উঠেছে। সেই দীর্ঘ খোলা জায়গায় রেলের ইঞ্জিন আর বগি সব সময়ই এদিকে ওদিক যাওয়াআসা করত ভসভস করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। ঘটাং ঘটাং আওয়াজ লেগেই ছিল। যখন সে খুব সকালে উঠে পড়ত, ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে এক বিচিত্র দৃশ্যের মুখোমুখি হত। ইঞ্জিন থেকে ঘন ধোঁয়া কুয়াশা ভেদ করে উপরে উঠে গিয়ে স্থূলকায় মানুষের আকার নিয়ে আকাশ ছেয়ে ফেলছে। আবার ইঞ্জিন থেকে বেরোন বাষ্পের মেঘ রেল লাইন থেকে ক্রমশ বাতাসে মিশে যাচ্ছে। কোনও সময় যখন সে দেখতে একটি বগিকে ধাক্কা মেরে কোনও লাইনে ছেড়ে দেওয়া হত নিজের মতো করে চলতে, সে নিজের কথা ভাবত...ভাবত তাকে ওই ভাবেই যেন কোনও একটি লাইনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে নিজের মতো করে চলতে। অন্যেরা আলাদা পথের জন্য বোতাম বদল করবে, কিন্তু সে নিজে জানবে না তার গন্তব্য কোন দিকে। তারপর একটা দিন আসবে, যখন গতি আপনা আপনিই ফুরিয়ে যাবে, তাকে দাঁড়াতে হবে এমন একটি জায়গায়, যেখানে সে কোনওদিন যায়নি। কোনওদিন ছিল না।

এই ভাবে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকত উদ্দেশ্যহীন হয়ে। নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করত ইঞ্জিন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জীবন্ত রেল লাইনকে। ইঞ্জিন কখনও দাঁড়িয়ে, কখনও চলমান। তখন সমস্ত রকম চিন্তা তার মাথায় এসে ভিড় জমাত। আম্বালাতেও তার ঘর এমনিই রেল স্টেশনের লাগোয়া ছিল, কিন্তু এই রকম ভাবনা কখনও তার মনের ভিতর জাগেনি। এখন যে রেল লাইনের জাল থেকে ধোঁয়া আর বাষ্প সব সময় উপরে উঠে যাচ্ছে, তার সঙ্গে তুলনা করছে বড় এক বেশ্যালয়ের—অনেক সংখ্যার বগি যেখানে কয়েকটি বৃহদাকার ইঞ্জিন দিয়ে কোনও না কোনও লাইনে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। কখনও

~ www.amarboi.com ~

তার মনে হত ওই ইঞ্জিনগুলি হল আম্বালায় তার ঘরে ফূর্তি করতে আসা ব্যবসায়ীদের মতো। কখনও সে যখন দেখত কোনও কোনো ইঞ্জিন ধীর গতিতে সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা বগি অতিক্রম করে যাচ্ছে, তার মনে হত সেই সব লোকের কথা যারা ধীরে ধীরে রেড-লাইট এলাকার ভিতর দিয়ে হেঁটে যায় পথের ধারের বাড়িগুলির ব্যালকনিতে দাঁড়ান বেশ্যাদের দিকে তাকাতে তাকাতে।

সুলতানা ভয় পেতে থাকে, তার মনের এই সব ভাবনা হয়তো তার মানসিক বিপর্যয় ঘটিয়ে দিতে পারে। ফলে যখন এই সব ভাবনা মনের ভিতরে দেখা দিল, সে ব্যালকনিতে যাওয়া বন্ধ করে দিল।

সে বারবার খুদা বক্সকে অনুনয় করল, তার সমব্যথী হয়ে বাড়িতে থাকতে, তাকে রোগীর মতো বাড়িতে একা রেখে না যেতে। কিন্তু যখনই সে এই কথা বলেছে, খুদা বক্স বলেছে, 'সোনা, আমি বাইরে গিয়ে কিছু উপার্জনের চেষ্টা করি, খোদার কৃপায় শিগগির আমাদের সমস্যা মিটে যাবে।'

কিন্তু পুরো পাঁচ মাস গেল, সুলতানা ও খুদা বক্স কারোরই কোনও সমস্যা মিটল না।

মহরমের মাস সামনে। সুলতানার কাছে কিছুই ছিল না যা দিয়ে নিজের জন্য একটি কালো পোশাক তৈরি করতে পারে। তার সখী মুখতার কালো জর্জেটের হাতা সমেত একটা ফ্যাশান-দুরস্ত লেডি হ্যামিল্টন কামিজ বানিয়েছিল। এর সঙ্গে মানানসই একটি সাটিনের শালোয়ার তার ছিল, যেটি চোখের কাজলের মতো জ্বলজ্বল করত। আনোয়ারি নিজের জন্য একটি সুন্দর রেশমি জর্জেট শাড়ি এনেছিল। সে সুলতানাকে বলেছিল, ওই শাড়ির নীচে একটি শাদা সায়া পরবে, ওটাই হল সেই সময়কার রীতি। আনোয়ারি তার নিজর জন্য কালো একটি ভেলভেটের জুতো এনেছিল। এই সব দেখতে দেখতে সুলতানা বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিল, সে মহরমের সময় এই রকম পোশাক কখনওই কিনতে পারবে না।

আনোয়ারি আর মুখতারির কাপড় দেখে মন খারাপ করে সে বাড়ি ফিরল। তার ভিতরে যন্ত্রণা ফুঁপিয়ে উঠছিল। বাড়ি তখন খালি। প্রত্যেকদিনের মতো খুদা বক্স বেরিয়ে গিয়েছিল। সে তার মাথার নীচে একটা তাকিয়া রেখে কার্পেটের উপর শুয়ে থাকল। যতক্ষণ না তাকিয়াটির উচ্চতা তার ঘাড় শক্ত না করে দেয়, সে ওখানেই শুয়ে থাকল। তারপর সে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যালকনিতে গেল ওই সব যন্ত্রণাদায়ক চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে দিতে।

রেল লাইনের ওপর শুধু কতগুলি বগি দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু একটি ইঞ্জিনও না। তখন সন্ধ্যা। রাস্তায় জল ছিটনো হয়ে গিয়েছিল আগেই, সুতরাং বাতাসে কোনও ধুলো ময়লা ছিল না। চলমান লোকজন দেখে মনে হচ্ছিল তারা নিঃশব্দে বাড়ি ফিরছে। তাদের একজন ঘাড় উঁচু করে সুলতানাকে দেখল। সুলতানা তার দিকে চেয়ে হাসল এবং সে তৎক্ষণাৎ তাকে ভুলে গেল কারণ সে আগেই তার দৃষ্টি স্থির করে দিয়েছিল উল্টোদিকের রেল লাইনে আসা একটি ইঞ্জিনের উপর। তাকিয়ে ক্রমশ তার মনে হচ্ছিল, ইঞ্জিনটিও তার মাথায় কালো এক আবরণ তৈরি করেছে। এই ভুতুড়ে ভাবনা থেকে মুক্তি পেতেই সে

~ www.amarboi.com ~

আবার নীচের রাস্তায় দৃষ্টিপাত করে। সুলতানা দেখল, লোকটি তখনও একটি বহেল গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, সেই লোকটি তার দিকে কামনামদির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। সে তাকে ইশারা করল। লোকটি নিজের আশপাশ দেখে সুলতানাকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, তার ফ্ল্যাটে যাওয়ার পথ কোনটি। সুলতানা তাকে পথ দেখিয়ে দিল। লোকটি এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এল।

সুলতানা তাকে কার্পেটে বসতে আমন্ত্রণ করল। কথাবার্তা শুরু করতে সুলতানা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'মনে হচ্ছিল তুমি উপরে আসতে ভয় পাচ্ছিলে?'

লোকটি হাসল, বলল, 'তোমার এমন মনে হল কেন, ভয়ের কী আছে?'

সুলতানা বলল, 'কারণ আসার আগে তুমি একটু অপেক্ষা করলে মনে হল।'

লোকটি আবার হাসল, 'তুমি ভুল করছ, আমি তোমার ওপরের ফ্ল্যাটে তাকিয়ে ছিলাম, সেখানে এক মহিলা দাঁড়িয়ে ক'জন লোককে বিদ্রূপ করছিল, আমার কৌতূহল হল তা দেখে, তারপর আমি ওই ব্যালকনিতে একটা সবুজ আলো দেখতে পেলাম, ফলে আমি আর একটু অপেক্ষা করলাম, আমি সবুজ আলো পছন্দ করি।' লোকটি তারপর সুলতানার ঘরটি দেখতে দেখতে উঠে দাঁড়ায়। সুলতানা তাকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি চললে?'

'না', সে বলল, 'আমি তোমার ফ্ল্যাটটা দেখতে চাই, এস, আমাকে ঘরগুলো দেখাও।'

সুলতানা তাকে তিনটি ঘরই দেখায়। লোকটি কোনও কথা না বলে ঘরগুলো দ্যাখে। তারপর আগের ঘরটিতে ফিরে এসে সে বলল, 'আমার নাম শঙ্কর।'

তখন প্রথম সুলতানা লোকটিকে পরিপূর্ণ ভাবে দেখল। মাঝারি উচ্চতার মানুষটির চেহারায় ব্যতিক্রমী কিছু ছিল না। কিন্তু তার চোখদুটি ছিল অস্বাভাবিক পরিষ্কার, উজ্জ্বল, মাঝে মাঝে তার ভিতরে বিচিত্র দ্যুতি ফুটে উঠছিল। ছোট, কিন্তু টানটান দেহ লোকটির। চুল পাকতে আরম্ভ করেছে তখন। গরম কাপড়ের ট্রাউজার পরনে। কলার তোলা একটি শাদা শার্ট গায়ে।

লোকটি কার্পেটের উপর এমন ভাবে বসে ছিল যেন সে নয়, সুলতানাই তার খদ্দের। এই বিষয়টি সুলতানাকে একটু উদ্বিগ্ন করে তোলে। ফলে সে জিজ্ঞেস করে, 'আমি তোমার জন্য কী করতে পারি?'

সে একটু পিছনে হেলে উত্তর দিল, 'আমার জন্য তুমি কী করতে পারো? আমি তোমার জন্য কী করতে পারি? তুমিই তো আমাকে উপরে ডেকে এনেছ।'

সুলতানা জবাব না দিলে সে আবার বলল, 'হ্যাঁ, আমি বুঝেছি, শোনো, তুমি যাই ভাবো না কেন, ভুল ভাবছ, আমি তাদের মতো কেউ নয় যারা তোমার এখানে আসে, তোমাকে কিছু দিয়ে আবার চলে যায়। আমি ডাক্তারদের মতো একটা ফি চাই সব সময়; যখন কেউ আমাকে ডাকে, আমাকে একটা ফি দিতে হয় তাকে।'

সুলতানা হতবুদ্ধি হয়ে গেল এই কথা শুনে, হাসবে কিন্তু হাসতে পারে না। সে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী করো?'

'তোমরা সকলে যা করো, আমি তাই করি।' লোকটা উত্তর দিল।

'কী?'

~ www.amarboi.com ~

'তুমি কী করো?'

'আমি...আমি...আমি কিছুই করি না।'

'আমিও কিছু করি না।'

সুলতানা আড়াআড়ি বলল, 'এর কোনও মানে হয় না, কাউকে কিছু না কিছু তো করতে হবেই।'

'হ্যাঁ, কিছু না কিছু তো করতে হবেই,' শঙ্কর শান্ত গলায় জবাব দিল।

'হ্যাঁ, আমার সময় নষ্ট করি।' সুলতানা বলে।

'আমিও আমার সময় নষ্ট করি।'

'তাহলে এসো, আমরা একসঙ্গে সময় নষ্ট করি।'

'মাথাটা খাটাও, এটা কোনও মুফতে বিলিয়ে দেওয়ার ব্যাপার নয়।'

'না, আমি কোনও স্বেচ্ছাসেবী নই।' সুলতানা কথাটা বলে একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'স্বেচ্ছাসেবী কারা?'

'উল্লু কে পাঠ্‌টে', শঙ্কর বলল।

'আমি নই।'

'জানি। যে তোমার সঙ্গে থাকে, সেই খুদা বক্স একটা গাধা।'

'কেন?'

'কেন না, বেশ কিছুদিন ধরে সে একটা ফকিরের কাছে কাছে যাচ্ছে, ভেবে বসে আছে, ওই ফকির তার ভাগ্য বদলে দেবে, নিজে থেকে বদল করার ভরসা যখন কোনও মানুষের থাকে না, তখন তা একটা মরচে পড়া তালা খোলার ব্যর্থ চেষ্টার মতো হয়ে ওঠে মাত্র,' বলতে বলতে সে হাসতে থাকে।

সুলতানা বলল, 'তুমি হিন্দু, সেই কারণে আমাদের ফকিরকে বিদ্রুপ করছ।'

লোকটি হাসে, 'এই সমস্ত জায়গায় হিন্দু-মুসলমান নিয়ে কোনও কথা হতে পারে না। যদি পণ্ডিত মালব্য এবং মিঃ জিন্নাহ এখানে আসতেন, তাঁরাও বিষয়টি ভদ্রলোকের চোখে দেখতেন।'

'আমি বুঝতে পারছি না তুমি কী বলতে চাইছো, তুমি থাকবে, না থাকবে না?'

'কেবল মাত্র সেই শর্তে, যা আমি তোমাকে বলেছি।'

সুলতানা উঠে দাঁড়ায়, বলে, 'তুমি তাহলে যেতে পারো।'

শঙ্কর সহজ ভাবে উঠে দাঁড়ায়। তার হাত দুটি ট্রাউজারের পকেটে ভরে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সে বলে, 'আমি এই ভাবেই যখন-তখন আসব, যখন তোমার দরকার পড়বে, আমাকে ডেকো, আমি তোমার জন্য অনেক কিছু করতে পারি।'

শঙ্কর চলে গেল। সুলতানা তখন তার কালো পোশাকের কথা একদম ভুলে গেল। পরিবর্তে সে শঙ্করকে নিয়ে বহুক্ষণ ধরে ভাবতে থাকে। শঙ্করের কথাবার্তা তার মনের অন্ধকার সরিয়ে দিয়েছিল। যখন তার অবস্থা ভাল ছিল, সেই সময় যদি লোকটি তার কাছে আস্থালায় আসত, সে তাকে সম্পূর্ণ অন্য চোখে দেখতে পারত...সম্ভবত তাকে বের করে দিত। কিন্তু এখানে সে হতাশাগ্রস্ত...যে ভাবে লোকটি কথা বলেছে তা সে পছন্দ করেছে।

~ www.amarboi.com ~

খুদা বক্স সন্ধেয় বাড়ি ফিরলে সুলতানা তাকে জিজ্ঞেস করে, সমস্তদিন সে কোথায় ছিল। খুদা বক্স একেবারে নিঃশেষে হয়ে ফিরেছিল। সে বলল, 'আমি পুরোনো কেল্লায় ছিলাম। গত কয়েকদিন ধরে সেখানে এক ফকির রয়েছেন, আমি তাঁর কাছেই প্রত্যেকদিন যাই যাতে ভাগ্য ফেরে।'

'বাবা কি তোমাকে কিছু বলেছেন?'

'না, এখনও বলেননি, কিন্তু তাঁর উপর আমার নির্ভরতা বিনা কারণে নয়, যদি আল্লার করুণা হয়, আমরা খুব তাড়াতাড়ি ভাল অবস্থায় ফিরব।'

সুলতানার মাথার ভিতর মহরমের চিন্তা ভর্তি হয়েছিল। সে শোকার্ত গলায় বলল, 'তুমি সারাদিনই বাইরে কাটাও, আমাকে খাঁচায় বন্দির মতো করে রেখে যাও, আমি কোথাও যেতে পারি না। খুব তাড়াতাড়ি মহরম আসছে, তুমি কি তা নিয়ে কিছু ভেবেছ? তুমি কি ভেবেছ আমার একটা কালো পোশাক দরকার? ঘরে একটা পয়সাও নেই। আমার হাতের বালাগুলো ছিল, কিন্তু একটার পর একটা বিক্রি হয়ে গেছে। তুমি ওই ফকিরের পিছনে আর কতদিন ঘুরবে? মনে হচ্ছে যেদিন আমরা দিল্লি এসেছি, সেদিন থেকেই আল্লা আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমার কথা শোনো, তুমি তোমার ফোটোগ্রাফির কাজ আবার শুরু করো, তাহলে কিছু অন্তত ঘরে আসবে।'

খুদা বক্স কার্পেটের উপর শুয়ে ছিল, বলল, 'কিন্তু আরম্ভ করতে গেলে আমার একটু পুঁজি দরকার, আল্লা কসম, তুমি আর এরকম যন্ত্রণার কথা বলো না, আমি সহ্য করতে পারি না। তুমি ঠিক বলেছ, আম্বালা ছেড়ে আসা সত্যিই বড় ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু সব কিছু হয় খোদার ইচ্ছায়, হয় আমাদের মঙ্গলের জন্যই হয়ত, কে জানে তা? এই রকম অবস্থার ভিতর দিয়ে আমাদের কিছুদিন কাটবে, তারপর কী হবে?'

সুলতানা তার কথায় বাধা দিল, বলল, 'আল্লার কথা ভেবেই বলছি, কিছু করো, চুরি, ডাকাতি, যা হয় কিছু, শুধু আমার কালো শালোয়ারের কাপড় এনে দাও, আমার একটা শাদা কামিজ আছে, ওটা কালো রঙে ছুপিয়ে নেওয়া যাবে, আর আমার মসলিন দোপাট্টা যেটা তুমি দেওয়ালির জন্য এনে দিয়েছিলে, সেটাও কালো রং করে নেওয়া যাবে, এখন আমার দরকার একটা কালো শালোয়ার...যে কোনও উপায়ে তুমি আনবে, আনতেই হবে, দ্যাখো, আমি তোমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিচ্ছি, তোমাকে যে উপায়ে হোক আনতেই হবে।'

খুদা বক্স উঠে বসে, 'কী কথা বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আমি কোথা থেকে আনব? নেশা করার মতো পয়সাও আমার কাছে নেই।'

'তুমি কী করবে তা আমি জানি না, তোমাকে আমার কালো শালোয়ারের জন্য সাড়ে চার গজ কাপড় আনতেই হবে।'

'খোদার কাছে প্রার্থনা করো আজ রাতেই যেন দুই-তিনজন খদ্দের তোমার কাছে পাঠান তিনি।'

'কিন্তু তুমি কিছুই করবে না, তাই তো? তুমি অনেক টাকা পেতে পারো যদি তুমি চাও। যুদ্ধের আগে, তুমি এক গজ সাটিন চোদ্দ আনায় কিনতে পারতে, এখন তার দাম পাঁচ সিকি, সাড়ে চার গজের দাম এখন তাহলে কতো হতে পারে?'

~ www.amarboi.com ~

'ঠিক আছে, তুমি যদি তাই বলো, আমি কোনও একটা উপায় বের করবো।' বলতে বলতে খুদা বক্স উঠে দাঁড়ায়, 'কিন্তু এখন ওসব ভুলে যাও, আমি খাবার আনতে যাচ্ছি।'

খাবার এল। তারা একসঙ্গে বসে সেই খাবার যে করে হোক খায়, তারপর বিছানায় যায়। পরদিন সকালে খুদা বক্স পুরনো কেল্লার কাছে সেই পবিত্র ফকিরের কাছে চলে যায়। সুলতানা একা রয়ে গেল। কিছু সময়ের জন্য সে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, তারপর উঠে এঘর ওঘর করতে লাগল। দুপুরের খাওয়ার পর সে তার মসলিন দোপাট্টা আর শাদা কামিজ বের করে নীচে নেমে লনড্রিওয়ালার কাছে যায় সেগুলিকে কালো রঙে ছোপানোর জন্য। লনড্রিওয়ালা কাপড় রং করত, কাচতও।

সে ফিরে এসে ফিল্ম ম্যাগাজিন পড়তে লাগল। সেই ম্যাগজিনগুলোয় সেই সব সিনেমার গল্প আর গান ছাপত যেগুলো সে আগে দেখেছিল। পড়তে পড়তে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন চারটে বেজে গেছে, রোদ পড়ে গেছে। সে স্নান করে নেয়, তারপর নিজেকে একটা গরম কাপড়ে মুড়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। সমস্ত দিনের শ্রেষ্ঠ সময়ে সে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। সন্ধে হয়ে এল, রাস্তার আলোগুলো তখন জ্বলে উঠছে। নীচের রাস্তাকে দারুণ সুন্দর লাগছিল। ঠাণ্ডা পড়ছিল, কিন্তু সুলতানা তা ধর্তব্যের মধ্যে আনছিল না। বহু সময় ধরে সে চলমান টাঙ্গা আর গাড়িগুলোকে দেখতে থাকে। আচমকা সে শঙ্করকে দেখতে পায়, সে তখন সুলতানার ফ্ল্যাটের নিচ দিয়ে যাচ্ছিল, মাথা তুলে সুলতানার দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসে। সুলতানা কোনও কিছু না ভেবে তাকে উপরে আসতে ইঙ্গিত করে।

শঙ্কর এলে সে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। সে জানত না শঙ্করকে কী বলবে। আসলে সে কোনও কিছু না ভেবেই তো শঙ্করকে ডেকেছিল। শঙ্কর একেবারে নিরুদ্বেগ হয়ে এসেছিল, যেন তার নিজের ঘরেই এসেছে সে। একটা তাকিয়া মাথার নীচে দিয়ে সে শুয়ে পড়ল সেই আগের মতোই, কিছু সময় পার হয়ে গেল, সুলতানা কোনও কথাই বলতে পারল না। শঙ্কর বলল, 'তুমি আমাকে একশো বার ডাকতে পারো, প্রত্যেকবারই ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারো, এই সব ঘটনা আমাকে কখনও হতাশ করে না।'

কী করবে তা জানত না সুলতানা, কিন্তু বলল, 'না, বসো, তোমাকে কেউ যেতে বলছে না।'

শঙ্কর মৃদু হাসে, 'তার মানে তুমি আমার শর্ত মেনে নিয়েছো?'

সুলতানা হো হো করে হাসে, বলে, 'শর্তটা কী, মানলে তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?'

'বিয়ে! তুমি বা আমি কেউ কোনওদিন বিয়ে করব না, ওসব আমাদের জন্য নয়। এই রকম বোকা বোকা কথা আর বলবে না। ঠিকঠাক কোনও কথা বলো, তুমি এক নারী, এমন কিছু বলো যা আমাকে আনন্দ দিতে পারে কিছু সময়ের জন্যও। কেনা বেচার চেয়ে জীবনে আরও অনেক কিছু আ[illegible]'

সুলতানা তাকে [illegible] বলল, '[illegible] বলো, তুমি আমার কাছে কী চাও?'

'অন্যেরা যা চায়, তাই-ই।' সে উঠে বসল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'তাহলে তাদের সঙ্গে তোমার তফাত কী?'

'তোমার আমার মধ্যে কোনও তফাত নেই, কিন্তু তাদের পৃথিবী আর আমার পৃথিবী একেবারে আলাদা, এমন অনেক প্রশ্ন আছে যা তোমার জিজ্ঞেস করা উচিত নয়, কেন না উত্তরগুলো তোমার জেনে যাওয়া উচিত জিজ্ঞেস করার আগেই।'

কিছু সময় ধরে সুলতানা বুঝে নিতে চাইল শঙ্কর কী বলতে চাইছে, তারপর সে বলল, 'বুঝলাম।'

'তাহলে বলো তুমি কী করতে চাইছো?'

'তুমি জিতলে, আমি হেরে গেলাম, কিন্তু আমি তোমাকে বলতে পারি, আজকের আগে কেউ এই ধরনের শর্তে রাজি হয়নি।'

'তুমি ভুল করছ, এই বাড়িটিতে তুমি অনেক মেয়েকে পাবে যারা এতই সরল যে তারা বিশ্বাসই করতে পারবে না যে কোনও মেয়ে এমন কোনও অবনমন মেনে নিতে পারে যা তুমি প্রতিদিনই মেনে নাও তাকে না টের পেয়েও। তারা এটা বিশ্বাসই করে না, কিন্তু তোমার মতো অনেক অনেক আছে এমন। তোমার নাম সুলতানা, তাই তো?' সে উঠে দাঁড়ায়, উচ্চৈস্বরে হাসে, বলে, 'আর আমি হলাম শঙ্কর, কী বিদ্রুপাত্মক নাম, এস আমরা পাশের ঘরে যাই।'

যখন তারা ফিরে এল, তারা হাসছিল। আল্লাই জানেন কেন? যখন সে বেরিয়ে যাবে সুলতানা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'শঙ্কর, তুমি আমার জন্য একটা কাজ করতে পারবে?'

'প্রথমে বলো কী কাজ?' সে বলল।

সুলতানা একটু অস্বস্তিতে পড়ে, বলে, 'তুমি হয়তো ভাববে আমি তোমাকে দাম দিতে বলছি, কিন্তু....'

'বলো, থামলে কী জন্য?'

সুলতানা তার সাহস ফিরে পায়, বুঝিয়ে বলে, 'মহরম আসছে, আর আমার কাছে নিজের জন্য একটা কালো শালোয়ার কেনার মতো টাকা নেই, তুমি সমস্ত কথাই জানো, আমার একটা শাদা কামিজ আর দোপাট্টা আছে, ওদুটোকে আজই কালো রঙে ছোপাতে দিয়ে এসেছি।'

শঙ্কর বলল, 'তুমি কি তোমার কালো শালোয়ার কেনার টাকা চাও আমার কাছে?'

'না,' সে তাড়াতাড়ি বলে, 'আমি বলতে চাইছি তুমি যদি আমাকে...তুমি যদি এনে দিতে পারো।'

সে মৃদু হাসে, বলে, 'আমার পকেটে কোনওদিন কোনও পয়সা থাকা খুবই ভাগ্যের ব্যাপার, সে যাই হোক, আমি যা করতে পারি তা করব, মহরমের প্রথম দিনে তুমি তোমার শালোয়ার পাবে, এখন খুশি তো?' কথা শেষ করে সে সুলতানার কানের দুলদুটির দিকে তাকায়, বলে, 'তুমি তোমার কানের ওই দুলদুটো আমাকে দিতে পারবে?'

সুলতানা হেসে ওঠে, 'তুমি এই দুটোকে চাইছ কেন, এগুলো খুব সাধারণ রুপোর দুল, বড় জোর পাঁচ টাকা হবে এর দাম।'

~ www.amarboi.com ~

শঙ্কর হাসল, 'আমি তোমার দুলদুটোকে চেয়েছি, ওর দাম জানতে চাইনি, তুমি দেবে কি দেবে না?'

'নিয়ে নাও,' সুলতানা বলল। সে কান থেকে খুলে শঙ্করের হাতে দিল ওদুটি। পরে তার আফশোস হল, কিন্তু তখন শঙ্কর চলে গেছে।

সুলতানা কোনও মুহূর্তেও বিশ্বাস করেনি যে শঙ্কর তার কথা রাখতে পারবে। কিন্তু আট দিন বাদে, মহরম মাসের প্রথম দিনে, সকাল ন'টা নাগাদ তার দরজায় টোকা পড়ল। সুলতানা দোর খুলে দ্যাখে শঙ্কর দাঁড়িয়ে আছে। সে তাকে খবরের কাগজে মোড়া একটা জিনিস দিল, বলল, 'এটা একটা কালো শাটিনের শালোয়ার, একবার তাকিয়ে দেখ নাও, এটা একটু বড় হতে পারে, আমি যাই।'

আর কোনও কথা না বলে সে চলে গেল। তার পরনের প্যান্টটাই ছিল মোচড়ানো, ভাঁজে ভাঁজে ভর্তি, চুল ছিল উসকো খুসকো। মনে হল সে বিছানা থেকে উঠে সোজা এখানে এসেছিল। সুলতানা মোড়ক খুলল, ভিতরে একটা কালো শালোয়ার, ঠিক সেই রকম একটা যা সে মুখতারকে পরতে দেখেছিল। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। অবশেষে সে কালো শালোয়ার পেল, শঙ্কর তার কথা রেখেছে। তার দুলের জন্য আর যে দরাদরি সে করেছিল তার জন্য মনে যে কষ্ট ছিল, উবে গেল।

দুপুরে সে কালো রঙে ছোপান কামিজ আর দোপাট্টা লনড্রি থেকে নিয়ে এল। সে ওগুলো ঠিক পরেছে যখন, দরজায় টোকা শুনতে পায়। সুলতানা দরজা খুলে দেখে, মুখতার। মুখতার সুলতানার পোশাক দেখে বলল, 'তোমার কামিজ আর দোপাট্টা দেখে মনে হচ্ছে ওগুলো ছোপান হয়েছে, কিন্তু শালোয়ার দেখে মনে হচ্ছে নতুন, কবে করলে এটা?'

সুলতান বলল, 'দরজি এখনই দিয়ে গেল।' কথা বলতে বলতে সে মুখতারের কানের দুলদুটিকে দেখতে পায়, জিজ্ঞেস করে, 'এই দুলদুটো কোথায় পেলে?'

'আমি আজই পেয়েছি এ-দুটোকে।' মুখতার উত্তর দেয়।

তারপর সামান্য সময়ের জন্য তাদের দুজনের কেউই কোনও কথা বলতে না পেরে চুপ করে থাকল।

ভাষান্তর : অমর মিত্র

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওপর, নীচে আর মাঝখানে

স্বামী : বহুকাল পরে তুমি আর আমি একা একা নিস্তব্ধে বসে আছি।

স্ত্রী : হ্যাঁ।

স্বামী : কাজের চাপ...যতই আমি এড়ানোর চেষ্টা করি না কেন কিছুতেই পারি না। দেশের প্রতি ভালবাসা এবং কর্তব্যের তাগিদেই আমাকে কাজ করে যেতে হয়।

স্ত্রী : আসলে আমার মতই তুমি এই ব্যাপারটাতে খুব দুর্বল।

স্বামী : তোমার সামাজিক কাজকর্ম সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল। তোমার সময় মতো তোমার সাম্প্রতিক বক্তৃতার কাগজপত্রগুলো আমাকে দিয়ো তো। আমি আমার সময় মতো পড়ে নেব।

স্ত্রী : ঠিক আছে।

স্বামী : আচ্ছা, বেগম, সেদিন যে ব্যাপারটা তোমায় বলেছিলাম সেটা কি মনে পড়ে?

স্ত্রী : কোন ব্যাপারটা?

স্বামী : তবে হয়তো বলিনি। গতকাল হঠাৎই মেজোছেলের ঘরে গিয়ে দেখি সে লেডি চ্যাটারলিস লাভার পড়ছে।

স্ত্রী : ও...ঐ নিষিদ্ধ বইটা।

স্বামী : হ্যাঁ বেগম।

স্ত্রী : তুমি কী করলে?

স্বামী : আমি বইটা ছিনিয়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখলাম।

স্ত্রী : তুমি ঠিকই করেছ।

স্বামী : আমি ঠিক করেছি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ওর ডায়েট পাল্টানোর ব্যাপারে পরামর্শ নেব।

স্ত্রী : একদম ঠিক সিদ্ধান্ত।

স্বামী : তোমার শরীর কেমন লাগছে?

স্ত্রী : বেশ ভাল।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বামী : একটা কথা আমার মাথায় খেলছিল...তোমাকে বলব?

স্ত্রী : তোমার সাহসটা বেড়ে যাচ্ছে।

স্বামী : তুমিই আমার প্রেরণা।

স্ত্রী : কিন্তু...তোমার শরীর?

স্বামী : শরীর?...খুব ভাল...কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া আমি এক পাও এগবো না...তোমার শরীরের ব্যাপারটাও আমার জানা দরকার।

স্ত্রী : আজই আমি মিস সালধানার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

স্বামী : আমিও ডাক্তার জালালের সাথে কথা বলব।

স্ত্রী : সেটাই ঠিক।

স্বামী : যদি উনি অনুমতি দেন।

স্ত্রী : আর মিস সালধানার যদি কোনও আপত্তি না থাকে...বাইরে ঠাণ্ডা পড়েছে মাফলার দিয়ে গলাটা জড়িয়ে নাও।

স্বামী : ধন্যবাদ।

ডঃ জালাল : আপনি হ্যাঁ বলেছেন?

মিস সালধানা : হ্যাঁ।

ডঃ জালাল : আমিও তাই বলেছি...কিন্তু দুষ্টুমি করে।

মিস সালধানা : দুষ্টুমি করেই আমি না বলতে বলতেই হ্যাঁ বলেছি।

ডঃ জালাল : আমিও তাই...কিন্তু আমার করুণা হল।

মিস সালধানা : আমিও প্রায় একইরকম।

ডঃ জালাল : প্রায় বছর খানেক পরে।

মিস সালধানা : হ্যাঁ।

ডঃ জালাল : যখন আমি হ্যাঁ বললাম তখনই ওঁর পালস্ রেট বেড়ে গেল।

মিস সালধানা : দুজনেই এক।

ডঃ জালাল : ভদ্রলোক আমাকে খুব ভয়ে ভয়ে বললেন, ডাক্তারবাবু আমার হার্ট চলছে না, আমার কার্ডিওগ্রাম করুন।

মিস সালধানা : ভদ্রমহিলাও ঠিক একই কথা আমায় বলেছেন।

ডঃ জালাল : আমি ওঁকে একটা ইনজেকশন দিলাম।

মিস সালধানা : আমিও। কিন্তু আমি ডিসটিল্ড্ ওয়াটার ইনজেক্ট করেছি।

ডঃ জালাল : জলই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জিনিস।

মিস সালধানা : তাহলে আমি নিম্‌ফোম্যানিয়াক হয়ে যেতাম।

ডঃ জালাল : আমি তাহলে এতদিনে ওপরওয়ালার কাছে চলে যেতাম।

মিস সালধানা : দোহাই একথা বলবেন না।

ডঃ জালাল : যখন আমরা এই উচ্চবিত্ত মূর্খদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি তখন তারা আমাদের মজার খোরাক জোগায়।

~ www.amarboi.com ~

মিস সালধানা : আজই একই হল।

ডঃ জালাল : সব দিনের মত আজও।

মিস সালধানা : সমস্যাটা হল এইসব মানুষজনের মজার ধারণাগুলো একটা দীর্ঘ বিরতির পর আসে।

স্ত্রী : লেডি চ্যাটারলিস লাভার্স তোমার বালিশের নীচে কেন?

স্বামী : বইটা কতটা অশ্লীল তাই আমি খুঁজে দেখছিলাম।

স্ত্রী : আমি একটু দেখতে পারি কী?

স্বামী : না, আমি পড়ি, তুমি শোনো।

স্ত্রী : খুব ভাল কথা।

স্বামী : ইতিমধ্যে আমি ডাক্তারের সাথে কথা বলে ছেলের ডায়েট চার্ট পাল্টে ফেলেছি।

স্ত্রী : আমি নিশ্চিত ছিলাম যে এ ব্যাপারটা তোমার নজর এড়াবে না।

স্বামী : কোনও কাজই কালকের জন্য ফেলে রাখি না।

স্ত্রী : তা আমি জানি...কিন্তু আজ কী হবে, আমি নিশ্চিত তুমি...।

স্বামী : তুমি বেশ তরতাজা মেজাজে আছ।

স্ত্রী : সবই তোমার জন্য।

স্বামী : আমি কৃতার্থ হলাম, যদি তুমি অনুমতি দাও।

স্ত্রী : দাঁত ব্রাশ করেছ কি?

স্বামী : শুধু দাঁত ব্রাশই করিনি, ডেটল দিয়ে গার্‌গেলও করেছি।

স্ত্রী : আমিও তাই।

স্বামী : আমরা দুজন দুজনের জন্যই জন্মেছি।

স্ত্রী : তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

স্বামী : তাহলে এবার আমি ঐ কুখ্যাত বইটা থেকে পড়তে শুরু করি।

স্ত্রী : দাঁড়াও আমার পালস্‌টা একটু দেখে নাও।

স্বামী : খুব দ্রুত চলছে...আমারটা একটু দেখে নাও।

স্ত্রী : তোমারটা ঘোড়ার মত ছুটছে।

স্বামী : কারণটা কী?

স্ত্রী : দুর্বলতার জন্য।

স্বামী : সেটাই হওয়া উচিত...কিন্তু ডঃ জালালের মতে এসব কোনও ব্যাপারই নয়।

স্ত্রী : মিস সালধানাও ঠিক একথাই আমাকে বলেছেন।

স্বামী : ডঃ জালাল অনুমতি দেওয়ার আগে আমাকে আপাদ-মস্তক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

স্ত্রী : আমাকেও তাই করেছেন।

স্বামী : আমার মনে হয় এর জন্য কোনও ক্ষতি হবে না

~ www.amarboi.com ~

স্ত্রী : তুমি তো ভাল জান...কিন্তু তোমার স্বাস্থ্য...
স্বামী : আর তোমার?
স্ত্রী : কোন ঝুঁকি নেওয়ার আগে শরীরকে যত্ন নেওয়া...
স্বামী : মিস সালধানা তোমাকে ঐ ব্যাপারে ঠিক মত দেখাশোনা করছেন তো?
স্ত্রী : কোন ব্যাপারে? ...ও হ্যাঁ ঠিকঠিকই করছেন।
স্বামী : তাহলে তো এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই।
স্ত্রী : না।
স্বামী : এখন আমার পালস্‌টা দেখ।
স্ত্রী : স্বাভাবিক...আমারটা?
স্বামী : তোমারটাও স্বাভাবিক।
স্ত্রী : এবার বইটা থেকে পড়তে শুরু কর।
স্বামী : ঠিক আছে কিন্তু বুক ধড়ফড় করছে।
স্ত্রী : আমারও...
স্বামী : আমরা যা চেয়েছি সব কী পেয়েছি?
স্ত্রী : হ্যাঁ, সবকিছুই।
স্বামী : যদি কিছু মনে না করো আমার টেম্পারেচারটা দেখবে?
স্ত্রী : স্টপওয়াচটা পাশেই আছে...পালস্‌টাও দেখে নেওয়া উচিত।
স্বামী : ঠিকই।
স্ত্রী : স্মেলিং সল্টটা কোথায়?
স্বামী : অন্যান্য জিনিসের মধ্যেই আছে?
স্ত্রী : হ্যাঁ, সাইড টেবিলে আছে।
স্বামী : আমার মনে হয় থার্মোস্ট্যাটটা বাড়িয়ে দেওয়া দরকার।
স্ত্রী : আমারও তাই মনে হয়।
স্বামী : আমি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি আমাকে ওষুধটা দিতে ভুলো না।
স্ত্রী : আমি চেষ্টা করব...যদি...
স্বামী : হ্যাঁ...যদি আমার দরকার হয়।
স্ত্রী : পুরো পাতা পড়ো।
স্বামী : তুমি শুনতে প্রস্তুত হও।
স্ত্রী : তুমি হাঁচলে।
স্বামী : জানি না কেন হল।
স্ত্রী : অদ্ভুত।
স্বামী : আমারও অদ্ভুত লাগছে।
স্ত্রী : ও বুঝেছি থার্মোস্ট্যাটটা বাড়াতে গিয়ে ভুলে [illegible]েছি।
স্বামী : হাঁচিটা হয়ে ভালই হল। কারণটা ধরা পড়ল।
স্ত্রী : আমার ভুল হয়ে গেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বামী : ভয়ের কিছু নেই, বারো ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।
স্ত্রী : ব্র্যান্ডিটা আমি মেপে দেব, নইলে ভুল মাপ হবে।
স্বামী : ঠিক আছে...তবে তুমিই মাপো।
স্ত্রী : ধীরে ধীরে খাও।
স্বামী : এর থেকে আর আস্তে হচ্ছে না।
স্ত্রী : এখন ভাল লাগছে?
স্বামী : আমি আবার ভাল হয়ে উঠছি।
স্ত্রী : তুমি একটু বিশ্রাম নাও।
স্বামী : হ্যাঁ, আমার বিশ্রামের দরকার।

পরিচারক : মালকিনের ব্যাপারটা কী আজ? দেখতেই পাচ্ছি না।
পরিচারিকা : মালকিনের তবিয়ত ভাল নেই।
পরিচারক : মালিকও ভাল নেই।
পরিচারিকা : আমি জানতাম এমনটাই হবে।
পরিচারক : হ্যাঁ...কিন্তু বুঝতে পারছি না।
পরিচারিকা : কী?
পরিচারক : প্রকৃতির অদ্ভুত লীলা...ওদের আগে আমরাই না মরি...
পরিচারিকা : এমন কথা কখনোই বলবে না...ওরাই আগে মৃত্যুশয্যায় যাক।
পরিচারক : ওদের মৃত্যুশয্যা অনেক জাঁকজমকপূর্ণ হবে। ওদের মৃতুশয্যা আমি আমার এই কুঠুরিতে নিয়ে আসবই।
পরিচারিকা : তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?
পরিচারক : একজন কাঠমিস্ত্রির খোঁজে। আমাদের খাটটার প্রায় শেষ দশা...।
পরিচারিকা : তাকে বলবে এবার যেন খুব শক্তপোক্ত কাঠ দিয়ে তৈরি করে।

ভাষান্তর : রিঙ্কু বসু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
১৯৪৮—'৫৫

গল্প

নাটক

নিবন্ধ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খালেদ মিয়া

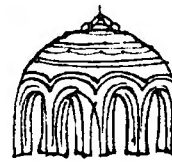

মমতাজ খুব ভোর থাকতে থাকতে ঘুম থেকে উঠে তিনটে ঘর সাফসুতরো করার কাজে লেগে যায়। এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। সিগরেটের টুকরো, পোড়া দেশলাইকাঠি, এটা সেটা ঘরের প্রতিটা কোণ থেকে জড়ো করে সে, তারপর বাইরে ফেলে দেয়। ঘর পরিষ্কার করার কাজ শেষ হলে তবে তার শান্তি। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে।

তার বউ তখনও বারান্দায় ঘুমিয়ে থাকে, বাচ্চাটা দোলনায়।

এত ভোরে উঠে ঘরদোর পরিষ্কার করার কারণটা আর কিছুই নয়, মমতাজের ছেলে খালেদ সবে মাত্র হাঁটতে শিখেছে এবং এই বয়সের আর পাঁচটা বাচ্চার মতোই সে মাটির থেকে যা পায় তাই তুলে মুখে পুরে দেয়।

তবু এত সত্ত্বেও মমতাজ আশ্চর্য হয়ে দেখে যে প্রতিদিনই খালেদ কিছু না কিছু মাটি থেকে কুড়িয়ে পাবেই—সে ভাঙা প্লাস্টারের টুকরো হোক বা অন্য যে কোনও ধরনের নোংরা।

ভোরে উঠে ঘর পরিষ্কার রাখাটা মমতাজকে নেশার মতো পেয়ে বসেছে। যতবার খালেদ মাটি থেকে কিছু কুড়িয়ে মুখে দেয় ততবার সে নিজেকেই নিজে বকাঝকা করে—ভোরবেলা এত অন্যমনস্ক ছিল কেন সে?

কিন্তু খালেদের প্রথম জন্মদিন যত এগিয়ে আসছিল, ততই একটা অন্ধকার ভয়, একটা অহেতুক বিশ্বাস মমতাজকে ক্রমে পেয়ে বসছিল যে এক বছর বয়সে পৌঁছবার আগেই তার ছেলে মারা যাবে।

সবাই জানত যে মমতাজের ফালতু কুসংস্কার নেই। তাই যখন সে কথাটা বউকে বলল, তখন তার বউ প্রথমে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর বলল, 'তুমি? তুমি একথা বলছ, এ ধরনের ভয় পেয়ে বসেছে তোমার মতো লোককে? আল্লার দয়ায় আমাদের ছেলে একশো বছর বাঁচবে, দেখে নিও। আর ওর জন্মদিনের যা আয়োজন আমি এরই মধ্যে করে রেখেছি না, দেখলে তাজ্জব বনে যাবে।'

একথা শুনে মমতাজ বুকে কেমন একটা ধাক্কা খেল। সে-ও তো প্রাণপণে চায় তার ছেলে দীর্ঘজীবী হোক। কিন্তু এই ভয়টাকে কীভাবে কাটাবে সে, ঠিক জানে!

~ www.amarboi.com ~

খালেদের স্বাস্থ্য ছিল বেশ ভাল। এক শীতের বিকেলে খালেদকে নিয়ে রাস্তায় ঘুরে আসার পর মমতাজের গৃহভৃত্য মমতাজের বউকে বলল 'বেগম সাহেবা, বাচ্চাটার গালে এত রুজ লাগাবেন না। কারো নজর লাগতে পারে।' শুনে মমতাজের বউ খুব একচোট হেসে বলল 'ওমা, বোকা কোথাকার, রুজ লাগাব কেন? ওর গাল এমনিতেই এত লাল।'

শীতকালে খালেদের গাল দুটো লাল টুকটুকে ছিল। কিন্তু গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু বিবর্ণ দেখাতে লাগল। ছেলেটা খুব জল ঘাঁটতে ভালোবাসত। রোজ অফিসে যাওয়ার আগে মমতাজ এক বড় গামলা জলের মধ্যে তাকে দাঁড় করিয়ে দিত। খালেদ দুহাত দুপা দিয়ে ইচ্ছে মতো চারদিকে জল ছেটাত, জলের মধ্যে বসে বসে খেলত আর খিলখিল করে হাসত। তা দেখে বাপ-মায়ের সে কি আনন্দ। কিন্তু ইদানীং মমতাজের মন কেমন এক অজানা আশঙ্কার মেঘে ছেয়ে আছে। সে ভাবল, 'আল্লা, আমার বউয়ের কথাই যেন ঠিক হয়। খালেদের মৃত্যুর ভয় কেন যে আমাকে এমন পেয়ে বসেছে। ছেলে তো আমার বেশ সুস্থসবল, অন্য অনেক বাচ্চার থেকে বেশি চনমনে! কেন সে খামোখা মারা যাবে? আমি কি তবে পাগল হয়ে যাচ্ছি? নাকি ওর প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা থেকেই এই ভয়? প্রত্যেক বাবাই কি তার ছেলেকে এত বেশি ভালবাসে? প্রত্যেক বাবাই কি এই একই ভয় নিয়ে বেঁচে থাকে? কী, হলটা কী আমার?'

ঘর তিনটে ঝাঁট দেওয়া হয়ে গেলে মমতাজ মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে বালিশ ছাড়া আধঘণ্টা শুয়ে জিরিয়ে নেয়।

আজ শুয়ে শুয়ে সে ভাবছিল, 'পরশু আমার ছেলের প্রথম জন্মদিন। এক বছর বয়স পূর্ণ হবে খালেদের। যদি ভালয় ভালয় বিনা বিপদে দিনটা কেটে যায় তবে আমার বুকের বোঝা অনেকটা লাঘব হবে। ভয়টা অনেক দূরে সরে যাবে। সবই এখন আল্লার হাতে।'

চোখ বন্ধ করে সে এসব সাত পাঁচ ভাবছিল, যখন হঠাৎ তার মনে হল একটা ভারী কিছু এসে তার বুকের ওপর পড়ল। সে দেখল খালেদ। পাশে তার বউ দাঁড়িয়ে আছে। তার বউ বলল যে বাচ্চাটা নাকি গতকাল সারা রাত ধরে ছটফট করেছে, ঘুমের মধ্যে শিউরে শিউরে উঠেছে বার বার—যেন ভয়ে। মমতাজ টের পেল ছেলেটা এখনও অল্প অল্প কাঁদছে। সে খালেদের মাথায় হাত রেখে বলল, 'আল্লা তোকে রক্ষা করুন।'

তার বউ খুব রেগে গেল একথা শুনে, 'কী যা তা বলছ, তোমার ওই ভয় আর যায় না। আরে খালেদের সামান্য জ্বর হয়েছে মাত্র। ও কমে যাবে। এটা খুব সাধারণ একটা ব্যাপার।'

বউ চলে গেল। মমতাজ খুব সাবধানে খালেদের গায়ে হাত বোলাতে লাগল। ছেলেটা মমতাজের বুকে মুখ রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল। আর মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যেই কেঁপে কেঁপে উঠছিল। হঠাৎ সে জেগে উঠল। বাবাকে দেখতে পেয়ে সে তার বড় বড় কাজলকালো চোখ মেলে হাসল। মমতাজ ওর কপালে চুমু খেল। বলল, 'কী হয়েছে খালেদ মিয়া, এত কাঁপছিস কেন? খালেদ মিয়া বাবার বুকে মাথা রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। মমতাজ ওর গায়ে হাত বোলাতে লাগল আর বলতে লাগল, 'আল্লা, আমার ছেলে যেন দীর্ঘজীবী হয়।'

খালেদের এক বছরের জন্মদিন। মমতাজের বউ খুব ঘটা করে আয়োজন করেছিল।

~ www.amarboi.com ~

তার সব বান্ধবীদের নিমন্ত্রণ করেছিল। জন্মদিনে পরবার জন্যে বিশেষ জামা নামী দর্জিকে দিয়ে সেলাই করিয়েছিল। খাবারের মেনুও ছিল জব্বর। কিন্তু মমতাজের এসব পছন্দ ছিল না। সে মনেপ্রাণে চেয়েছিল জন্মদিনটা নিঃশব্দে কেটে যাক। এমনকি তারও যেন মনে না পড়ে। কেটে যাওয়ার কয়েকদিন বাদে যেন তার মনে আসে জন্মদিনের কথাটা।

খালেদ আবার ঘুম ভেঙে উঠল। মমতাজ ছেলেকে বলল, 'বাবাকে সালাম করবি না?' তা শুনে খালেদ তার ডান হাতের ছোট্ট ছোট্ট নরম আঙুলগুলো কপালে ঠেকাল। মমতাজ বলল, 'বেঁচে থাক বাবা।' সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভেতরটা এক অজানা কষ্টে মোচড় দিয়ে উঠল।

গুটি গুটি পায়ে খালেদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মমতাজের হাতে তখনও বেশ কিছুটা সময় ছিল। সে ভাবল শুয়ে শুয়ে মনটাকে বরং শান্ত করে নেওয়া যাক। হঠাৎ সে বারান্দা থেকে তার বউয়ের আর্ত চিৎকার শুনতে পেল, 'মমতাজসাব, মমতাজসাব শিগগির একবার এদিকে এসো।'

মমতাজ এক ঝটকায় উঠে পড়ল মেঝে থেকে আর বারান্দার দিকে দৌড়ে গেল। সে দেখল খালেদকে কোলে চেপে ধরে বাথরুমের বাইরে তার বউ দাঁড়িয়ে আছে। কোলের মধ্যে ছটফট করছে ছেলে। মমতাজ বউয়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিল ছেলেকে। জিজ্ঞেস করল, 'কী হল হঠাৎ?' তার বউ কাঁপা কাঁপা গলায় জবাব দিল, 'কী জানি। ও তো গামলার জলে খেলা করছিল রোজকার মতোই। আমি ওর চোখমুখ ধুয়ে দিচ্ছিলাম। হঠাৎ করেই খিঁচুনি শুরু হল।'

মমতাজের কোলে ছোট্ট খালেদের শরীরটা প্রবল খিঁচুনিতে বেঁকে যাচ্ছিল, ভিজে কাপড়ের মতো। মমতাজ ওকে বিছানায় শুইয়ে দিল। খালেদ শুয়ে শুয়ে কাঁপছিল। আর আতঙ্কে বিহ্বল স্বামী-স্ত্রী দিশেহারার মতো বুঝে উঠতে পারছিল না এক্ষুনি কী করবে, ওকে চুমু খাবে, আদর করবে, না জল ছিটিয়ে দেবে ওর গায়ে।

কিছুক্ষণ বাদে খিঁচুনি থামল। কিন্তু অজ্ঞান হয়ে গেল খালেদ। মমতাজ ভেবে নিল খালেদ মারা গেছে। সে তার বউকে শান্তভাবে বলল, 'ও আর নেই।'

'তোমার কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এসব কী বলছ তুমি? ওর তড়কা মতো হয়েছিল, এখন ঠিক হয়ে গেছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ও একদম সুস্থ হয়ে যাবে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই খালেদ তার কালো আয়ত চোখ দুটো মেলে ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকাল মমতাজের দিকে। মমতাজ যেন প্রাণ ফিরে পেল, 'খালেদ, কী হল তোর?' উত্তরে শিশু পাণ্ডুর হাসি ফিরিয়ে দিল।

মমতাজ খালেদকে কোলে করে ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে দ্বিতীয়বার খিঁচুনি শুরু হল। আবার খালেদ মমতাজের কোলে ভয়ংকরভাবে বেঁকেচুরে যেতে লাগল।

এই খিঁচুনিও একসময় থেমে গেল। বেশ কিছুটা নিস্তেজ দেখাচ্ছে শিশুটিকে। মমতাজ পাগলের মতো এক নাগাড়ে কথা বলে যেতে লাগল তার সঙ্গে :

'খালেদ এসব কী হচ্ছে তোর?'

~ www.amarboi.com ~

'খালেদ মিয়া উঠে বস। উঠে বস, ওঠ, হাঁট একটুখানি। উঠবি না। তাহলে মাখন খাবি?'

মাখন খালেদের খুব প্রিয়। মমতাজ একে একে খালেদের প্রিয় মিষ্টিগুলির নাম বলে যেতে লাগল, কিন্তু খালেদ প্রতিবারই আলতো ভাবে মাথা নেড়ে জানাল—না। মমতাজ ওকে বুকে চেপে ধরল। তারপর বউয়ের হাতে দিয়ে বলল, 'ওকে রাখো। আমি চট্ করে একজন ডাক্তার ডেকে আনি।'

ডাক্তার নিয়ে ফিরে এসে মমতাজ দেখল তার বউয়ের মুখ থমথম করছে। এরই মধ্যে খালেদের আরও তিনবার প্রবল খিঁচুনি হয়ে গেছে। এখন তাকে একেবারে প্রাণহীন দেখাচ্ছে। কিন্তু ডাক্তারবাবু খালেদকে পরীক্ষা করে বললেন, 'ভয়ের তেমন কিছু নেই। বাচ্চাদের এরকম হয়েই থাকে। অনেক সময় নতুন দাঁত ওঠার কারণে হয়। অনেক সময় পেটে কৃমি হলে হয়। জ্বর তো তেমন বেশি নয়। প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছি, ওষুধ খেলেই কমে যাবে।'

মমতাজ সে দিনটা অফিস ছুটি নিল আর সারাদিন বসে রইল খালেদের পাশে। ডাক্তার চলে যাবার পর আরও দুবার খিঁচুনি হল খালেদের। তারপর সে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ল। বিকেলের দিকে মমতাজ মনে মনে ভাবল, 'আল্লা বোধহয় শেষ পর্যন্ত করুণা করেছেন। বেশ কয়েক ঘণ্টা হয়ে গেল আর খিঁচুনি হয়নি, এভাবে যদি রাত্তিরটা কেটে যায়।'

মমতাজের বউয়ের-ও খানিকটা স্বস্তি হল। সে ভাবল এভাবে যদি রাতটা কেটে যায়, তবে আল্লার ইচ্ছায়, বলা যায় না, কাল হয়তো ছেলে খেলে বেড়াবে।

প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়াতে হচ্ছিল খালেদকে। তাই মমতাজ ঘুমিয়ে পড়ার ভয়ে আর শুল না। খালেদের দোলনার পাশে বসে বসেই রাতটা কাটিয়ে দিল। খালেদ ছটফট করছিল গোটা রাত। ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল মাঝে মাঝেই। জ্বরটাও বাড়ছিল হু হু করে।

সকালবেলা খালেদের ১০৪ ডিগ্রি জ্বর এল। ডাক্তারবাবুকে আবার ডাকা হ'ল। তিনি বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই। ব্রঙ্কাইটিস হয়েছে। ওষুধ লিখে দিচ্ছি, তিন চার দিনে ভাল হয়ে যাবে।'

ডাক্তার চলে গেলে পর মমতাজ খালেদকে এক ডোজ ওষুধ খাইয়ে দিল। কিন্তু তাতে অবস্থার হেলদোল কিছুই হল না। সকাল দশটার সময় একজন বিখ্যাত ডাক্তারকে ডাকা হল। তিনি খুব ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন, চিন্তার কারণ নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু সব ঠিক হল না। বিখ্যাত ডাক্তারের ওষুধও কাজ করল না। খালেদের জ্বর বাড়তে লাগল। মমতাজদের কাজের লোক বলল, 'সাহেব, এটা অসুখ নয়। খালেদের ওপর কারো নজর লেগেছে। আমি এক্ষুনি একটা টোটকা নিয়ে আসছি। দেখবেন ওতে কাজ হবে।'

সাতটা কুয়োর থেকে পবিত্র জল নিয়ে আসা হল। তাতে ওই দিশি টোটকাটা গুলে খাইয়ে দেওয়া হল খালেদকে। কিন্তু টোটকা কাজ করল না। একজন প্রতিবেশী ইউনানি ওষুধ বলে দিলেন। মমতাজ দোকানে গিয়ে ওষুধটা কিনে আনল, কিন্তু কী ভেবে শেষ পর্যন্ত আর খাওয়াল না।

~ www.amarboi.com ~

বিকেলবেলা মমতাজের এক আত্মীয় একজন নতুন ডাক্তারকে নিয়ে এল। ডাক্তার দেখে বললেন, 'এত বেশি জ্বর একমাত্র ম্যালেরিয়াতে হয়। আমি দু-তিনটা ইনজেকশান দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা বরফ জলের পট্টি দিন কপালে।'

বরফজলের পট্টি দেওয়ায় জ্বর নেমে এল ৯৮ ডিগ্রিতে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার জ্বরের পারদ চড়তে শুরু করল। এবার ১০৬ ডিগ্রি। প্রতিবেশিনী এলেন এবং গম্ভীর গলায় বললেন যে সম্ভবত খালেদের ঘাড় ভেঙে গেছে।

শুনে থমকে গেল মমতাজ আর তার বউ। বাড়ির নীচের দোকানটা থেকে মমতাজ ফোন করল হাসপাতালে, হাসপাতাল থেকে বলা হল রোগীকে নিয়ে আসতে। একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকল মমতাজ। তারপর ছেলেকে কোলে নিয়ে বউ-এর সঙ্গে হাসপাতাল রওনা হল। তার খুব জল তেষ্টা পাচ্ছিল, বার বার। হাসপাতাল যাওয়ার পথে তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। সে একবার ভাবল রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে একটা দোকান থেকে একটু জল খেয়ে নেবে। কিন্তু কে যেন ভেতর থেকে বলে উঠল, 'গাড়ি থামালেই বিপদ। খালেদ মারা যাবে।'

হাসপাতালের কাছাকাছি পৌঁছে মমতাজ একটা সিগারেট ধরাল। কিন্তু দু-টান দিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিল সিগারেট। কেননা কে যেন ভেতর থেকে আবার বলে উঠল, 'সিগারেট খেলে ছেলেকে বাঁচাতে পারবে না মমতাজ।' মমতাজ ভাবল, 'ধুত্তোর কীসের এই সব ফালতু ভয়। সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে মারা যাওয়ার কী সম্পর্ক।' সে গাড়ি থামিয়ে দিল। ফেলে দেওয়া সিগারেটের টুকরোটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল। তারপর গাড়িতে ফিরে এসে সিগারেটটা ধরাতে যাবে, সেই মুহূর্তে কে আবার বলে উঠল, 'থামো মমতাজ, সিগারেট ধরালে কিন্তু খালেদ...'

মমতাজ সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সিগারেট। কোচোয়ান অবাক হয়ে তাকাল মমতাজের দিকে। মমতাজ ভাবল লোকটা বুঝতে পেরেছে বোধহয়। সে নিজে থেকেই বলল, 'সিগারেটটা ড্যাম্প ছিল।' বলে পকেট থেকে একটা নতুন সিগারেট বার করল। ধরাতে যাবে এমন সময় হঠাৎ তার গা শিউরে উঠল। যুক্তি দিয়ে সে বুঝল যে অনর্থক এই ভয়, কিন্তু সেই ভেতরের অজানা কণ্ঠস্বর, সেই অচেনা শক্তি তার সব যুক্তিকে ছাপিয়ে গেল।

ঘোড়ার গাড়ি হাসপাতালের গেট দিয়ে ঢুকে গেল। মমতাজ ছুঁড়ে ফেলে দিল না-ধরানো নতুন সিগারেট। ভয়ে খান খান হয়ে ভেঙে যাচ্ছিল সে। হাসপাতাল কয়েক মিনিটের মধ্যেই খালেদকে ভর্তি করে নিল। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বললেন, 'ব্রঙ্কিয়াল নিউমোনিয়া। অবস্থা খুবই খারাপ।'

খালেদের জ্ঞান ছিল না। হাসপাতালের বেডে ওর শিয়রের কাছে বসেছিল ওর মা, দুচোখের দৃষ্টি দুরাশায় ভরা। ঘরের পাশেই বাথরুম। মমতাজের হঠাৎ আবার খুব জল তেষ্টা পেল। সে বাথরুমের কল খুলে সরাসরি জল খেতে লাগল। হঠাৎ আবার সেই কণ্ঠস্বর, 'কী করছ কী, মমতাজ। জল খেলে ছেলেটা বাঁচবে?'

কিন্তু এবার আর মমতাজ ওই সব কথাকে পাত্তা দিল না। সে পেট ভরে জল খেয়ে

~ www.amarboi.com ~

নিল। তৃষ্ণা মিটে গেলে সে আবার ঘরে ফিরে এল। লোহার বেডের ওপর খালেদ শুয়ে আছে। বিবর্ণ, জ্ঞানহারা। মমতাজ চাইছিল পালিয়ে যেতে, চাইছিল যেন খালেদ সুস্থ হয়ে যায়, আর খালেদের নিউমোনিয়া তাকে গ্রাস করে।

মমতাজ লক্ষ করে দেখল, খালেদকে আগের চেয়ে বেশি শুকনো আর ম্লান দেখাচ্ছে। সে ভাবল, 'এ সবই আমার ওই জল খাওয়ার ফল। জল না খেলে হয়তো খালেদ ভাল হয়ে উঠত।' তার খুব অনুশোচনা হল। নিজেকে সে অভিশাপ দিল বার বার, কিন্তু পাশাপাশি সে এটাও ভাবল, যে-মানুষটা এসব ভাবছে সে মমতাজ নয়, অন্য কেউ। কিন্তু কে এই 'অন্য কেউ'? কেন সে এত ভয় আমদানি করে? কোথা থেকে করে? তার তেষ্টা পেয়েছিল সে জল খেয়েছে, ব্যস, মিটে গেল। এর সঙ্গে খালেদের অসুখের কী সম্পর্ক? সে ভাল হয়ে যাবে। খুব ধুমধাম করে তার জন্মদিন করা হবে।

কিন্তু আবার তার হঠাৎ করে মন খারাপ হয়ে গেল। সেই কণ্ঠস্বর আবার বলল, 'এক বছর পূর্ণ হবে না খালেদের।' মমতাজের ইচ্ছে হল যে এসব বলে তার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলতে। কিন্তু লোকটা তো আছে তার ভেতরেই। হায় আল্লা।

ভয়ে আল্লার উদ্দেশ্যে সে বলে উঠল, 'খোদা দয়া করো আমায়। কেন আমার মতো একটা গোবেচারাকে এত কষ্ট দিচ্ছ?'

বিকেল গড়িয়ে গেল। অনেক ডাক্তার দেখে গেলেন, অনেক ওষুধ খাওয়ানো হল, ইন্‌জেকশন দেওয়া হল। কিন্তু খালেদের জ্ঞান ফিরল না। হঠাৎ আবার সেই কণ্ঠস্বর, 'মমতাজ হাসপাতাল ছেড়ে বেরিয়ে যাও, নয়তো কিন্তু খালেদ...'

মমতাজ সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সে হাসপাতাল ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু তখনও সেই ভেতরের কণ্ঠস্বর কথা বলে চলেছে অবিরত। একসময় সে তার বশে চলে গেল। তার সমস্ত হাঁটাচলা, কথাবার্তা, কাজকর্ম যেন সেই অলৌকিক আদেশের আওতায় চলে গেল। সেই কণ্ঠস্বর তাকে নিয়ে গেল একটা হোটেলে। মদের অর্ডার দেওয়াল। মদ টেবিলে পৌঁছবার পর সে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আবার অর্ডার দিল সে, আবার ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এক সময় হোটেল থেকে বেরিয়ে এল সে, মদের আর ভাঙা গেলাসের দাম চুকিয়ে দেবার পর। বাইরে সবকিছু চুপচাপ, শুনশান। কেবল তার মনের মধ্যেই যত ঝড়ঝাপ্টা। সে হাসপাতালে ফিরে গেল। খালেদের ঘরে ঢুকতে যাবে, হঠাৎ সেই আদেশ 'ওখানে আবার যাচ্ছো কেন মমতাজ। খালেদ তাহলে...।'

সে ঘুরে দাঁড়াল। হাসপাতালের লাগোয়া একটা পার্ক ছিল, সবুজ ঘাসে ঢাকা। সেখানে একটা বেঞ্চের ওপর শুয়ে পড়ল সে, তখন রাত প্রায় দশটা। গোটা পার্ক স্তব্ধ আর অন্ধকার, মাঝে মাঝে শুধু পথচলতি গাড়ির হরন্ শোনা যাচ্ছে। হাসপাতালের দেওয়ালে টাঙানো একটা ঘড়ি। মমতাজ শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, 'খালেদ বাঁচবে তো? কেন এই সব শিশু জন্মায় যাদের বছর না পেরোতেই চলে যেতে হবে? না, না খালেদ নিশ্চই ভাল হয়ে যাবে।'

হঠাৎ আবার সেই ভয় চেপে ধরল তাকে। সে চিত হয়ে শুয়ে ছিল। সে ভাবেই শুয়ে থাকতে আদেশ করল সেই কণ্ঠস্বর। সে প্রার্থনা করতে গেল, কণ্ঠস্বর তাকে বারণ করল।

~ www.amarboi.com ~

সে ভাবল, 'এ কী ভয়ঙ্কর শাস্তি আমার। আল্লা, আমাকে এর থেকে মুক্তি দাও। খালেদকে মেরে ফেলাই যদি তোমার উদ্দেশ্য থাকে তবে যা ইচ্ছে হয় করো। কিন্তু এ কী ভয়ানক অত্যাচার!'

ঠিক এই সময় সে কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেল। কিছু দূরে অন্য একটা বেঞ্চে দুটো লোক এসে বসেছিল। তারা খাচ্ছিল আর কথাবার্তা বলছিল। 'কী সুন্দর বাচ্চাটা, না?'

'সত্যিই মা-টার দুঃখ চোখে দেখা যায় না।'

'সত্যি মা-টা।...সব ডাক্তারদের পায়ে পড়ছে।'

'আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি বাঁচানোর।'

'কিন্তু বাঁচানো অসম্ভব।'

'আমি তো ওর মাকে বললাম, "আল্লাকে ডাকা ছাড়া কোনও উপায় নেই"।'

এই সময় একজন ডাক্তারবাবুর চোখে পড়ল মমতাজকে, তিনি চিৎকার করে ডাকলেন, 'এই যে ভাই, ওখানে কী করছ? এদিকে এসো।'

মমতাজ ডাক্তার দুজনের কাছে এসে দাঁড়াল। একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে?'

শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া ঠোঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে মমতাজ বলল 'আমি একজন রোগী।'

'যদি রোগী হও তো পার্কে নয়, ওয়ার্ডে যাও।' একজন রুক্ষভাবে বললেন। মমতাজ আমতা আমতা করে বলল, 'স্যার, আমার ছেলে...। বাচ্চা ছেলে... ওই ওয়ার্ডে...'

'ও, ওটা তোমার ছেলে যে...'

'হ্যাঁ স্যার। সম্ভবত ওকে নিয়েই আপনাকে আলোচনা করছিলেন। আমার ছেলে, খালেদ।'

'ও তুমি ওর বাবা? ওয়ার্ডে যাও, ওয়ার্ডে যাও, তোমার বউ একা রয়েছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' বলল খালেদ আর তারপর হনহন করে হেঁটে গেল হাসপাতালের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মুখোমুখি তার কাজের ছেলেটির সঙ্গে দেখা। মমতাজ লক্ষ করল সে কাঁদছে। মমতাজকে দেখে সে চিৎকার করে উঠল, 'খালেদ আর নেই—'

মমতাজ ঘরে ঢুকল। দেখল তার বউ মেঝেতে শুয়ে রয়েছে। একজন ডাক্তার ও একজন নার্স তার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করছে। মমতাজ খালেদের বেডের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। খালেদ শুয়ে আছে। দুচোখ বোজা। মুখে এক ধরনের প্রশান্তির ছাপ, নাকি মৃত্যুর।

মমতাজ ওর রেশম কোমল চুলে বিলি কেটে দিতে লাগল। মমতাজের গলার কাছটায় কী যেন একটা দলা পাকিয়ে উঠছিল। অস্ফুট গলায় সে বলল, 'একটা মিষ্টি এনে দেব খাবি?' ছোট্ট খালেদ মাথা নাড়ল না।

তখন মমতাজ উন্মাদের মতো চিৎকার করে বলল, 'খালেদ মিয়া। তুমি তো চলে গেছ। আমার ভয়টাকে এবার তুমি নিয়ে যাও—।'

এ কথায়, মনে হল বাচ্চাটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

ভাষান্তর : সুদীপ বসু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বুনো ঝোপের পিছনে

শহরের নামটা এখানে খুব একটা জরুরি নয়। ধরা যাক পেশোয়ারের কাছাকাছি একটা মফস্‌সল শহর, সীমান্ত অঞ্চল থেকে খুব একটা দূরে নয়। এখানেই থাকত সেই মহিলা, একটা ছোট্ট মাটির বাড়িতে, ধূলিধূসর নিঃসঙ্গ সুড়কির রাস্তাটার থেকে একটু আড়ালে, এক ঝাঁক বুনো ক্যাকটাসের ঠিক পাশে।

ক্যাকটাসগুলো বেশ শুকনো, কিন্তু ঝাড়টা এত বড় আর ছড়ানো যে পথচলতি লোকদের নজর থেকে আড়াল করত বাড়িটাকে। পর্দার কাজ করত একরকম। কেউই ঠিকমতো জানে না, ক্যাকটাসগুলো আগে থেকেই ওখানে ছিল, না ওই মহিলাই প্রথম পুঁতেছিল তার বীজ।

বাড়িটায় মোট তিনটে ঘর, প্রত্যেকটিই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আসবাবপত্র তেমন একটা কিছু নেই, কিন্তু যা আছে বেশ সাজানো-গোছোনো। একদম পেছনের ঘরটায় ছিল একটা বিশাল বিছানা, তার পাশে একটা চোরকুঠুরি যেখানে একটা মাটির প্রদীপ সারারাত জ্বলত। সব কিছুই বেশ ছিমছাম।

এবার ওই মহিলা আর তার মেয়ের সম্বন্ধে কিছু বলি।

অনেক রকম গল্প ছিল তাদের ঘিরে। কেউ বলত যে ওটি তার নিজের মেয়ে। কেউ বলত, মেয়েটি অনাথ। মহিলাটি তাকে রাস্তা থেকে তুলে এনে মানুষ করে। আবার অনেকের মতে, মেয়েটি মহিলারই অবৈধ সন্তান। আসল সত্যিটা কেউ জানত না।

মহিলার নাম কী ছিল? যা কিছু হতে পারে—সকিনা, মেহতাব, গুলশন অথবা অন্য কোনও নাম, কিন্তু আমাদের সুবিধার খাতিরে ধরা যাক তার নাম ছিল সরদার।

মহিলা মধ্যবয়সিনী। অল্পবয়সে বেশ সুন্দরীই ছিল মনে হয়, এখন তার চামড়া একটু কুঁচকে গেছে, তবু সত্যিকারের বয়স বোঝা যায় না।

মেয়েটি ছিল যাকে বলে পরমাসুন্দরী, যদি এই শব্দটা একান্ত ব্যবহার করতেই হয়। তাকে দেখে ঠাওরই করা যেত না যে সে আদতে এক বেশ্যা। কেননা মেয়েটি, ধরা যাক

~ www.amarboi.com ~

তার নাম নবাব, নিজের জীবন নিয়ে বেশ খুশিই ছিল। আসলে সে এমন একটা পরিবেশে বেড়ে উঠেছিল যেখানে বিয়ে-ফিয়ের ধারণাগুলোই ছিল না।

সরদার যেদিন প্রথম লোক বসাল তার ঘরে, বাড়ির পেছনের দিকে বিরাট বিছানায়, সে একটুও অবাক হল না। তার মনে হয়েছিল যে একজন বয়ঃসন্ধি পেরনো মেয়ের ক্ষেত্রে এটাই তো স্বাভাবিক ঘটনা। এতে দুঃখ করার কী আছে?

সে ছিল চলতি অর্থে বেশ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সেসব নিয়ে তার কপালে ভাঁজ পড়ত না। বেশ্যা তো বেশ্যা, ব্যস মিটে গেল, এতে আশ্চর্যের কী আছে? অপরাধবোধ, অনুশোচনা, পাপ এসব শব্দ তার দুনিয়ায় কখনও শোনেনি।

কাজের ব্যাপারে সে ছিল খুব সিরিয়াস। যেসব পুরুষ তার কাছে আসত তাদের সে উজাড় করে দিত তার সবটুকু। এটাই সে মনে করত একজন নারীর প্রকৃত কর্তব্য।

শহরের জীবন সম্বন্ধে তার কোনও জ্ঞানই ছিল না। কিন্তু যে সব পুরুষ শহর থেকে তার কাছে আসত তাদের কাছে সে শিখেছিল কী করে দাঁত মাজতে হয় প্রতিদিন সকালে, কীভাবে ভোরে অন্তত এক কাপ চা খেতে হয়, কিম্বা জামাকাপড় পরে বেরোবার আগে স্নানটা সেরে নিতে হয়।

সব লোক একরকম নয়। মেয়েটি বুঝতে পেরেছিল। কেউ কেউ ভোরবেলা শুধু সিগারেট খেতে চাইত। বেশির ভাগ চাইত এক কাপ গরম চা। কেউ কেউ রাতে ঘুমোত না। আবার অনেকে অঘোরে ঘুমোত আর ভোরের আলো ফোটবার আগেই কেটে পড়ত।

সরদারের কোনও ব্যাপারেই কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না। মেয়েটির ওপর তার অগাধ আস্থা ছিল। সে সন্ধে হতেই সাত তাড়াতাড়ি আফিমের গুলি খেয়ে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে যেত। কেবলমাত্র জরুরি কোনও ঘটনায় তাকে ডেকে তোলা হত। ধরো কোনও খদ্দের মাত্রাতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফলে আর উঠেই দাঁড়াতে পারছে না। তখন সরদারকে জাগিয়ে তোলা হত। সে ঘুম থেকে উঠেই এইসব নির্দেশ দিত, 'আমের আচার দাও ওকে, তারপর এক গ্লাস নুনজল গেলাও। তাহলে বমি হয়ে যাবে। আর ও সুস্থ হয়ে উঠবে। এখন ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখো।'

সরদার কিন্তু ধুরন্ধর মহিলা ছিল। তার কোনও চিন্তাটিন্তা ছিল না। খদ্দেরদের আগাম টাকা দিতে হত। টাকা বুঝে নিত সরদার আর তারপর বলত, 'যাও দুজনে এবার ফুর্তি-টুর্তি করো গিয়ে।'

টাকাটা থাকত সরদারের জিম্মায়, কিন্তু যা কিছু উপহার, যেমন জামাকাপড়, ফল, মিষ্টি এগুলো পেত নবাব।

নবাব খুব হাসিখুশি মেয়ে ছিল। ওই তিন ঘরের মাটির বাড়িটাতে জীবন ছিল মসৃণ আর সুন্দর। অনেকদিন আগে এক আর্মি অফিসার তাকে একটা গ্রামোফোন উপহার দিয়েছিল। যখন একা থাকত সে সেই গ্রামোফোনে গান শুনত। গান গাইবারও চেষ্টা করত মাঝেমধ্যে, গ্রামোফোনের সঙ্গে, কিন্তু তার গাইবার তেমন ক্ষমতা ছিল না। গলায় সুর খেলত না ভাল। কিন্তু তা নিয়ে তার আক্ষেপও ছিল না কিছু।

~ www.amarboi.com ~

বুনো ক্যাকটাসের ঝোপের ওপারের পৃথিবী সম্পর্কে নবাবের কোনও ধারণাই ছিল না। তার কাছে জীবন মানে একটা লম্বা রুক্ষ ধূলিধূসর রাস্তা আর সেইসব লোক যারা গাড়ি চড়ে আসে আর তাদের আসাটা জানান দেওয়ার জন্যে গাড়ির হরন্ বাজায় ক্রমাগত। আর সরদার একটু দূরে তাদের গাড়ি পার্ক করবার জায়গাটা দেখিয়ে দেয়। তারা সেখানে গাড়ি রেখে সটান ঢুকে পড়ে নবাবের শোবার ঘরে।

প্রতিদিন পাঁচজন কি ছ'জন খদ্দের আসত নবাবের কাছে কিন্তু সরদারের ব্যবস্থা এমন পাকা ছিল যে কারোর সঙ্গে কারোর দেখা হত না। প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঠিক করা থাকত।

সরদার খেয়াল রাখত, নবাব যেন গর্ভবতী হয়ে না পড়ে। সে অল্পবয়সী মেয়ে, এ সম্ভাবনা সবসময় ছিল। কিন্তু আড়াই বছর কেটে যাবার পরেও কোনও অঘটন ঘটেনি।

সরদারের এই ব্যবসার ব্যাপারে পুলিশও ছিল অন্ধকারে।

একদিন একটা বিশাল 'ডজ্' গাড়ি এসে থামল সরদারের বাড়ির সামনে। ড্রাইভার দুবার হরন্ বাজাল। তারপর গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক। তাঁকে সরদার চেনে না। ভদ্রলোকও বললেন না কে তিনি। গট্‌গট্ করে তিনি ঢুকে গেলেন বাড়িতে, যেন কত বছরের চেনা।

সরদার একটু হতভম্ব হয়ে গেল। কিন্তু নবাব হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে এই নতুন আগন্তুককে তার নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট বাদে সরদার সেই ঘরে গেল। দেখল বিছানার ওপর পাশাপাশি বসে আছে নবাব ও সেই ভদ্রলোক, বেশ স্বচ্ছন্দভাবে কথাবার্তা চলছে। সরদার বুঝতে পারল আগন্তুক বেশ বড়লোক আর সুপুরুষ। সে জিজ্ঞেস করল, 'এই বাড়ির কথা আপনাকে কে বলল?'

আগন্তুক ভদ্রলোক হাসলেন, তারপর নবাবকে জড়িয়ে ধরে বললেন 'এই মিষ্টি মেয়েটা এখানে আছে, জানতাম না।' নবাব তাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'কিন্তু আমি তো জীবনে আপনাকে দেখিনি।' ভদ্রলোক শান্তভাবে বললেন, 'আমি তো দেখেছি।'

অবাক হয়ে নবাব জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়? কবে?' নবাবের হাত দুটো নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে এই নতুন আগন্তুক বললেন, 'তুমি বুঝবে না। মাকে জিজ্ঞেস করো।' নবাব সরদারকে জিজ্ঞেস করল, 'ওনাকে কি আমি আগে দেখেছি?' সরদারের চৌখশ মাথায় ততক্ষণে খেলে গেছে ব্যাপারটা কী ঘটেছে, তারই খুব কাছের একজন ওঁকে এই বাড়ি চিনিয়ে দিয়েছে। সে বলল, 'ও নিয়ে তুমি চিন্তা করো না নবাব। পরে সব খুলে বলব।'

এ কথা বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর কয়েকটা আফিমের গুলি মুখে পুরে শুয়ে পড়ল। তার মন বলছিল লোকটা ঝামেলা পাকাবে না।

আগন্তুকের নাম হয়বত খাঁ। পাশের জেলা হাজারার সবচেয়ে ডাকসাইটে জমিদার।

কয়েক ঘণ্টা বাদে ভদ্রলোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সরদারকে ডেকে বললেন, 'ভবিষ্যতে নবাবের কাছে যেন অন্য কোনও লোক না আসে, খেয়াল রাখবে।'

~ www.amarboi.com ~

সরদার যেন আকাশ থেকে পড়ল, ‘খাঁ সাহেব, আপনি একা তাহলে এই সব লোকের টাকাটা দেবেন তো?’

হয়বত খাঁ জবাব দিলেন না। পকেট থেকে একটা মোটা নোটের বান্ডিল বার করে মাটিতে ছুঁড়ে দিলেন। আঙুল থেকে একটা হিরের আঙটি খুলে নবাবের রোগা আঙুলে পরিয়ে দিলেন। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ক্যাকটাসের ঝোপ পেরিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

নবাব টাকাগুলোর দিকে তাকাল না, কিন্তু হিরের আংটিটার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। একরাশ ধুলো উড়িয়ে হয়বত খাঁর গাড়ি বেরিয়ে গেল।

নবাব বাইরে থেকে ফিরে এসে দেখল সরদার টাকার বান্ডিলটা গুনছে। উনিশশো টাকা ছিল। আর একটা একশো হলেই দুহাজার হয়ে যেত, সরদার ভাবল, তারপর টাকাগুলো ঠিক জায়গায় রেখে আরও দুটো আফিমের গুলি খেয়ে সে শুয়ে পড়ল।

নবাব বার বার শিউরে উঠছিল। হিরের আংটিটা থেকে সে আর কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছিল না। এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল। একজন পুরনো খদ্দের এসে উপস্থিত হল একদিন। সরদার তাকে এই বলে হটিয়ে দিল যে, যে কোনও মুহূর্তে পুলিশ রেইড করতে পারে, এই ভয়ে সে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলেছে।

সরদার নিজের কাছে খুব পরিষ্কার ছিল। সে জানত হয়বত খাঁ-এর বিস্তর টাকাপয়সা আছে। এবার সুবিধে হবে কি, একজন লোকই মাত্র বাড়িতে আসবে আর টাকাপয়সাও আসবে নিয়মিত। তাই সে পুরনো খদ্দেরদের সবাইকে এক এক করে ভাগিয়ে দিল।

এক সপ্তাহ পরেই আবার হয়বত খাঁ সাহেব এলেন। কিন্তু তিনি সরদারের সঙ্গে কোনও কথাই বললেন না। সটান তিনি নবাবের ঘরে চলে গেলেন। সরদার তার আফিমের গুলির শিশি নিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকল বিছানায়।

এরপর থেকে হয়বত খাঁ নিয়মিত আসতে শুরু করলেন। নবাবের সারল্য তাঁকে মুগ্ধ করত। কেমন শিশুর মতো সে নিজেকে সঁপে দিত খাঁ সাহেবের কাছে। তার মধ্যে কোনও ভান-ভনিতা নেই। সে সাধারণ আর পাঁচটা বেশ্যার মতো নয়। আবার সে ঘরের বউ-ও নয়। সে হয়বত খাঁ-র পাশে এমনভাবে শুয়ে থাকত যেন একটা বাচ্চা শুয়ে আছে মা'র পাশে, মা'র কান বা নাকের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দিচ্ছে অবলীলায়। আর তারপর চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ছে।

নবাব হয়বতের জীবনের এক নতুন অভিজ্ঞতা। মজার একটা মেয়ে বটে সে। হয়বত ঘন ঘন তার কাছে আসতে লাগলেন।

সরদারের আনন্দ আর ধরে না। এত এত টাকা নিয়মিত আসছে বাড়িতে, এত সহজেই। কিন্তু নবাব মাঝে মধ্যে একটু মুশকিলে পড়ত। মুশকিলটা হল হয়বত খাঁ-র এক অদ্ভুত স্বভাব। ভয়। অজানা ভয়। যখনই কোনও ভারী ট্রাক বা বাস বাইরের হাইওয়ে দিয়ে যেত, হয়বত ভয়ে কেঁপে উঠত। ধড়মড়িয়ে উঠে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে গাড়ির নম্বার প্লেটটা দেখতে ছুটে যেতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একদিন মাঝরাতে একটা বাসের শব্দে হয়বত এতটাই ভয় পেয়ে গেলেন যে হঠাৎ নিজেকে নবাবের আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে বসলেন। নবাবের কাঁচা ঘুম ভেঙে গেল। সে বলল, 'কী হল সাহেব?' হয়বত ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। বললেন, 'না, না, ও কিছু না। বোধহয় স্বপ্ন দেখছিলাম।' ততক্ষণে বাসের আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

নবাব বলল, 'না খাঁ সাহেব, একটা কোনও রহস্য আছে। যখনই আপনি বাস লরির শব্দ শোনেন, আপনি কেমন অস্থির হ'য়ে ওঠেন।'

কথাটা হয়বত খাঁ-এর মনে লেগে গেল। তিনি কঠিন গলায় বললেন, 'কী সব ফালতু বকছ? শুধু শুধু বাস আর গাড়িকে ভয় পেতে যাব কেন আমি?'

ধমক খেয়ে নবাব কেঁদে ফেলল। হয়বত খাঁ তাকে আদর করল। তবুও সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলল।

হয়বত খাঁ ছিলেন সুদর্শন পুরুষ, এবং আবেগী প্রেমিক। তিনি নবাবের সদ্যফোটা শরীরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। এই প্রথম জীবনে নবাব টের পাচ্ছিল কাকে বলে ভালবাসা। তিনি চলে যাওয়ার পর বহুক্ষণ সে গুম মেরে বসে থাকত, রেকর্ড চালিয়ে গান শুনত।

এভাবে মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগল। নবাব আরও আরও বেশি করে মানসিকভাবে জড়িয়ে পড়ল হয়বতের সঙ্গে। কিন্তু হয়বত খাঁ ইদানীং একটু অনিয়মিত হয়ে পড়ছিলেন। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে আসেন, খুব চঞ্চল দেখায় তাঁকে। মনে হয় কোনও চাপের মধ্যে আছেন। ইচ্ছে না থাকলেও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে যান।

নবাব বার বার জানতে চায় আসল সত্যিটা কী, কিন্তু হয়বত খাঁ বার বার এড়িয়ে যান।

একদিন খুব সকালবেলা একটা 'ডজ্' গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। নবাব ঘুমিয়ে ছিল, ধড়মড় করে উঠে বসল। তারপর দৌড়ে বেরিয়ে এল বাইরে আর হয়বত খাঁ-কে জড়িয়ে ধরল। হয়বত তাকে অনেকক্ষণ ধরে আদর করলেন তারপর এসে ঢুকলেন ভিতরঘরে।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে তারা কথা বলে চলল খুব আবেগপ্রবণভাবে। এই প্রথম নবাব হয়বত খাঁ-এর কাছে আবদার করে কিছু চাইল।

'আমাকে কয়েকটা সোনার চুড়ি এনে দেবে?' হয়বত তার কপালে চুমু খেয়ে বললেন 'কালই এনে দেব। চুড়ি তো তুচ্ছ তোমার জন্য আমি জীবন দিয়ে দিতে পারি।' লজ্জায় লাল হয়ে নবাব বলে উঠল, 'আপনি কেন দেবেন, দিতে হলে আপনার জন্যে আমি জীবন দেব।'

হয়বত খাঁ নবাবকে খুব নরম গলায় বললেন, 'আমি কালই সোনার চুড়ি নিয়ে আসব আর নিজের হাতে তোমায় পরিয়ে দেব। খুশি তো?'

নবাব খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল। তার খুব একচোট নাচতে ইচ্ছে করছিল। সরদার তাকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করল। তারপর আফিমের গুলি হাতে নিজের ঘরে চলে গেল।

~ www.amarboi.com ~

প্রচণ্ড উত্তেজনা নিয়ে নবাব পরের দিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠল। আজই সেই দিন যেদিন খাঁ সাহেব সোনার চুড়ি এনে দেবেন নবাবকে। তবু তার মন যেন অন্য কথা বলছিল, আগের রাতে তার চোখে একফোঁটা ঘুম আসেনি।

কিন্তু হয়বত খাঁ এলেন না। নবাব মাকে বলল 'খাঁ সাহেব তো এলেন না। কথা দিলেন কিন্তু এলেন না।'

মনে তার দুশ্চিন্তার মেঘ ভিড় করে এল। তবে কী কোনও দুর্ঘটনা ঘটল হয়বতের? অসুস্থ হয়ে পড়লেন কি? সে অবিরত গাড়ির আওয়াজ শুনতে লাগল হাইওয়ে থেকে আর ভাবতে লাগল গাড়ির শব্দে কেমন ভয় পেয়ে শিউরে উঠতেন খাঁ সাহেব।

এভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেল। ক্যাকটাসের ঝোপের আড়ালে বাড়িটায় আর কোনও কোলাহল রইল না। নিস্তরঙ্গ বাড়িতে শুধু মা আর মেয়ে। যখনই হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটে যেত পিছনে ধুলো মেঘ ছড়িয়ে নবাবের মনে পড়ত হয়বতের মুখ। ছুটন্ত বাস আর হয়বত খাঁ তার কাছে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল।

একদিন দুপুরবেলা যখন মা-মেয়ে দুজনেই ঘুমোচ্ছে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল বাইরে। গাড়িটা হরন্ বাজাল, তবে এটা হয়বত খাঁ-এর গাড়ি নয়। তবে কার?

সরদার বাইরে গেল দেখতে যে পুরনো কোনও খদ্দের এল কিনা। গিয়ে দেখল গাড়ির ভেতর বসে আছেন হয়বত খাঁ। গাড়িটা তাঁর নয়। তাঁর পাশে বসে আছেন এক সুসজ্জিতা সুন্দরী মহিলা। হয়বত খাঁ বাইরে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে এই নতুন মহিলা। সরদার হকচকিয়ে গেল। এই মহিলার কী সম্পর্ক খাঁ সাহেবের সঙ্গে? এখানে ওনাকে নিয়ে আসার কারণটা কী?

হয়বত ও ভদ্রমহিলা সোজা ঢুকে গেলেন নবাবের ঘরে, সরদারকে তোয়াক্কা না করেই। সরদার ভেতর ঘরে গিয়ে দেখল তারা তিনজন বিছানায় বসে আছে। এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতায় থমথম করছে ঘর। এই নতুন মহিলা, দামি মণিমাণিক্যে সজ্জিতা, একটু যেন দিশেহারা হয়ে আছেন।

সরদার দরজায় দাঁড়িয়ে হয়বত খাঁকে সালাম জানাল। হয়বত যেন দেখেও দেখলেন না। একটা অদ্ভুত অস্থিরতা আর উত্তেজনার ঘোরে রয়েছেন তিনি, দেখে মনে হল।

এই নতুন ভদ্রমহিলা সরদারকে হুকুমের সুরে বললেন, 'কিছু খাবার নিয়ে আসতে তো পারো?'

'আমি এক্ষুনি তৈরি করে আনছি, যা খেতে চাইবেন আপনারা', সরদার জবাব দিল।

ভদ্রমহিলার কথার সুরে একটা আশ্চর্য দাপট ছিল। 'যাও রান্না ঘরে যাও। আগুন জ্বালাও। বড় কড়াই আছে তোমার?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ', সরদার বলল।

'ভাল করে বাসনকোসন ধোবে। আমি পরে যাচ্ছি রান্নাঘরে', বলে ভদ্রমহিলা গ্রামোফোনটা পরীক্ষা করতে লাগলেন।

সরদার খুব বিনীতভাবে বলল, 'কিন্তু... কিন্তু... এখানে তো এখন মাংস পাওয়া যাবে না।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'সে দেখা যাবে খন।' ভদ্রমহিলা বললেন, 'এখন বড় করে আগুন জ্বালো। যাও, যা বলছি করো গিয়ে।'

সরদার চলে গেল। ভদ্রমহিলা মিষ্টি হেসে নবাবকে বলল 'নবাব, তোমার জন্যে সোনার চুড়ি এনেছি, নেবে না?'

এই বলে ভদ্রমহিলা তার ব্যাগ খুলে বেশ ভারী একগাছি সোনার চুড়ি বের করলেন, টিসু পেপারে মোড়া।

নবাব হয়বত খাঁর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খাঁ সাহেব, ওনাকে তো চিনলাম না।'

সোনার চুড়িগুলি নিয়ে খেলা করতে করতে ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি হয়বতের বোন, হালাকাত।' এই বলে তিনি হয়বতের দিকে তাকালেন।

নবাব বুঝতে পারল না কী ঘটতে চলেছে, তার খুব ভয় করতে লাগল।

ভদ্রমহিলা নবাবের হাতে চুড়িগুলো পরিয়ে দিতে লাগলেন। তিনি হয়বতকে অনুরোধ করলেন ঘরের বাইরে যেতে যাতে তিনি নবাবকে মনের মতো করে সাজিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত করতে পারেন।

হয়বত খাঁ স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। ভদ্রমহিলা আদেশ করলেন, 'বেরিয়ে যাও ঘর থেকে।'

নবাবের দিকে একবার তাকিয়ে হয়বত খাঁ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

ঘরের বাইরেই রান্নাঘর। সরদার সেখানে স্টোভ জ্বালিয়েছে। ক্যাকটাসের জংলি ঝোপ পেরিয়ে হয়বত হাইওয়েতে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে খুব বিবর্ণ আর ম্লান দেখাচ্ছিল।

একটা বাস এসে দাঁড়াল। খাঁ সাহেবের ইচ্ছে হল বাসে উঠে পালিয়ে যান। কিন্তু তা হল না। বাসটা ছেড়ে গেল, তাঁর সারা শরীর ধুলো আর ধোঁয়ায় ভরিয়ে দিয়ে। তিনি চিৎকার করে থামতে বলতে গেলেন। কিন্তু তাঁর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না।

একবার তাঁর মনে হল বাড়িটার ভেতর দৌড়ে যান, কিন্তু তাঁর পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে আঠা দিয়ে কেউ আটকে রেখেছিল।

তিনি এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে পুরো পরিস্থিতি ভাবতে লাগলেন। যে-মহিলাটি এখন ওই বাড়িতে রয়েছে, তার সঙ্গে কত পুরনো পরিচয়। হয়বত তার মৃত স্বামীর বন্ধু। অনেক বছর আগে তাদের প্রথম দেখা হয়েছিল। বন্ধুর মৃত্যুতে তাকে সান্ত্বনা জানাতে গিয়ে মহিলার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। হালাকাতের আদেশ যেন তিনি ভৃত্যের মতো পালন করেছিলেন। মেয়েদের ব্যাপারে তেমন কিছু অভিজ্ঞতা ছিল না হয়বত খাঁর। শহিনা যে তার নাম নবাবকে বলেছে হালাকাত অর্থাৎ মৃত্যু, তাঁর প্রেমিকা হয়ে উঠেছিল আর তিনি ভেবেছিলেন, জীবনে দারুন একটা কাজ করে ফেলেছেন। হালাকাত ধনী পরিবারের মেয়ে, এবার স্বামীর সম্পত্তিও পেয়েছিল। কিন্তু ধনসম্পদে হয়বত খাঁর আগ্রহ ছিল না। হালাকাতই তাঁর জীবনে প্রথম নারী।

অনেকক্ষণ হয়বত দাঁড়িয়ে রইলেন বড় রাস্তায়। তারপর বাড়িটার ভেতরে ঢুকলেন। ভেতরের ঘরে দরজাটা তখনও বন্ধ ছিল। রান্না ঘরে সরদার কিছু একটা রান্না করছিল।

~ www.amarboi.com ~

অধৈর্যের মতো হয়বত দরজা ধাক্কা দিলেন। দরজা খুলল না। আবার ধাক্কা দিলেন দরজা। এবার দরজা খুলে গেল। হয়বত বাকরুদ্ধ হয়ে দেখলেন ঘরের মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। শহিনা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

'দেখো, তোমার জন্যে কী সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছি নবাবকে', তিনি বললেন।

'কোথায় সে?' হয়বতের গলা ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

শহিনা খুব শান্ত গলায় বললেন, 'সে? মানে নবাব? সে তো এখানেই আছে। তার কিছুটা তুমি বিছানার ওপর পাবে, তবে বেশির ভাগটাই রান্নাঘরে।'

আতঙ্কে কাঁদতে শুরু করলেন হয়বত খাঁ। মেঝের উপর চাপ চাপ রক্তের পাশে একটা লম্বা ছুরি পড়ে ছিল। বিছানায় কেউ একটা শুয়ে আছে রক্তাক্ত চাদরে ঢাকা।

শহিনা হাসলেন, 'চাদরটা তুলে দেখাব কে শুয়ে আছে? তোমার নবাব, খুব যত্ন করে ওর ব্যবস্থা করেছি আমি। তবে আগে খাওয়া দাওয়া সেরে নাও। তোমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। সরদার একটা দারুণ রান্না চাপিয়েছে দেখো গে যাও, পৃথিবীর সবচেয়ে সুস্বাদু মাংস। আমি নিজে তার ব্যবস্থা করেছি।'

'কী করেছ কী তুমি?' হয়বত খাঁ চিৎকার করে উঠলেন।

শহিনা শান্তভাবে হাসলেন, 'হয়বত, এটাই প্রথমবার নয়। আমার স্বামীও ছিল তোমারই মতো অবিশ্বাসী। আমি তাকে খুন করতে বাধ্য হয়েছিলাম আর কাটা হাত আর পাগুলো ছুঁড়ে দিয়েছিলাম পাখিদের খাবার হিসেবে। কিন্তু তোমাকে ভালবাসি, তাই আজ তোমার বদলে...'

শহিনা রক্তমাখা চাদরটা সরিয়ে দিলেন। হয়বত খাঁ অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

যখন তাঁর জ্ঞান ফিরল তখন তিনি গাড়িতে করে কোথাও একটা যাচ্ছেন। শহিনা নিজে গাড়ি চালাচ্ছেন। গাড়ির কালো কাচের বাইরে ঝাপসা মফস্‌সলের ছবি ফুটে উঠেছে।

ভাষান্তর : সুদীপ বসু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পেরিন

সেই সময়টাতে আমি টাকা পয়সার খুব টানাটানির মধ্যে বম্বেতে থাকতাম। একটা 'খোলি'-তে থাকতাম, একটা ছোট্ট ঘর যার জন্যে মাসে নটাকা ভাড়া গুনতে হত। জল ছিল না। বিদ্যুৎ ছিল না। রাত্তিরবেলা ছারপোকা আর আরশোলা উড়ে এসে গায়ে পড়ত। আর ছিল ইঁদুর, ধেড়ে সাইজের, এত বড় ইঁদুর আমি জীবনে দেখিনি।

আমাদের পট্টিতে মাত্র একটা কমন বাথরুম ছিল যার দরজা বন্ধ হত না। প্রত্যেকদিন ভোরবেলা মেয়েরা—গুজরাতি, মরাঠী, ইহুদি, ক্রিশ্চান—লাইন দিত খাবার জলের জন্যে।

আমার স্বভাব ছিল মেয়েরা ঘুম থেকে ওঠার আগে বাথরুম সেরে ফেলা। একদিন ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। আমি পড়িমরি করে বাথরুমে ঢুকে পড়েছিলাম দরজা খোলা রেখেই। আমাদের প্রতিবেশিনী এক মহিলা সেই মুহূর্তে জল নিতে বাথরুমে ঢুকে তো একেবারে থ। কলসী ফেলে যেন বাঘ তাড়া করছে এমনভাবে তিনি দৌড় লাগালেন। স্নান করতে করতে আমি তো হেসেই খুন।

একটু পরে আবার দরজা খুলে গেল। এবার ব্রিজমোহন। ততক্ষণে আমার স্নান হয়ে গেছে। আমি জামাকাপড় পরছি।

ব্রিজমোহন বলল, 'আজ রোববার।'

তখন আমার মনে পড়ল যে প্রতি রোববার ব্রিজমোহন পেরিনের সঙ্গে দেখা করতে বান্দ্রা যায়। আজও যাবে। পেরিন একটা শাদামাটা পারসি মেয়ে, যার সঙ্গে প্রায় তিন বছর ধরে ব্রিজমোহন সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। প্রত্যেক রোববার আট আনা ধার করে ব্রিজমোহন বান্দ্রা যায়, পেরিনের পাশে বসে 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া'য় 'ক্রসওয়ার্ড পাজল্'-এর সমাধান করতে। ব্রিজমোহন বেকার, বাড়িতে যখন একা থাকে, অধিকাংশ সময়ই পেরিনের 'পাজল্'-গুলো নিয়ে মেতে থাকে। তার সাহায্য পেয়ে পেরিন অনেক পুরস্কার জিতেছে, কিন্তু ব্রিজমোহনকে তার এক আনা ভাগও দেয়নি।

তবু ব্রিজমোহন পেরিনকে ভালবাসে। ব্রিজমোহন ছিল ফোটোগ্রাফার। তার কাছে

~ www.amarboi.com ~

পেরিনের ছবির বিপুল সংগ্রহ ছিল। সবরকম ভঙ্গিমায় আর বিভিন্ন রকম পোশাকে। কখনও টাইট শার্ট আর সালোয়ারে, কখনও শাড়িতে। পশ্চিমি পোশাকেও দেখা যায় তাকে ব্রিজমোহনের ফোটোতে, এমনকি স্নানের পোশাকেও। দেখতে এমন কিছু ছিল না পেরিন। তবে সে কথা আমি ব্রিজমোহনকে মুখ ফুটে বলিনি। আমি মেয়েটি সম্পর্কে কোনও কৌতুহল দেখাইনি। সে কে, কী করে, কীভাবে ব্রিজমোহনের সঙ্গে আলাপ হল, বিয়ে হবে কী না...এইসব। ব্রিজমোহন নিজে থেকেও কিছু বলেনি। রুটিনটা ছিল এইরকম, প্রত্যেক রোববার ব্রিজমোহন আমার থেকে আট আনা ধার করে পেরিনের সঙ্গে দেখা করতে বান্দ্রা যেত। বেরিয়ে যেত ভোরবেলা আর ফিরতে ফিরতে সেই বিকেল।

এক রোববার সে বান্দ্রা থেকে ফিরে এসে হঠাৎই আমায় বলে বসল, 'আজ সব শেষ হয়ে গেল।'

'কী শেষ হয়ে গেল?', আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

ব্রিজমোহন তার বুকের বোঝা হালকা করল আমার কাছে। সে একটানা বলে যেতে লাগল, 'পেরিনের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এলাম। ওকে বললাম, "তুমি একটা অপয়া মেয়েমানুষ। কেননা যখনই তোমার সঙ্গে নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ করি, তখনই আমার চাকরি চলে যায়।" তখন পেরিন বলল, "তাহলে আর এসো না, দেখো এবার একটা পাকাপোক্তো চাকরি পাও কিনা। আসলে তা নয়, আমি কিছু নয়, তুমিই একটা অলস পুরুষ মানুষ। কাজ করার ইচ্ছেটাই তোমার নেই।" '

এই বলে ব্রিজমোহন থামল। তারপর আমাকে বলল, 'কাল সকালে আমায় চার আনা ধার দিও না, আমি একবার নানু ভাই-এর কাছে গিয়ে দেখব, ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে চাকরি জোটে কিনা।'

নানুভাই একজন সিনেমা পরিচালক। তিনি এর আগে কয়েকবার ব্রিজমোহনকে বাতিল করে দিয়েছিলেন কেননা পেরিনের মতো তাঁরও ধারণা ছিল যে ব্রিজমোহন কুঁড়ে প্রকৃতির লোক। তাকে দিয়ে কিছু হবে না। তবুও আমি ব্রিজমোহনকে চার আনা দিলাম। ব্রিজমোহন পরদিন সকালে নানুভাইয়ের কাছে গেল আর বিকেলবেলা এই সুখবর নিয়ে ফিরল যে শেঠ নানুভাই তাঁকে চাকরিতে নিয়েছেন। মাস মাইনে আড়াইশো টাকা। এক বছরের চুক্তি। এ কথা বলে সে পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করল, 'এটা আমার অ্যাডভান্স। আমার খুব ইচ্ছে করছে বান্দ্রায় গিয়ে পেরিনকে খবরটা দিই। কিন্তু আবার পাশাপাশি ভয়ও করছে যে খবরটা যদি দিতে যাই চাকরিটা হয়তো কালকেই খোয়াতে হবে। এভাবেই চলে আসছে। একবার মা বারবার। সকালবেলা চাকরি পেয়েছি, দুপুরে পেরিনকে হয়তো জানাতে গেলাম আর বিকেলে চাকরি চলে গেল। ভগবানই একমাত্র জানেন কোন্ তিথি নক্ষত্রে ও জন্মেছিল। আমি ঠিক করেছি ওর সঙ্গে আর দেখা করব না। অন্তত একটা বছর। এই এক বছর রোজগার করব আর নিজের জন্যে দামি জামা কাপড় বানাব। তুমি তো জানো আমার একখানাও ভদ্রস্থ পোশাক নেই।'

ছ'মাস কেটে গেল। ব্রিজমোহন অফিসে যায়, আসে। নিজের জন্যে দামি জামাকাপড়

~ www.amarboi.com ~

কেনে। বিশেষ করে এক ডজন কেম্ব্রিকের রুমাল। সে বেশ স্বচ্ছন্দেই জীবন কাটাচ্ছিল।

এমন সময় একদিন একটা চিঠি এসে পৌঁছল আমার হাতে। ব্রিজমোহনকে লেখা। কিন্তু সন্ধেবেলা ব্রিজমোহন বাড়ি ফিরলে আমি ওটা ওকে দিতে ভুলে গেলাম। পরদিন সকালে খাবার সময় ওর হাতে চিঠিটা দিতে সে চিৎকার করে উঠল, 'ধুত্তোর, আবার সেই...।'

আমি বললাম, 'ব্যাপারটা কী? কার চিঠি?'

চামচের কোণা দিয়ে খামটা খুলতে খুলতে ব্রিজমোহন বলল, 'আবার কার, পেরিনের, ওর হাতের লেখা আমি এক মাইল দূর থেকে চিনতে পারি।'

'কী লিখেছে ও?'

'আবার কী। সামনের রোববার যেতে লিখেছে। অবশ্য করেই। ওর কী একটা জরুরি কথা বলবার আছে, দ্যাখো আবার চাকরিটা না চলে যায়।' ব্রিজমোহন উত্তেজিত হয়ে জবাব দিল।

'কী যা তা বলছ?' আমি বললাম।

'তুমি দেখে নিও, রোববার পেরিনের সঙ্গে দেখা করব, আর সোমবার নানুভাই অকারণে আমার কাজে কোনও খুঁত ধরে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেবে। দেখে নিও।'

আমি বললাম, 'তা অতই যদি জানো তাহলে পেরিনের সঙ্গে দেখা না করতে গেলেই হয়।

'তা হয় না, ও আমাকে দেখা করতে বললে, আমাকে যেতেই হবে।'

'কেন?'

'আসলে আমিও তো খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, টানা ছ'মাস চাকরি হয়ে গেল। একদিন দুদিনের ব্যাপার নয়—' এই বলে ব্রিজমোহন হাসল। তারপর উঠে চলে গেল। পরদিন ভোরবেলায় উঠেই ব্রিজমোহন বান্দ্রা রওনা হয়ে গেল। বিকেলে ফিরে এল কিন্তু নিজে থেকে কিছু বলল না।

আমি যেচে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে মেয়েটার সঙ্গে দেখা হল?'

ব্রিজমোহন বলল, 'হ্যাঁ দেখা হল আর আমি ওকে বললাম, এ চাকরিটাও বোধহয় বেশিদিন থাকবে না।'

'এখন তবে চলো বাইরে যাই, রেস্তোরাঁয় বসে কিছু খাই।'

আমরা হাজির হোটেলে গিয়ে খেতে বসলাম। কিন্তু আমি সচেতন ভাবেই পেরিন সম্বন্ধে আর প্রশ্ন করলাম না। ব্রিজমোহন শুধু বলল, 'দেখা যাক, কাল কী হয়।'

আমি নিশ্চিত ছিলাম কিছুই হবে না, কিন্তু পরদিন ব্রিজমোহন খুব তাড়াতাড়ি কাজ থেকে ফিরে এল। হেসে বলল, 'আবার পেরিনের কারসাজি।'

'আবার কী হল?', আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'নানুভাই-এর স্টুডিও সীল হয়ে গেছে আর সবাইকে বলা হয়েছে বাড়ি ফিরে যেতে। সত্যি আমার জন্যই এসব হল। নয়তো নানুভাই আর কোম্পানির অন্যান্য লোকেদের জীবন আজ কত আনন্দে কাটার কথা।' ব্রিজমোহন হাসতে শুরু করল।

~ www.amarboi.com ~

'সত্যিই ভারি অদ্ভুত ঘটনা।' আমি বললাম। নিজের ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে ব্রিজমোহন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ব্রিজমোহন আবার বেকার হয়ে গেল। সব পয়সা সে খরচও করে ফেলেছিল। আবার পুরনো রুটিনে ফিরে গেল সে। প্রত্যেক রোববার সকালে আমার থেকে আট আনা ধার করে বান্দ্রা রওনা দেওয়া। সেখানে পেরিনের সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েক কাটানো আবার বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরে আসা।

একদিন আমি না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, 'ব্রিজমোহন পেরিন কি তোমায় ভালবাসে?'

ব্রিজমোহন বলল, 'না ও অন্য একজনকে ভালবাসে।'

'তবে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় কেন?'

ব্রিজমোহন হাসল, বলল, 'হয়তো আমি বেশ মজাদার লোক বলে। কিম্বা আমার তোলা ছবিতে তাকে বেশি সুন্দর দেখায় বলে অথবা... অথবা আমি ক্রশ ওয়ার্ডগুলো করে দিই বলে। মন্টো, এইসব মেয়েদের আমি ভালভাবে চিনি। এরা এদের প্রেমিকের মধ্যে যা না পায় তা অন্যের মধ্যে খোঁজে। তারপর দুটোকে সুন্দর করে সেলাই করে নেয়। এরা আসলে ফ্রড।'

'তবে তুমি দেখা করতে যাও কেন?'

'আমার বেশ মজা লাগে।'

'কীসের মজা?'

ব্রিজমোহন বলল, 'ঠকতে মজা লাগে। যতবার ওর কাছে গেছি আমার চাকরি চলে গেছে। আমি দেখতে চাই কতদূর এ ব্যাপারটা গড়ায়। আমার একটা ইচ্ছে আছে, মন্টো, আমি একদিন ওকে ঠকিয়ে দেব।'

'কীভাবে?'

'চাকরি চলে যাবার আগেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে। বস্‌কে বলব যে তিনি আমায় তাড়ানোর আগেই আমি সরে যাচ্ছি। আর তাছাড়া তিনি আমায় বরখাস্ত করছেন না। আমায় বরখাস্ত করছে পেরিন, যার নাক এত লম্বা যে ছবি তুলতে গেলে ক্যামেরায় এসে ঠেকে যায়।' ব্রিজমোহন হাসল, তারপর বলল 'দেখা যাক করে দেখাতে পারি কি না।'

'অদ্ভুত ইচ্ছে তোমার।' আমি বললাম।

'সবকিছুই আমার অদ্ভুত। এই তো গত রোববার আমি পেরিনের একটা ফটো তুলে দিলাম যেটা ওর প্রেমিকের নামে কম্পিটিশনে যাবে এবং পুরস্কার জিতবেই।'

ব্রিজমোহন সত্যিই এক আশ্চর্য মানুষ। কতবার যে তার তোলা ফোটা পেরিনের বন্ধুর নাম দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সে সব ছবি 'ইলাসট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া'তে বেরিয়েছে আর খুশিতে ঝলমল করে উঠেছে পেরিনের চোখমুখ। কিন্তু ব্রিজমোহন কোনও দিন পেরিনের বন্ধুকে নিয়ে ভাবেইনি। শুধু এটুকু জানত যে সে একটা মিল-এ কাজ করে আর সে খুব সুপুরুষ।

আর এক রোববার ব্রিজমোহন বান্দ্রা থেকে ফিরে ঘোষণা করল, 'পেরিনের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সে বলল, 'আমার একটাও ভাল জামাকাপড় নেই জানো। শেঠ নিয়াজ আলি একটা নতুন সিনেমা করছেন। এখানে আমি কাজ পেয়ে যাব। দু এক দিনের মধ্যেই। তুমি বলতে পারো নিয়াজ আলির অফিসটা ঠিক কোথায়?'

আমি এক বন্ধুকে ফোন করে নিয়াজ আলির ঠিকানাটা ওকে যোগাড় করে দিলাম। পরদিন বিকেলে নিয়াজ আলির অফিস থেকে ফিরে এসে ব্রিজমোহন আমার চোখের সামনে একটা টাইপ করা কাগজ মেলে ধরল।

'দেখো মন্টো, নিয়াজ সাহেবের সঙ্গে চুক্তি। নতুন ছবিটার জন্য। মাসে দুশো টাকা। পরে আরও বাড়বে, ঠিক আছে?'

'তা তুমি পেরিনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছো কবে?' এবার আমার হাসবার পালা।

'হ্যাঁ, এ চিন্তাটা আমারও মাথায় এসেছিল,' ব্রিজমোহন বলল, 'তবে তাড়াহুড়ো করাটা ঠিক হবে না। আগে ভাল জামা প্যান্ট বানাই, এই আগাম পঞ্চাশ টাকা পেয়েছি। এর থেকে তুমি পঁচিশ রাখো।'

আমি ওর থেকে পঁচিশ টাকা নিয়ে পাইস হোটেলের ধারটা মেটালাম। এরপর কয়েকমাস বেশ ভাল চলল। আমি রোজগার করি একশো টাকা, ব্রিজমোহন দুশো। জীবন বেশ আনন্দে কাটছিল, কিন্তু হঠাৎ মাস পাঁচেক বাদে আবার সেই চিঠি, পেরিনের, ব্রিজমোহনের ভাষায় 'মৃত্যু পরোয়ানা'। সত্যি বলতে কী চিঠিটা দেখে আমি শিকড় অবধি শিউরে উঠলাম।

কিন্তু ব্রিজমোহন বেশ হাসিমুখেই চিঠিটা খুলল। ছোট্ট চিঠি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এবার মেয়েটার বক্তব্য কী?'

'সামনের রোববার দেখা করতে যেতে হবে। খুব দরকারি কাজ।' চিঠিটা খামে পুরতে পুরতে ব্রিজমোহন উত্তর দিল।

'তুমি যাবে?'

'যেতেই হবে।'

আমি বললাম, 'ভগবানের দোহাই, ব্রিজ যেও না। আমাদের বেশ ভাল দিন কাটছে। তুমি জানো না তোমার ওই বান্দ্রা যাওয়ার জন্যে আট আনা যোগাড় করতেও একসময় আমার কত কষ্ট হয়েছে।' ব্রিজমোহন হেসে বলল, 'মনে হচ্ছে সেই দিনগুলো আবার ফিরে আসবে।'

পরদিন ভোরবেলা ব্রিজমোহন বান্দ্রা রওনা হয়ে গেল। ফিরে এসে বলল, 'পেরিনকে বলে এলাম এবার নিয়ে বারো বার হবে যে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমার চাকরি চলে যাবে।'

'ও কিছু বলল?'

'ও বলল, "তুমি একটা আস্ত গাধা।" '

'ঠিকই বলেছে পেরিন।' আমি বললাম।

'একশো ভাগ ঠিক।' ব্রিজমোহন বলল, 'কাল গিয়ে আমি রেজিগনেশনের চিঠিটা জমা দেব। পেরিনের সামনে বসেই লিখেছি।' তারপর চিঠিটা আমায় দেখাল।

~ www.amarboi.com ~

পরদিন খুব ভোরেই ব্রিজমোহন বেরিয়ে গেল। বিকেলে যখন ফিরে এল ওর চোখমুখ যেন দুঃখে ভেঙে আসছে।

'কী হল ব্রিজমোহন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কিছু না, পুরো ব্যাপারটাই মিটে গেল।'

'মানে?'

'মানে আমি যখন নিয়াজ আলিকে রেজিগনেশন লেটারটা দিলাম উনি হেসে একটা টাইপ করা চিঠি আমার হাতে দিলেন যাতে লেখা আছে আমার মাইনে দুশো থেকে বেড়ে তিনশো হয়েছে।'

সেইদিন থেকে ব্রিজমোহনের পেরিন সম্বন্ধে আর কোনও কৌতূহলই রইল না। একদিন সে আমাকে বলেছিল, 'পেরিনের অভিশাপ মুছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেরিনও মুছে গেছে আমার মন থেকে। আর সেই সঙ্গে আমার জীবনের একটা রোমাঞ্চকর অধ্যায়ও শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যেটা চিন্তার ব্যাপার হল মন্টো, পেরিন তো আর নেই, তবে কে আমার চাকরি খাবে এখন থেকে?'

ভাষান্তর : সুদীপ বসু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আল্লার দোহাই

ওপার থেকে মুসলমান, এপার থেকে হিন্দুরা অনবরত আসা যাওয়া করছে। উদ্বাস্তু ক্যাম্পে থিক্ থিক্ করছে মানুষ আর মানুষ। বলতে গেলে তিল ধরবার জায়গা সেখানে নেই। আরও, আরও শরণার্থী ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ক্যাম্পগুলোর ভিতর। মানুষ অনুপাতে খাবার কম। পরিচ্ছন্নতার বালাই নেই। একটার পর একটা অসুখ ছড়িয়ে পরছে ক্যাম্পের ভিতর। নেই কোনও স্বাস্থ্য পরিষেবা। এসবের জন্য মাথাব্যথা কার আছে? এখানে শুধু অরাজকতা আর আতঙ্ক।

১৯৪৮ সালের প্রথম দিকের কথা। সম্ভবত মার্চ মাস। সেচ্ছাসেবীদের সাহায্যে, ওই দেশ এবং এই দেশ, দু-দেশ থেকেই হারিয়ে যাওয়া মহিলা ও শিশুদের উদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে। হাজার হাজার নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বেচ্ছায় এতবড় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল। এই কঠিন কাজের প্রতি তাদের অদম্য উৎসাহ দেখে আমি তাজ্জব হয়ে যাই। গভীর শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় আমার প্রাণ ভরে ওঠে। ভাবি, মানুষই পারে মানুষের কুকর্ম মুছে দিতে। আবার নতুন দিশা দেখাতে।

ইতিমধ্যে যেসব হতভাগ্যের দল সর্বস্ব খুইয়ে নিঃস্ব হয়েছে তাদের সেই ক্ষতে মলম দেবার চেষ্টা চলছে, আর তারা আবারও লুঠ যাতে না হয় সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কেন? হয়তো বেঁচে থাকার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাকে নতুন করে ভাল থাকতে সাহায্য করবে, এমনও হতে পারে, আঙুলের ডগায় লেগে থাকা রক্তবিন্দু চুষে নিয়ে পুনরায় বন্ধু, আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে এক টেবিলে বসে ভাল থাকার জন্য শুভ আলোচনায় মগ্ন হয়ে যাবে। হয়তো আবারও মানবিকতার সুঁচ-সুতো হাতে তুলে ছেঁড়াফাটা জীবনকে রিফু করে পথ চলা শুরু করবে। স্পষ্ট করে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তবু স্বেচ্ছাসেবীদের প্রচেষ্টা দেখে আমার ভিতরে আশা জাগে। তাদের এই মহৎ কাজের জন্য সম্মান করতে ইচ্ছে হয়।

স্বেচ্ছাসেবীরা প্রত্যেকটা দিন পাহাড়প্রমাণ সমস্যার মুখোমুখি হত। হাজারো বাধা আসত তাদের পথে। বিশেষ করে তুলে নিয়ে যাওয়া মেয়েদের, যারা সীমান্ত পারাপার করে দিয়েছে, সেই সব দস্যুর দল, মহিলা, নাবালিকাদের নিয়ে আজ এখানে, কাল ওখানে, কখনও এ-বাড়িতে, কখনও সে-বাড়িতে বার বার জায়গা বদল করে লুকিয়ে রেখেছে,

~ www.amarboi.com ~

তাদের খোঁজ পাওয়া সহজসাধ্য ছিল না। তার ওপর আশপাশের মানুষ, প্রতিবেশীরা কোনও তথ্য দিয়েও সাহায্য করতে চাইত না।

অদ্ভুত সব কাহিনি শোনা যেত স্বেচ্ছাসেবীদের মুখ থেকে। একজন পদস্থ কর্তার কাছ থেকে শুনেছিলাম, শাহারানপুরের দুই নাবালিকা, পাকিস্তানে তাদের মা বাবার কাছে ফেরত যেতে অস্বীকার করে। অন্য আর এক কর্তা আমায় জানায়, এক কিশোরীকে জলন্ধর থেকে অনেক পরিশ্রম করে উদ্ধার করেছিল তারা। ফিরিয়ে আনবার সময় মেয়েটার কব্জাকারি আর তার গোটা পরিবার চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল, ঘরের বউটি যেন শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে অনেক দূর দেশে পাড়ি দিচ্ছে বহুদিনের জন্য। অনেক মেয়েরা ভয়ে লুকিয়ে বাবা-মার সঙ্গে দেখা করে। কেউ আবার পথেই আত্মঘাতী হয়েছিল। অনেকে আঘাত সহ্য করতে না পেরে দুর্বল হয়ে পড়ে, ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে কেউ পাগল হয়ে যায়। নেশার ভিতরে ডুবে থাকতে চাইত বহু মহিলা। তারা তৃষ্ণা পেলে জলের বদলে মদ চাইত। তারপর কদর্য ভাষায় খিস্তি দিত।

এই গৃহহীন, পরিবারছিন্ন অভাগিনীদের কথা যখন মনে পড়ে, চোখের সামনে তাদের ফোলা, ভরাট পেটের ছবি ভেসে ওঠে। এই গর্ভবতীদের কী হবে? গর্ভের ভিতর যে রয়েছে তার পরিণতি কী? নয় মাস গর্ভে থাকার পর যে প্রসব হতে চলেছে তার দায়িত্ব পালন করা হবে কোন পদ্ধতিতে? অর্ধেকটা পাকিস্তান, বাকিটা কি হিন্দুস্তান নেবে? হয়তো তাকে অনায়াসেই ঠেলে দেওয়া হবে প্রকৃতির নিষ্ঠুর হিংস্রতার গহ্বরে। অন্ধকারে তলিয়ে যাবে সে। হিসাবের খাতায় একটিও কি সাদা পাতা রাখা হবে, অত্যাচারের নিষ্ঠুর ধূর্ত ইতিহাস যেখানে লেখা হবে?

হারিয়ে যাওয়া মেয়েরা, শিশুরা ফিরে আসছে। ওদেশের মেয়েদের উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আমি অবাক হই, কেন এই মেয়েদের 'পলাতকা' বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে? তাদের তো কেউ পালিয়ে যেতে বলেনি। পলাতকা শব্দের ভিতর একটা রোমান্টিক অর্থ লুকিয়ে আছে। নারী-পুরুষ দুজনেই সেক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করে থাকে। দুজনার একে অপরের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্খা এতটাই তীব্র, পালাবার আগে থেকেই রক্তের ভিতর সরগমের ঝঙ্কার বাজতে থাকে। এই হতভাগীদের তবে কেন এ নামে ডাকা হয়? সাধারণত অপহৃত অভাগীদের ধরে বন্দি করে রাখা হয়েছিল কালো কুঠুরির ভিতর।

ওই সময়ে যুক্তিতর্ক, দর্শনের কোনও মূল্যই ছিল না। গ্রীষ্মেও মানুষ ঘুমিয়ে থাকত দরজা জানালা বন্ধ করে। আমি নিজেও চেতনার ফাঁক-ফোঁকরগুলো আটকে দিয়েছিলাম। কখনও বা সেই ফাঁক খোলার তাগিদ অনুভব করতাম। কিন্তু কী করতে পারতাম আমি? সমাধান কী হতে পারে তা ভাবতে বসে দেখি, সমস্ত পথই রুদ্ধ।

পুনরুদ্ধার করা মেয়েরা ঘরে ফিরছে। ওদেশের মেয়েদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

মেয়েদের দেওয়া-নেওয়া হচ্ছিল ব্যবসায়িক লেনদেনের মত। সুযোগ পেয়ে, কলমধারীর দল—যেমন সাংবাদিক, কবি সাহিত্যিকরা তাদের হাজারও প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিচ্ছিল দক্ষ শিকারির মত। বস্তা বস্তা গল্প, কবিতা পত্রপত্রিকায় খবর ছেপে বাজারে ভর্তি হয়ে গেল। এর রেশ অনেকদিন চলার পর অক্ষরকর্মীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তাদের কলম

~ www.amarboi.com ~

হোচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। কেউ আবার দিশাহারা হয়ে কলমকে ভুল পথে চালনা করল। অসংখ্য শিকার দেখে আঁতকে উঠল। কী করবে, কী লিখবে, বড় সমস্যায় পড়ে গেল তারা।

একজন যোগাযোগকারী কর্তার সাথে পরিচয় হল। কর্তাটি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি এত হতাশ আর বিষণ্ণ থাকেন কেন?' আমি তাকে কোনও উত্তর দিতে পারি না।

তিনি আমায় একটা কাহিনি শোনালেন : 'পালিয়ে যাওয়া মেয়েদের খোঁজে আমাকে হন্যে হয়ে এদিক ওদিক ছুটে বেড়াতে হয়। এক শহর থেকে আর এক শহর, এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রাম, তিন-চারটে গ্রামের পর গ্রাম; অলিতে-গলিতে, বাড়ি-বাড়ি, ঘরের পর ঘর ঢুঁ মারতে হত। অনেক বাধা পেরিয়ে তবে তো মণিমাণিক্য হাতে আসে।'

আমি আপন মনে বলি, 'হিরেগুলো কাটা না ভোঁতা?'

'আপনার কোনও ধারণা নেই, হাজারও ঝামেলা পোহাতে হয় এ-কাজে। আমাদের কত কী যে সহ্য করতে হয়। ছাড়ুন, আর একটা গল্প বলি, শুনুন; সীমান্তের ওপারে আমি বহুবার চক্কর দিয়েছি। আশ্চর্য হয়েছিলাম প্রতিটিবার এক মুসলমান বুড়িকে দেখে। মাঝবয়সী, মুসলমান বুড়ি।

'প্রথমবার জলন্ধরের এক বস্তিতে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিলাম ওই বুড়িকে। শত জীর্ণ ছেঁড়া ফাটা কাপড় পরনে। উসকো-খুসকো, পাগল-পাগল দেখতে। ময়লা রুক্ষ চুল শনের মতো হয়ে আছে। হতাশাগ্রস্থ উন্মাদের মতো ফ্যালফ্যালে চাউনিতে অনবরত কিছু খুঁজে চলেছে। নিজেকে সামলে রাখার কোনও ক্ষমতাই তার ছিল না।

'তবে হ্যাঁ, এটা পরিষ্কার বোঝা যেত, হারানো কাউকে ফিরে পেতে চায় সে।

'এক স্বেচ্ছাসেবী বোনের থেকে জানতে পারি, অসহায় দুঃখী বুড়িটির কথা। উন্মাদ হয়ে গেছে। পাতিয়ালায় তার বাড়ি। তার একমাত্র মেয়েকে হন্যে হয়ে খুঁজে চলেছে। শত চেষ্টা করেও সেই মেয়ের হদিশ পাওয়া যায়নি। হয়তো দেশভাগের দাঙ্গায় তার মৃত্যু হয়েছে। বুড়ি সে কথা মানতে চায় না।

'দ্বিতীয়বার শাহারানপুরে আবার তাকে দেখি। লরিচালকরা যেখানে লরিগুলো দাঁড় করায়, উন্মাদিনী সেখানে মেয়ের খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে। আগের বারের চেয়ে আরও মলিন, শীর্ণ, ক্ষীণ। ঠোঁটের চামড়া খসখসে, ফেটে ছাল উঠছে। চুল ধুলোময়। জট ধরে গেছে সাধুদের মতো। আমি বুড়ির সাথে কথা বলার চেষ্টা করি। নিষ্ঠুর বাস্তবটা তাকে জানাতে চাইছিলাম। ভুল ধারণা থেকে সরিয়ে আনলে যদি খোঁজা বন্ধ করে। নকল গাম্ভীর্যের মুখোশ এঁটে তাকে বলি, মাঈ তোমার মেয়ে খুন হয়েছে।

'পাগলি আমায় এক ঝলক দেখে বলে, 'খুন? না, না।' শব্দ দুটো বলার সময় তার গলায় আত্মপ্রত্যয় ছিল। 'আমার মেয়েকে কেউ খুন করতে পারে না। ওকে খুন করতে কেউ পারবে না।'

'বুড়ি চলে যায়, আলেয়ার খোঁজে।

'আশ্চর্য হয়ে যাই, বুড়ির নিরন্তর এই [illegible] দেখে। [illegible], অন্ধের মতো হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

'মেয়েটিকে কেন কেউ খুন করতে পারবে না? ধারালো ছুরির ফলা কেন তার মাংসল

~ www.amarboi.com ~

পিঠে গেঁথে দেবে না? গলার নলিতে চাকু বসাতে পারবেনা কেন কেউ? মেয়েটি কি তাহলে অমর? হয়তো অন্ধ মাতৃস্নেহই অমরত্ব পেয়েছে। বৃদ্ধা নিজের মমতাকে বুকের কাছটিতে পেতে চাইছে, যা দাঙ্গায় হারিয়ে গেছে।

'তিনবারের বার যখন তাকে আবার দেখতে পাই—পাগলিনির পরনের কাপড়খানি ফালা ফালা হয়ে গেছে। একরকম উলঙ্গই বলা যায়। কাপড় দিতে চাইলে, তা আমায় ফিরিয়ে দেয়।

'আবারও বুড়িকে বোঝাই, মাঈ, সত্যি বলছি, তোমার মেয়ে পাতিয়ালাতেই খুন হয়েছে।

'বুড়ি আগের মতই জোরের সাথে বলে, 'তুমি মিথ্যে বলছো।' আমার কথাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য বলি : 'না মাঈ, সত্যি বলছি, অনেক তো খুঁজলে তুমি... অনেক কেঁদেছো...এবার চলো আমার সাথে, তোমায় পাকিস্তানে নিয়ে যাই।'

'কোনও কথাই তার কানে যায়নি। নিজের মনে বিড় বিড় করতে থাকে। বিড় বিড় করতে করতে হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর বদলে যায়। ইস্পাতের মতো ঠাণ্ডা কঠিন স্বরে বলে ওঠে, 'না, কেউ আমার মেয়েকে মারতে পারবে না।'

'জানতে চাইলাম, 'কেন? কেন মারতে পারবে না?'

'বুড়ি গলা নরম করে বলে, 'আমার মেয়ে যে খুব সুন্দর, ওর এত রূপ, ওকে কেউ খুন করবে না। এমন কি একটা চড় মারার জন্যও ওর গায়ে কারুর হাত উঠবে না।'

'অবাক হই। সত্যি? এতটাই রূপবতী বুড়ির মেয়ে? সব মায়ের চোখেই তো নিজের সন্তান হিরের টুকরো, জ্যোৎস্নার আলো, তারার দ্যুতি। হয়তো সত্যি সত্যিই মেয়েটা খুব সুন্দরী ছিল।

'তবে এখন যে সময়টা বয়ে চলেছে, দাঙ্গার ঝোড়ো, নিষ্ঠুর দানবের হাত থেকে কোনও কুসুমকোমল সৌন্দর্য নিষ্কৃতি পেতে পারে?

'ক্ষ্যাপা বুড়ি, ক্ষীণ আশার আলো বুকে করে নিজেকে জিইয়ে রেখেছে। হাজারও মানুষ সব ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছে শুধু প্রাণের মায়ায়। বেঁচে থাকার ইচ্ছে থাকলে, ফন্দিফিকির করে অনেক ধরনের পথও খুঁজে পাওয়া যায় পালাবার জন্য। যদিও কোনও কোনও সড়কে এমন সব দুঃখের মোড় থাকে, যে পথেই চলো না কেন মাকড়সার জালের মতো বিষাদ ছড়িয়ে আছে, চৌমাথায় বা পাঁচমাথার মোড়ে, সেখানে আটকে যাবে জীবন।

'সীমান্ত পেরিয়ে, যতবার ওদেশে গিয়েছি প্রতিটি বারই ওই উন্মাদ বৃদ্ধাকে দেখতাম। রোগা হতে হতে হাড়-চামড়া সার হয়েছে। শুধু খাঁচাখানা বহন করছে। দুর্বল, ধুঁকছে। তবে খোঁজতল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে ইচ্ছাশক্তি নিয়ে। মেয়েকে ফিরে পাবার বিশ্বাস পাকাপাকি ভাবে মাথায় গেঁথে গেছে। মেয়ে তার বেঁচে আছ, কেউ খুন করেনি, করতে পারে না।

'স্বেচ্ছাসেবী বোনটি আমায় জানায়, বুড়িকে সামলে রাখা খুব বিপদজ্জনক হচ্ছে দিনে দিনে। একশোভাগ পাগল এখন। ভাল হয়, যদি তাকে নিয়ে গিয়ে পাকিস্তানের পাগলাগারদে ভর্তি করে দেওয়া যায়।

'এতে আমার মন সায় দিচ্ছিল না। বৃদ্ধার ঐ তীব্র অন্বেষণ, আমার মনে হচ্ছিল, তার বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বল, তা কেড়ে নেওয়াটা ঠিক হবে না।—এই বিশাল উন্মাদাগারে

~ www.amarboi.com ~

তবুও সে স্বাধীনভাবে ঘোরফেরা করছে, মাইলের পর মাইল এখানে-ওখানে হেঁটে, পায়ে ফোস্কা পড়ছে, ছাল উঠে রক্তাক্ত হচ্ছে, তবুও তো খোঁজার তৃষ্ণা মেটাতে পারছে। পাকিস্তানে তুলে নিয়ে একটা পাগলাগারদের চার দেওয়ালে বন্দি করতে আমার মন চায়নি।

'শেষবার অমৃতসরে তাকে দেখতে পাই। বুড়ির শোচনীয় অবস্থা দেখা মাত্র চোখ জলে ভরে যায়। এবার ঠিক করে ফেলি, বুড়িকে আমার সঙ্গে পাকিস্তানে নিয়ে যাব, মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে দেব।

'ফরিদাচকে দাঁড়িয়ে, ক্ষীণ দৃষ্টিতে সে বাজারের এদিক ওদিক দেখছিল। আমি আর স্বেচ্ছাসেবী বোনটি, দুজনে একটি দোকানে বসে কথা বলছিলাম পলাতকা এক মুসলমান মেয়ে নিয়ে। তার খবর পাওয়া গেছে, শাবুনিয়া বাজারের কাছে এক হিন্দু ব্যাবসায়ীর সঙ্গে সহবাস করে মেয়েটি। আলোচনা শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। ইচ্ছে ছিল, সত্য-মিথ্যা বানিয়ে, যেমন করেই হোক বুড়ি মাকে বুঝিয়ে রাজি করাবো, আমার সাথে পাকিস্তানে নিয়ে যাব এবার। তখনই রাস্তা দিয়ে এক দম্পতি যাচ্ছিল। ছোটো ওড়না দিয়ে ঢাকা ছিল মেয়েটির মুখ। মেয়েটির স্বামী লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান শিখ যুবক। উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ নাক-চোখ-মুখ। পৌরুষের আলো তার সুগঠিত শরীরকে আরও সুন্দর করেছে।

'বুড়ির সামনে দিয়ে দুজন এগিয়ে যাবার সময়, ছেলেটি হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে যায়, দু-পা পিছিয়ে এসে, মেয়েটির হাত ধরে টেনে আনে। সাদা ওড়না অনেকটা উঠে গিয়ে, ছবির ফ্রেমের মত চতুষ্কোণ আকার ধারণ করে। তার ভিতর থেকে গোলাপি আলোর বিচ্ছুরিত আভা আমায় হতবাক করে দেয়। কত যে অপরূপ সে মুখখানি, তার অতুলনীয় সৌন্দর্যের কথা ভাষায় বোঝাতে পারব না।

ওদের ঠিক পেছনেই আমি দাঁড়িয়েছিলাম। শিখ ছেলেটি বুড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে, সুন্দরীকে ফিস্‌ফিস্ করে বলে, 'তোমার মা।'

মেয়েটি চকিতে পাগলিনির দিকে পলকের জন্য তাকায়, খসে যাওয়া ওড়নাখানি তুলে মুখ ঢাকতে ভুলে যায় সে। তাড়াতাড়ি যুবকের বাহু খামচে ধরে, দাঁত চেপে বলে, 'চলো।'

দ্রুত এগিয়ে চলে তারা। আচমকা বুড়ির চিৎকার শোনা যায়, 'ভাগভরী! ভাগভরী।'

উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। তার সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'কী হয়েছে মাঈ?'

কাঁপতে কাঁপতে আমায় বলে, 'ওকে দেখলাম, আমি ওকে দেখলাম।'

প্রশ্ন করি, 'কাকে?'

ভাঁজ পড়া কপালের নীচে, গর্ত দুখানিতে চকচক করে উঠল ঘষা মার্বেলের গুলি দুটি, 'আমার মেয়েকে দেখলাম, ভাগভরী! ভাগভরীকে।'

'আবার তাকে বুঝিয়ে বললাম, ওতো কবেই মারা গেছে। আকাশ-কাঁপানো চিৎকার করে বলে উঠল, 'তুমি মিথ্যে বলছো।'

'সব জেনে, দেখে, বুঝেও তাকে আমার কথা বিশ্বাস করাবার জন্য বলি, 'আল্লার শপথ করে বলছি—তোমার মেয়ে মৃত।'

'কথাটা শোনামাত্র চকের মাঝখানে পড়ে বুড়ি মরে গেল।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ভাষান্তর : সীমা বল

~ www.amarboi.com ~

লাল রেইনকোট পরা সেই মহিলা

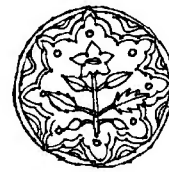

ঘটনাটা সেই সময়কার যখন হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষে পূর্ব এবং পশ্চিম পঞ্জাব রক্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছিল। বেশ কিছুদিন ধরে টানা বৃষ্টি হচ্ছিল এবং যে-হানাহানির আগুন মানুষ নেভাতে পারেনি তা প্রকৃতিই কিছুটা নিজে থেকে যেন দমিয়ে এনেছিল। যদিও নিরীহ মানুষকে বিনা কারণে খুন করা, কিংবা প্রকাশ্য রাস্তায় মেয়েদের ইজ্জত লুঠ করা, অসহায় ভয়ার্ত মেয়েদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কোনও খামতি ছিল না।

লুঠতরাজ, খুনোখুনি ছিল যেন সেই সময়ের নিয়ম। যার গল্প বলতে যাচ্ছি, আমার বন্ধু 'স' ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে নিয়েছিল।

যাই হোক ওর গল্পটা শুরু করবার আগে 'স' সম্বন্ধে কয়েকটা জরুরি কথা বলে নিই। ওকে দেখতে খুব সাধারণ, আটপৌরে এবং আর পাঁচটা সাধারণ লোকের মতোই 'কিছু-না'-এর মধ্যে থেকে 'কিছু'-কে আবিষ্কার করার দিকে খুব ঝোঁক ছিল। স্বভাবের দিক থেকে ও মোটেই নির্মম ছিল না। কিন্তু একটা আশ্চর্য ট্রাজেডির নায়ক এবং সাক্ষী হয়েছিল এমন এক ঘটনার যা ঘটবার সময়ও বিন্দুমাত্র আঁচ পাওয়া যায়নি।

আমাদের স্কুলে 'স' ছিল একজন মাঝারি ছাত্র, খেলাধুলো ছিল ওর প্রাণ, আর কথায় কথায়, তর্কাতর্কি ভাল করে জমতে না জমতে, ও হুটপাট হাত চালিয়ে দিত।

ছবি আঁকার নেশা ছিল ওর। কিন্তু কলেজে একবছর মাত্র পড়ার পরই ওকে পড়াশুনোয় ইতি টানতে হয়। অনেকদিন পরে শুনেছিলাম ও একটা সাইকেলের দোকান খুলেছে শহরে।

যখন দাঙ্গা শুরু হল, ওর দোকানটাই প্রথম গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই মুহূর্তে হাতে আর কোনও কাজ না থাকায় ও লুঠেরাদের দলে ভিড়ে গিয়েছিল, যতটা না জাতিহিংসা থেকে তার থেকেও বেশি মজা আর বৈচিত্রের সন্ধানে। সেই সময়টা ছিল সত্যিই ভারি অদ্ভুত। অন্ধকার রক্তাক্ত একটা যুগ, খুব অন্যরকম। এবার ওর গল্পটা ওর মুখেই শোনা যাক।

'সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আকাশ-বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে আজ।

~ www.amarboi.com ~

সারা জীবনে আমি একসঙ্গে এত বৃষ্টি দেখিনি। আমি বাড়ির ব্যালকনিতে বসে বসে সিগারেট টানছিলাম। আমার পায়ের কাছে ডাঁই হয়ে পড়ে ছিল একগাদা মালপত্র, যা আমি আমার দলের সঙ্গে বিভিন্ন দোকান ও বাড়ি থেকে লুঠ করে এনেছিলাম। তবে এগুলোতে আমার তেমন মন ছিল না। ওরা আমার দোকান পুড়িয়ে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দিব্যি কেটে বলছি, এত ছিনতাই রাহাজানি আর খুনখারাবি আমি দেখেছিলাম জীবনে যে ওসব আমাকে তেমন আর একটা ভাবাত না। বৃষ্টির তুমুল আওয়াজের ভেতরেও কেমন একটা শুকনো অর্থহীন স্তব্ধতা আমার মনকে ছেয়ে রেখেছিল। হাওয়ায় একটা অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছিলাম আমি। ঠোঁটের সিগারেটটাও বিস্বাদ ঠেকছিল। কেমন একটা ঝিমুনির মধ্যে যেন চলে যাচ্ছিলাম আমি। হঠাৎ একটা শিহরণ খেলে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে আর মনে হল, একটা মেয়েমানুষ এই মুহূর্তে আমার চাই-ই চাই। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছিল। আমি উঠে পড়লাম। রেইনকোটটা চাপালাম গায়ে, একটিন নতুন সিগারেটের প্যাকেট নিলাম লুঠ করা মালের ভেতর থেকে; তারপর বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়।

'রাস্তা শুনশান আর অন্ধকার। এমনকি সেনাবাহিনীর লোকজনরাও নেই। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। রাস্তায় এখানে ওখানে মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কিন্তু তাতে আমার কোনও হেলদোল ছিল না। কিছুক্ষণ বাদে আমি সিভিল লাইন অঞ্চলে এসে পড়লাম। রাস্তাঘাট প্রাণশূন্য। নিস্তব্ধ। একটা গাড়ির আওয়াজ আমার চটক ভেঙে দিল। দেখলাম একটা অস্টিন গাড়ি দুরন্ত গতিতে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ মাথায় ভূত চেপে গেল আমার। আমি এক দৌড়ে মাঝ রাস্তায় চলে এলাম আর রুমাল নাড়িয়ে নাড়িয়ে ড্রাইভারকে ইশারা করতে লাগলাম থামবার জন্যে, কিন্তু গাড়িটা থামল তো নাই, উল্টে আমার খুব কাছাকাছি এসে হঠাৎ বাধা পেয়ে প্রবল গতিতে বাঁদিকে বেঁকে গেল। আমি গাড়িটার পেছনে দৌড়তে গিয়ে পড়ে গেলাম। কিন্তু তক্ষুনি আবার উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম চোট তেমন একটা লাগেনি। গাড়িটা হঠাৎ ভয়ঙ্কর ব্রেক কষল, সামনের দুটো চাকা পিছলে গেল রাস্তা থেকে। তারপর একটা গাছের গায়ে ধাক্কা খেয়ে গাড়িটা শেষ পর্যন্ত থেমে গেল। আমি গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলাম। গাড়ির দরজা খুলে একজন মহিলা, গায়ে লাল রেইনকোট, প্রায় লাফ দিয়ে নামল রাস্তায়। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু রেইনকোটটা যে উজ্জ্বল লাল তা বোঝা যাচ্ছিল। আগুনের জিভ যেন ছুঁয়ে গেল আমার শরীর।

'মহিলাটি আমাকে হন হন করে এগোতে দেখে হঠাৎ দৌড় লাগাল। আমিও দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম তাকে। "বাঁচাও বাঁচাও", সে চিৎকার করতে লাগল।

' "তুমি কি ইংরেজ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

' "না না" সে বলল।

'ইংরেজদের আমি ঘেন্না করতাম। তাই বললাম, "ও তাহলে ঠিক আছে।"

'এবার সে উর্দুতে চিৎকার করতে লাগল, "তুমি আমাকে খুন করবে, আমি জানি আমাকে মেরে ফেলবে তুমি।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'আমি টুঁ শব্দ করলাম না। শুধু অন্ধকারে ঠাহর করবার চেষ্টা করছিলাম মেয়েটির বয়স কত হতে পারে, আর তাকে দেখতেই বা কেমন। তার মুখ রেইনকোটে ঢাকা ছিল, আমি তা তুলে দেখতে গেলে সে প্রবলভাবে বাধা দিল। আমি আর জোরাজুরি করলাম না। বরং আমি তার হাত ধরে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। তাকে গাড়ির ভেতর একরকম ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে ড্রাইভারের আসনে বসলাম। তারপর গাড়ি স্টার্ট দিলাম। পিছল রাস্তায় খুব সাবধানে চালিয়ে গাড়িটা নিজের বাড়ির সামনে এসে দাঁড় করালাম।

'ইঞ্জিন বন্ধ করে প্রথমে ভাবলাম মহিলাটিকে ব্যালকনিতে তুলে নিয়ে যাই। তারপর ভাবলাম হয়তো সিঁড়ি ভেঙে উঠতে রাজি হবে না। তাই বাড়ির কাজের ছেলেটিকে চিৎকার করে বললাম, "নিচের ড্রইংরুমটা খুলে দে।" তারপর ড্রইংরুমে মহিলাকে প্রায় ঠেলে ঢুকিয়ে সোফায় এলিয়ে দিলাম।

' "আমাকে মেরো না। আমাকে মেরো না, প্লিজ",—সে চিৎকার করতে লাগল।

'আমি ইচ্ছে করে একটু নাটকীয় ভঙ্গীতে বললাম "না আমি তোমাকে মারব না, প্রিয়তমা।"

'মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়ল। আমি কাজের ছেলেটিকে বললাম বাড়ির বাইরে যেতে। একটা দেশলাই বাক্স বের করলাম। কিন্তু বৃষ্টিতে কাঠিগুলো ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে গিয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ ধরে বাড়িতে বিদ্যুৎ ছিল না। ওপরের ঘরে একটা টর্চ ছিল, কিন্তু ওটা আনার প্রায়োজন বোধ করলাম না আমি। আমি তো আর ফটো তুলব না যে আলোর দরকার, মনে মনে ভাবলাম। নিজের রেইনকোটটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম মাটিতে। তারপর মহিলাকে বললাম, "তোমারটা খুলে দিই।"

'সোফার কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম মেয়েটি সোফায় নেই। কোথায় আর যাবে ভাবলাম আমি, তারপর অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে গিয়ে প্রায় মুখোমুখি ধাক্কা খেয়ে গেলাম দুজন। ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম মেঝেতে। সম্পূর্ণ কাকতালীয়ভাবে আমার আঙুল এসে পড়ল তার গলায়। মেয়েটি চিৎকার করে উঠল, "থামো, থামো, কী করছ?"

' "আরে আরে ভয় পোয়ো না, মারব না তোমায়।" আমি বললাম।

'মেয়েটি কেঁদেই চলল। আমি ওর পিছল প্লাস্টিকের লাল রেইনকোটটার বোতামগুলো খুলতে লাগলাম। খোলা হলে দেখলাম যে মেয়েটি শাড়ি পরে আছে। আমি ওর উরুতে হাত ছোঁয়ালাম। একটা বিদ্যুতের শিখা দৌড়ে গেল আমার শিরা বেয়ে। কিন্তু আমি মনে মনে বললাম, ধীরে, বন্ধু, ধীরে।

'আমি তাকে শান্ত করতে লাগলাম। বললাম, "আমি তোমাকে খুন করতে এখানে আনিনি। বরং বাইরের থেকে এখানে তুমি অনেক বেশি নিরাপদ। যদি তুমি বেরিয়ে যেতে চাও যেতেই পারো। কিন্তু আমার মনে হয় কি জানো যতদিন এইসব দাঙ্গা না থামে, আমার এখানেই থাকো। তুমি শিক্ষিত ভদ্র মেয়ে, বাইরে লোকজন এখন পশু হয়ে গেছে। আমি চাই না যে তুমি এই জানোয়ারদের হাতে পড়ো।"

'মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, "তুমি আমাকে মারবে না তো?"

'না, স্যর।' আমি বললাম।

~ www.amarboi.com ~

'স্যর শব্দটা শুনে মেয়েটি হো হো করে হেসে উঠল।

'আমি বললাম 'আসলে আমি ইংরেজিতে খুব কাঁচা।'

'সে অনেকক্ষণ কোনও কথা বলল না। তারপর খুব করুণ গলায় প্রশ্ন করল, "মারবেই না যদি, তবে এখানে আনলে কেন?"

'একটা অদ্ভুত প্রশ্ন। আমি এর কোনও উত্তর খুঁজে পেলাম না। হঠাৎ কে যেন আমার ভেতর থেকেই বলে উঠল, "আমি তোমায় খুন করব না এই কারণেই যে আমি অযথা মানুষ মারতে ভালবাসি না। কিন্তু তোমাকে আমি এখানে এনেছি কেন? তাই জিজ্ঞেস করলে, না? হয়তো... হয়তো এই কারণে যে আমি খুব একা...।"

' "কিন্তু তোমার তো সর্বক্ষণের কাজের ছেলে রয়েছে।"

' "ও তো কাজের-ই লোক মাত্র।"

'মেয়েটি চুপ করে গেল। আমার কেমন একটু অপরাধবোধ জাগল মনে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, "যাকগে ওসব কথা থাক। তুমি যদি চলে যেতে চাও আমি তোমায় আটকাব না।"

'আমি তার হাত ধরলাম। আমার মনে পড়ল তার উরুর কথা। হঠাৎ ভয়ঙ্করভাবে আমি তাকে বুকে চেপে ধরলাম। আমার চিবুকের ঠিক নীচে তার নিশ্বাসের গরম আমি টের পেলাম। আমি তার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরলাম। সে কাঁপতে শুরু করল। আমি ফিসফিস করে বললাম, "ভয় নেই, সোনা, আমি তোমায় মারব না।"

'মেয়েটি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "যেতে দাও আমায়, প্লিজ।"

আমি খুব নম্রভাবে ওর শরীর থেকে হাত সরিয়ে নিলাম। তারপর হঠাৎ কী প্রবৃত্তির খেয়ালে তাকে এক ঝটকায় তুলে নিলাম মেঝে থেকে আর শুইয়ে দিলাম সোফায়, দেখলাম যে মেয়েটির সঙ্গে একটা ছোট হাতব্যাগ রয়েছে। আমি হাতব্যাগটা সরিয়ে রেখে দিলাম। মেয়েটিকে আশ্বস্ত করে বললাম, "যদি এর মধ্যে মূল্যবানও কিছু থেকে থাকে তবু চিন্তার কিছু নেই। আমি বরং উল্টে তোমায় অনেক কিছু দিতে পারি।"

' "আমার কিছু চাই না।" সেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে মেয়েটি ফিসফিস করে বলল।

' "কিন্তু আমার যে চাই।" আমি বললাম।

' "কী?"

' "তোমাকে।"

'সে কিছু বলল না। আমি তার কাঁধে হাত রাখলাম। সে বাধা দিল না। আমি ভাবলাম মেয়েটি হয়তো ভাবছে আমি ওর অসহায়তার সুযোগ নিচ্ছি, তাই বললাম, "আমি জোর করব না। তুমি চলে যেতে চাইলে যেতে পারো।"

'আমি উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটি আমার ডান হাতটা চেপে ধরে ওর বুকের ওপর রাখল। টের পেলাম ওর হৃদস্পন্দনের গতি খুব দ্রুত। হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম।

'তারপর দুজনে চুম্বনের আদিম খেলায় মেতে উঠলাম। সেই তুমুল আলোড়নের মধ্যে কে কাকে কী বলছি খেয়াল থাকল না। "জামা কাপড়গুলো খোলো", আমি বললাম। "নিজে খুলে দিতে পারো না?", সে বাসনামিশ্রিত গলায় বলল।

~ www.amarboi.com ~

'আমি তাকে আদর করতে লাগলাম। সে বলল, "তুমি কে?"

' "যেই হই আপাতত আমি তোমার।" আমি বললাম।

' "দুষ্টু লোক।" সে আমার আরো কাছে ঘেঁষে এসে বসল।

'কিন্তু যেই তার জামার বোতামে হাত রাখতে গেলাম সে বলল, "প্লিজ না।"

' "কেন এখন তো অন্ধকার।"

' "তাতে কী। আমার লজ্জা করে।"

' "ঠিক আছে, ঠিক আছে।" আমি বলে উঠলাম।

'সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "তুমি রেগে গেছ, না?"

'আমি বললাম, "না না রেগে টেগে যাবার ব্যাপার না...আসলে...আসলে কিছু তো একটা হবে...তাহলে শাড়িটা..."

' "আমার খুব ভয় করছে।" মেয়েটি বলল।

' "কীসের ভয়? আচ্ছা তবে থাক", আমি বললাম, "দু চারদিন এবাড়িতে থাকো। একটু সয়ে যাক। তারপরে দেখা যাবে।"

' "না না সে কথা না", সে বলল আর তার মাথাটা এলিয়ে দিল আমার কোলের ওপর। আমি তার চুলে বিলি কেটে দিতে লাগলাম। আস্তে আস্তে সে শান্ত হয়ে এল। তারপর উঠে এক ঝটকায় আমাকে টেনে নিল তার দিকে। সে ভয়ঙ্কর কাঁপছিল।

হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে সম্বিত ফিরে পেলাম। বাইরে থেকে সরু আলোর রেখা এসে পড়ল ঘরের ভেতর।

' "লণ্ঠনটা এনেছিলাম। যদি আপনাদের লাগে।"

'কাজের ছেলেটির গলা পেলাম।

' "ঠিক আছে, আনো," আমি বললাম।

' "না, না, না", মেয়েটি যেন রুখে দাঁড়াল।

' "কেন অসুবিধে কী আছে। সলতেটা একটু কমিয়ে ঘরের এক কোণে নামিয়ে রাখব।"

'আমি দরজায় কাছে গিয়ে লণ্ঠনটা নিয়ে এসে এক কোণে নামিয়ে রাখলাম। আলোটা চোখে সইয়ে নিতে কিছুক্ষণ সময় লাগল। এর ফাঁকে, দেখলাম, মেয়েটি ঘরের এক প্রত্যন্ত কোণায় গিয়ে ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে।

' "এবার এসো, এই আলোয় একটু গল্প করা যাক", আমি বললাম, "পরে লণ্ঠনটা নিভিয়ে দেব।"

'লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে আমি তার দিকে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই সে শাড়ির আঁচল দিয়ে তার মুখ ঢেকে দিল।

' "অদ্ভুত মেয়ে সত্যি তুমি।" আমি একটু বিরক্ত হয়ে বলে উঠলাম।

'ঠিক এই সময় বাইরে একটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আওয়াজ হল। ভয়ে দিশেহারার মতো মেয়েটি দৌড়ে এসে আমাকে জাপটে ধরল।

' "ও তো বোম পড়ার শব্দ। ও কিছু না। ওঁ তো আকছারই হচ্ছে।" আমি বললাম।

~ www.amarboi.com ~

'এই প্রথম লণ্ঠনের মৃদু আলোয় ওর মুখ আবছা দেখতে পেলাম। মনে হল যেন চেনা চেনা কিন্তু পরিষ্কারভাবে কিছু ঠাহর হচ্ছে না।

'আমি তার দুই কাঁধ ধরে তাকে কাছে টেনে আনলাম। ওঃ ভগবান, কেউ বিশ্বাস করবে না সেই মুহূর্তে কী দেখলাম আমি। আমার অবিশ্বাসী চোখের পর্দায় ভেসে উঠল এক বৃদ্ধার লোলচর্ম মুখ। রংচং করা, তাতে অজস্র ফাটলের চিহ্ন। বৃষ্টির জলে তার মেক-আপ প্যাচপ্যাচে হয়ে গেছে। তার চুল রং-করা। গোড়াগুলোয় সাদা জেগে রয়েছে। তার খোঁপায় গোজা প্লাস্টিকের কয়েকটা রঙিন ফুল।

'হতভম্বের মতো আমি লণ্ঠনটা নামিয়ে রাখলাম মাটিতে। বললাম, "তুমি এখন যেতে পারো।"

'সে কিছু একটা বলতে গেল। আমি তার রেইনকোট আর হাত ব্যাগ তার দিকে এগিয়ে দিলাম। সে আর কিছু বলল না।

'তার দিকে না তাকিয়েই আমি তার জিনিসপত্র তাকে ফিরিয়ে দিলাম। সে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মাথা নিচু করে। তারপর দরজাটা খুলে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে গেল।'

এখানেই আমার বন্ধু 'স'-এর গল্পটা শেষ হল। শেষ হলে পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'জানো ওই মহিলা আসলে কে ছিলেন?'

'না।' বন্ধু বলল।

'বিখ্যাত আর্টিস্ট মিস্ ম।'

'মিস্ 'ম'?' বন্ধু চিৎকার করে উঠল, 'ইস্কুলের দিনগুলোতে যার আঁকা আমরা নকল করবার চেষ্টা করতাম!'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। উনি ছিলেন আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ। উনি ওনার ছাত্রীদের স্টিল লাইফ আঁকা শেখাতেন। পুরুষদের উনি ঘৃণা করতেন।' আমি বললাম।

'এখন তবে তিনি কোথায়।' আমার বন্ধু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

'স্বর্গে।'

'মানে, কী বলছ তুমি?' 'স' চিৎকার করে উঠল।

আমি বললাম, 'যে রাত্রে তুমি ওঁকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলে সেই রাত্রেই উনি গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মারা যান। সেই অর্থে তুমি ওঁর খুনি। আসলে, তুমি দুজন মহিলাকে হত্যা করেছিলে সেদিন। একজন মিস্ 'ম' নামজাদা আর্টিস্ট আর আরেকজন যিনি তাঁর শরীর থেকে কিছু সময়ের জন্যে জন্ম নিয়েছিলেন সেই বর্ষার রাত্তিরে তোমার ড্রইংরুমের আধো-অন্ধকারে, আর যাঁকে তুমি একাই দেখেছো।'

আমার বন্ধু এ-কথার কোনও উত্তর দিল না।

ভাষান্তর : সুদীপ বসু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সিয়া হাশিয়ে

মজুরি

লুটতরাজের বাজার ছিল গরম।
চারিদিকে আগুন ছড়াচ্ছিল।
গরমের পারদ চড়ছিল।

একটা লোক হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে খুশি খুশি গেয়ে যাচ্ছিল :

জব তুম হি গয়ে পরদেশ
লগাকর ঠেস
ও পীতম প্যারা
দুনিয়া মে কৌন হমারা...

(যখন তুমি ব্যথা দিয়ে পরদেশে গেলে, ও আমার প্রিয়তমা, দুনিয়ায় আর আমার কে রইল...)

একটা ছোট ছেলে থলেতে পাঁপড় ভরে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। হোঁচট লাগতেই একটা পাঁপড়ের বাণ্ডিল ওর থলে থেকে বাইরে পড়ল।

ওটা ওঠাবার জন্য ছেলেটা নিচু হতেই একটা লোক, সে মাথায় করে একটা সেলাই মেশিন নিয়ে যাচ্ছিল, বলল, 'ওটা থাক বাছা, ওটা থাক...ওগুলো আপনা আপনিই ভাজা ভাজা হয়ে যাবে...'

বাজারে ধপ্ করে একটা ভারী বস্তা পড়ল। একটা লোক দৌড়ে গিয়ে ওর ছুরি দিয়ে ওটার পেট চিরে দিল—নাড়িভুঁড়ির বদলে চিনি, সাদা সাদা দানাদার চিনি, বেরিয়ে এল।

লোক জমে গেল আর সবাই নিজের নিজের থলে ভরতে লাগল।

~ www.amarboi.com ~

'সরে যাও...সরে যাও...', নতুন রং করা একগাদা আলমারি নিয়ে একটা টাঙ্গা চলে গেল।

উঁচু বাড়ির জানালা দিয়ে ফরফর করে একটা মলমলের থান বাইরে এসে পড়ল।

আগুনের জিভ ওটাকে ভাল করে চাটলো। রাস্তায় পৌঁছতে পৌঁছতে ওটা একটা ছাইয়ের গাদা হয়ে গেল।

পোঁ-পোঁ...পোঁ...পোঁ...মোটরগাড়ির হরনের আওয়াজের সঙ্গে দু'জন মহিলার আর্তনাদও মিশে ছিল।

দশ-পনেরো জন লোক একটা লোহার আলমারি টেনে-হিঁচড়ে বাইরে বার করল আর লাঠি দিয়ে ওটা খুলতে শুরু করল।

আরেকটা লোক 'কাউ অ্যান্ড গোট'-এর কয়েকটা দুধের টিন দু'হাতে ধরে চিবুক দিয়ে চেপে একটা দোকান থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে বাজার দিয়ে হাঁটতে লাগল।

একটা জোর আওয়াজ এল : 'এটা গরমকাল... এসো লেমোনেড খাও...'

গলায় মোটরগাড়ির টায়ার ঝুলিয়ে একটা লোক এগিয়ে এসে দু'বোতল ওঠাল আর ধন্যবাদ না জানিয়েই চলে গেল।

আরেকটা আওয়াজ এল : 'কেউ দমকলে খবর দিয়ে দাও...নয়তো সব মালপত্র জ্বলে যাবে।' কেউ এই পরামর্শকে আমল দিল না।

লুটতরাজের বাজার এভাবেই গরম রইল, আর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া আগুন ওই গরমটার পারদ চড়াতে লাগল। এরপর অনেকক্ষণ বাদে দুম্ দুম্ করে আওয়াজ এল—গুলি চলতে লাগল।

নজরে এল বাজার খালি—কিন্তু দূরে, ধোঁয়ায় ঢাকা মোড়ের কাছে একটা ছায়ার মতো কিছু। পুলিশরা বাঁশি বাজিয়ে ওদিকে ছুটে গেল।

ছায়াটা দ্রুত ধোঁয়ার ভিতর ঢুকে গেল। পুলিশ পিছু ধাওয়া করল।

ধোঁয়ার এলাকা শেষ হতেই পুলিশটা দেখল একটা কাশ্মিরি মজুর পিঠে একটা ভারী বোঝা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে পুলিশের গলা ধরে গেল কিন্তু ঐ কাশ্মিরি মজুরটা থামল না। ...ওর পিঠে ওজন, মামুলি ওজন নয়, একটা ভর্তি ভারী বস্তা, কিন্তু ও এমন দৌড়চ্ছিল যেন ওর পিঠে কিছুই নেই। পুলিশরা হাঁপাতে লাগল—একজন তো বিরক্ত হয়ে পিস্তল বার করে চালিয়ে দিল।

গুলিটা কাশ্মিরি মজুরটার পায়ের গুলফে লাগল, ওর পিঠ থেকে বস্তাটা পরে গেল।

ঘাবড়ে গিয়ে ও দেখল ওর পিছনে আস্তে আস্তে পুলিশরা আসছে ; দেখল ওর গুলফ্

~ www.amarboi.com ~

থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। হঠাৎ এক ঝটকায় ও বস্তাটা তুলে পিঠে রেখে ল্যাঙড়াতে ল্যাঙড়াতে পালাতে লাগল।

ক্লান্ত পুলিশেরা ভাবল : 'দূর, জাহান্নামে যাক...।' ঠিক তখনই কাশ্মিরি মজুরটা নড়বড় করে পরে গেল আর ওর ওপর পড়ল বস্তাটা।

এবার ক্লান্ত হেরো পুলিশরা ওকে ধরে ফেলল ; তারপর বস্তাটা ওর ওপর চাপিয়ে থানার দিকে এগোতে লাগল। রাস্তায় কাশ্মিরি মজুরটা বলতে লাগল : 'হুজুর, আপনি আমায় কেন ধরেছেন...আমি তো একটা গরিব মানুষ...চালের একটা বস্তা নিতাম...ঘরে গিয়ে খেতাম...আপনি অযথা আমায় গুলি মারলেন...'

কিন্তু ওর কথা কেউ শুনল না।

থানাতে গিয়েও কাশ্মিরি মজুরটা নিজের সাফাই গাইল : 'হুজুর, অন্য লোকেরা বড় বড় জিনিসপত্র নিয়ে গেছে...আমি তো কেবল একটা চালের বস্তা নিচ্ছিলাম...হুজুর, আমি খুব গরিব...রোজ একটু ভাল খেতাম...' এসব বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে ওর ময়লা টুপিটা দিয়ে মাথার ঘাম মুছতে মুছতে আর চালের বস্তাটার দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে দারোগাবাবুর সামনে হাত পাতলে : 'আচ্ছা, হুজুর, আপনি বস্তাটা আপনার কাছে রাখুন...আমি আমার মজুরিটা চাচ্ছি...চার আনা।'

সহায়তা

চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের একটা লেঠেলের দল লুঠ-পাট করার জন্য একটা বাড়ির দিকে এগোচ্ছিল।

হঠাৎ ভিড় ফুঁড়ে একটা রোগা-পাতলা মাঝবয়সি লোক বেরিয়ে এল। ঘুরে দাঁড়িয়ে ওই সব মস্তানদের মুখোমুখি হয়ে নেতাদের ভঙ্গিতে বলল : 'ভাইসব ওই বাড়িটায় যা ভাবা যায় তার থেকেও বেশি ধন-সম্পত্তি আছে, অমূল্য সব জিনিসপত্র আছে...আসুন, আমরা সবাই মিলে এগুলো কব্জা করে নিজেদের মধ্যে জিনিসপত্র ভাগ করে নিই।'

হাওয়ায় কেউ কেউ লাঠি ঘোরাল, কেউ কেউ মুঠি পাকিয়ে হাত ছুঁড়ল আকাশে আর জোর স্লোগানের একটা আওয়াজ ফেটে পড়ল।

চল্লিশ-পঞ্চাশজন লেঠেলের দল একটা রোগা পাতলা মাঝবয়সি লোকের নেতৃত্বে বাড়িটার দিকে দ্রুত এগোতে লাগল, যেখানে অকল্পনীয় ধনসম্পত্তি আর অমূল্য সব জিনিসপত্র ছিল।

বাড়ির সদর দরজার সামনে থেমে গিয়ে রোগা পাতলা মানুষটা আবার মস্তানদের মুখোমুখি হয়ে বলল : 'ভাইসব এ-বাড়িতে যত জিনিসপত্র আছে সব তোমাদের...দেখো নিজেদের মধ্যে মারামারি করো না, জিনিসপত্র নিয়ে ট্যানা হ্যাঁচড়া করো না, এসো!'

একজন চেল্লালো : 'দরজায় তালা দেওয়া।'

আরেকজন গলা চড়িয়ে বলল : 'ভেঙে দে।'

'ভাঙ্গো...ভাঙ্গো।' কেউ কেউ হাওয়ায় লাঠি ঘোরাল, কেউ কেউ মুঠি পাকিয়ে হাত ছুঁড়ল আকাশে আর জোর স্লোগানের একটা আওয়াজ ফেটে পড়ল। রোগাপাতলা লোকটা হাতের ইশারায় দরজা ভাঙতে যাওয়া লেঠেলদের থামাল। আর মুচকি হেসে বলল :

~ www.amarboi.com ~

'ভাইসব, দাঁড়াও...আমি চাবি দিয়ে খুলছি।' এই বলে ও পকেট থেকে চাবির গোছা বার করে একটা চাবি বেছে তালায় ঢোকাল আর তালাটা খুলে দিল—সেগুন কাঠের ভারী দরজা একটা আর্তনাদ করে খুলে যেতেই দাঙ্গাবাজরা ভিতরে যাবার জন্য এগিয়ে গেল।

রোগা পাতলা লোকটা মাথার ঘাম নিজের আস্তিনে মুছতে মুছতে বলল : 'ভাইসব, ধীরে... এ বাড়িতে যা কিছু আছে সব তোমাদের... তাহলে এই হুটোপাটি কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে হুকুমের প্রভাব পড়ল—মস্তানরা এক এক করে বাড়ির ভিতর ঢুকতে লাগল, কিন্তু যেই না লুঠপাট শুরু হল অমনি হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। নির্লজ্জের মতো মস্তানরা দামি দামি জিনিস চুরি করতে লাগল।

রোগা-পাতলা লোকটা এসব দেখে খুব কাতর স্বরে লুঠেরাদের বলল : 'ভাইসব, আস্তে-আস্তে...নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি করার দরকার নেই...টানা-হিঁচড়ারও দরকার নেই...প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাহায্য করো। কারো হাতে কোনও দামি জিনিস পড়ে গিয়ে থাকলে তাকে ঈর্ষা করো না। ...এত বড় বাড়ি, নিজের জন্য অন্য কিছু খুঁজে নিও... কিন্তু উদ্বিগ্ন হবে না।...মারামারি করলে জিনিসপত্র ভেঙে যাবে...এতে তোমাদেরই ক্ষতি...'

লুঠেরাদের মধ্যে আবার একটা শৃঙ্খলা এল, আর জিনিসপত্রে ঠাসা বাড়িটা আস্তে আস্তে খালি হতে লাগল।

রোগাপাতলা লোকটা মাঝে মাঝে উপদেশ দিতে থাকল : 'দেখ ভাই, এটা রেডিও...এটাকে যত্ন করে তোল, দেখো ভেঙে না যায়...এটার তারটাও নিয়ে যাও...'

'ভাঁজ করে নাও ভাই, এটাকে ভাঁজ করে নাও...এটা আখরোট কাঠের তেপায়া, হাতির দাঁতের কাজ করা, খুব শক্তপোক্ত নয়...হ্যাঁ, এইবার ঠিক আছে...'

'না, না, এখানে খেও না...ঠিক থাকবে না...এটা বাড়ি নিয়ে যাও...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমাকে মেন-সুইচ্ বন্ধ করতে দাও...আবার কারেন্ট না লাগে...'

এর মধ্যে একটা কোণ থেকে জোরে আওয়াজ আসতে লাগল—চারটে মস্তান সিল্কের একটা থান নিয়ে টানাটানি করছিল।

রোগা-পাতলা লোকটা দৌড়ে ওদের কাছে গিয়ে দুঃখের সঙ্গে বলল : 'তোমরা কি অবুঝ ..এই দামি কাপড় ফ্যাঁসা ফ্যাঁসা হয়ে যাবে...ঘরে সবকিছু আছে, গজকাঠিও...খোঁজ কর আর মেপে কাপড়টা নিজেদের মধ্যে ভোগ করে নাও...'.

হঠাৎ একটা কুকুরের চিৎকার শোনা গেল : ভৌ-ভৌ-ভৌ...আর চোখের নিমেষে একটা বড় অ্যালসেশিয়ান কুকুর ঝাঁপিয়ে ঘরে ঢুকল আর পলকেই দু'তিনটে লুঠেরাকে কামড়ে দিল।

রোগা-পাতলা লোকটা চিৎকার করে উঠল : 'টাইগার...টাইগার...'

টাইগার, যার মুখে তখন একজন লুঠেরার ঘাড়, লেজ দুলিয়ে মাথা নামিয়ে সেই রোগ-পাতলা লোকটার দিকে এগোতে থাকল।

টাইগার আসতেই সব লুঠেরারা পালিয়ে গেছিল, শুধু যার ঘাড় টাইগারের মুখে ছিল সে ছাড়া। ও রোগাপাতলা লোকটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল : 'তুমি কে?'

রোগা-পাতলা লোকটা হাসল : 'এই বাড়ির মালিক...আরে সামলে, তোমার হাত থেকে কাচের ফুলদানিটা পড়ে যাচ্ছে...।'

~ www.amarboi.com ~

ভাগ

একটা লোক নিজের জন্য একটা বড় কাঠের সিন্দুক পছন্দ করল ; কিন্তু যখন ওটা ওঠাতে গেল তখন সিন্দুকটা জায়গা থেকে এক ইঞ্চিও নড়ল না।

আরেকটা লোক যে নিজের জন্য দরকারি কিছুই খুঁজে পায়নি সে প্রথম লোকটাকে বলল : 'আমি কি তোমায় সাহায্য করব?'

প্রথম লোকটা প্রস্তাবটায় রাজি হল। অন্য লোকটা শক্ত হাতে সেই সিন্দুকটাকে ধাক্কা দিয়ে নিজের পিঠের ওপর নিল, প্রথম লোকটা ওকে সাহায্য করল, তারপর দু'জনে বাইরে বেরিয়ে এল।

সিন্দুকটা খুব ভারী ছিল। ওটার ওজনের চাপে বহনকারীর পিঠ ভেঙ্গে যাচ্ছিল আর পা দুটো যেন দু'টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পুরস্কারের আশায় ও শরীরের এই কষ্টটাকে গলা টিপে রেখেছিল।

সিন্দুক পিঠে নেওয়া লোকটার তুলনায় সিন্দুক পছন্দ-করা লোকটা অনেক কমজোরি ছিল—পুরোটা রাস্তা ও কেবল একটা হাত সিন্দুকটার ওপর রেখে নিজের হক কায়েম করে রাখল।

যখন ওরা একটা সুরক্ষিত জায়গায় পৌঁছল, তখন সিন্দুকটা একধারে নামিয়ে যে লোকটা বইবার সব কাজটাই করেছে, সে সিন্দুক পছন্দ-করা লোকটাকে বলল : 'বলো, এই সিন্দুকের জিনিসপত্রের আমি কতটা পাব?'

'চার ভাগের এক ভাগ।'

'এটা তো খুব কম।'

'একদম কম নয়, বেশিই...কারণ সবার আগে আমিই এটার ওপর হাত রেখেছি।'

'ঠিক আছে, কিন্তু এত দূর এই কোমর ভাঙা বোঝা কে টেনে এনেছে?

'আচ্ছা, আধা-আধিতে রাজি তো?'

'ঠিক আছে,...খোলো সিন্দুক।' সিন্দুক খোলার পর ওটা থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল, হাতে তলোয়ার—লোকটা দু'জন ভাগীদারকে চার ভাগে ভাগ করে ফেলল।

সঠিক কাজ

যখন এলাকায় হামলা হল তখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু লোক মারা পড়ল। বাকি যারা বাঁচল তারা প্রাণ নিয়ে পালাল—একটা লোক আর তার বউ তাদের বাড়ির পাতাল ঘরে গিয়ে লুকোল।

স্বামী-স্ত্রী হামলাকারিরা এই আসে ভেবে লুকিয়ে লুকিয়ে দু'দিন দু'রাত কাটাল, কিন্তু কেউ এল না। আরও দু'দিন কাটল। মরবার ভয়টা কমতে লাগল, খিদে আর তেষ্টা খুব জ্বালাতে লাগল।

আরও চারদিন কেটে গেল। স্বামী-স্ত্রীর কাছে বাঁচা মরার কোনও চাওয়া-পাওয়াই রইল না। দু'জনে তাদের বাঁচার জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লোকটা খুব দুর্বল গলায় লোকজনের নজর কাড়তে চাইল : 'আমরা দু'জনেই তোমাদের কাছে নিজেদের তুলে দিচ্ছি...আমাদের মেরে ফেলো।'

যাদের ওরা একথা বলছিল তারা চিন্তায় পড়ে গেল : 'আমাদের ধর্মে তো জীবহত্যা পাপ...'

ওরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে ঐ দম্পতিকে সঠিক কাজের জন্য অন্য এলাকার লোকেদের হাতে তুলে দিল।

শুদ্ধি

'কে তুমি?'

'তুমি কে?'

'হর-হর মহাদেব...হর-হর মহাদেব!

'হর-হর মহাদেব!'

'প্রমাণ আছে?'

'প্রমাণ...? আমার নাম ধরমচাঁদ।

'এটা কোনও প্রমাণ নয়।'

'তুমি আমাকে চার বেদের থেকে যে কোনও কথা জিজ্ঞেস করো।'

'আমি বেদ-ফেদ জানি না...প্রমাণ দাও।'

'কী?'

'পায়জামা ঢিলা করো।'

পায়জামা ঢিলে করতেই একটা সোরগোল পড়ে গেল :

'মেরে ফ্যাল...মেরে ফ্যাল...'

'দাঁড়াও...দাঁড়াও...আমি তোমাদের ভাই...ভগবানের দিব্যি, তোমাদের ভাই।'

'তাহলে এটার মানে কী?'

'যেই এলাকা থেকে আমি আসছি, সেটা আমাদের শত্রুদের...সেজন্য বাধ্য হয়ে আমাকে এরকম করতে হয়েছে, স্রেফ নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য...এই একটা ব্যাপারই ভুল হয়ে গেছে, আমার বাদবাকি সব ঠিক আছে।

'ভুলটা উড়িয়ে দাও...'

ভুলটা উড়িয়ে দেওয়া হল...তার সঙ্গে ধরমচাঁদও উড়ে গেল।

সরি

ছুরি
পেট চিরে
নাভির নিচ অবধি চলে গেল।
পাজামার দড়ি ছিঁড়ে গেল।
ছুরিমারনেওয়ালার
মুখ থেকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আফ্‌শোষ বেরিয়ে এল

'চু...চু...চু... মিসটেক হয়ে গেল।

বিনয়

চলন্ত গাড়িটা থামানো হল।

যারা অন্য ধর্মের

তাদের বার করে করে তলোয়ার দিয়ে আর গুলি করে মারা হল। এর থেকে মুক্ত হয়ে গাড়ির বাকি যাত্রীদের হালুয়া দুধ আর ফল দিয়ে আপ্যায়িত করা হল। গাড়ি ছাড়ার আগে যারা আপ্যায়ন করছিল তাদের নেতা যাত্রীদের সম্বোধন করে বলল :

'ভাইয়েরা আর বোনেরা, গাড়ি আসার খবর আমরা খুব দেরি করে পেয়েছিলাম ; এ কারণে আমরা যেরকম চেয়েছিলাম, আপনাদের সেরকম সেবা-যত্ন করতে পারলাম না...!'

লোকসানের সওদা

দু'জন বন্ধু মিলে দশ-বিশটা মেয়ের থেকে একটাকে পছন্দ করে বিয়াল্লিশ টাকায় কিনল।

রাত কাটানোর পর এক বন্ধু মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল : 'তোমার নাম কী?'

মেয়েটা নাম বলায় ও চটে গিয়ে বলল : 'আমাকে তো বলেছিল তুমি অন্য ধর্মের...!'

মেয়েটা বলল : 'ও মিথ্যে কথা বলেছে!'

এই শুনে ও দৌড়ে ওর বন্ধুর কাছে গিয়ে বলল : 'ঐ আটকুঁড়ির ব্যাটা আমাদের ধোঁকা দিয়েছে...আমাদের ধর্মের মেয়েই গজিয়েছে...চল, ফেরৎ দিয়ে আসি...!'

হালাল আর ঝটকা

'আমি ছুরিটা ওর গলার নলির ওপর রেখে পোঁচ দিতে দিতে ওকে মেরে ফেললাম।'

'এটা তুই কী করেছিস?'

'কেন?'

'ওকে হালাল কেন করতে গেলি?'

'যেভাবে মজা লাগে।'

'মজা লাগার বাচ্চা...তোর ঝটকা মারা উচিত ছিল...এ-রকম।'

আর যে লোকটা হালাল করেছিল এক ঝটকায় তার গর্দান গেল।

জেলি

সকাল ছ'টায় পেট্রোল পাম্পের পাশে হাতে-টানা গাড়িতে বরফ বিক্রি করা লোকটাকে ছুরি মারা হল।

সাতটা অবধি তার লাশ রাস্তায় পড়ে রইল, তার ওর ওপর বিন্দু বিন্দু বরফ-জল পড়তে লাগল।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সওয়া সাতটায় পুলিশ লাশ উঠিয়ে নিয়ে গেল ; বরফ আর রক্ত সেই রাস্তাতেই পড়ে রইল।

তারপর একটা টাঙ্গা পাশ দিয়ে চলে গেল।

বাচ্চাটা টাটকা রক্তে জমে যাওয়া চকচকে দলাটা দেখল, ওর মুখ জলে ভরে গেল। মায়ের হাত ধরে টেনে আঙুল দিয়ে ওই দিকে দেখাল : 'মা দেখো, জেলি...!'

জান্তব

অনেক কষ্টে স্বামী-স্ত্রী মিলে সংসারের অল্পকিছু জিনিসপত্র বাঁচাতে পারল।

একটা জোয়ান মেয়ে ছিল, তার কোনও খবর নেই।

একটা ছোট মেয়ে ছিল, ওর মা ওকে বুকে আঁকড়ে রেখেছিল। একটা মোষ ছিল, ওটাকে দাঙ্গাবাজরা নিয়ে গেল। একটা গরু ছিল, ওটা বেঁচে গেল কিন্তু ওটার বাছুরটাকে পাওয়া গেল না।

স্বামী-স্ত্রী, ওদের ছোট মেয়েটা আর গরুটা একটা জায়গায় লুকিয়ে ছিল।

নিকষ-কালো রাত।

ভয় পেয়ে বাচ্চাটা কাঁদতে লাগলে মনে হল যেন কেউ রাতের নৈঃশব্দের মধ্যে ঢোল পেটাচ্ছে।

মা ঘাবড়ে গিয়ে বাচ্চার মুখে হাত চাপা দিল যাতে শত্রুরা শুনতে না পারে। আওয়াজটা বুজে গেল—বাপটা আরও সাবধানতার জন্য বাচ্চাটার ওপর একটা মোটা, খসখসে চাদর চাপিয়ে দিল।

কিছু দূর যাবার পর দূর থেকে কোনও বাছুরের ডাক শোনা গেল। গরুটির কান খাড়া হয়ে গেল—ও পাগলের মতো ছোটাছুটি করে ডাকতে লাগল, ওটাকে চুপ করাবার অনেক চেষ্টা হল, কিন্তু বেকার...

আওয়াজ শুনে শত্রুরা কাছে আসতে লাগল।

মশালের আলো দেখা দিতে থাকল।

স্ত্রী খুব রেগে গিয়ে তার স্বামীকে বলল :

'তুমি কেন এই হতভাগাটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলে?'

নির্দোষ-আমন্ত্রণ

আগুন লেগে পুরো পাড়াটা জ্বলে গেল...
শুধু একটা দোকান বেঁচে গেল,
যায় গায়ে একটা বোর্ড ঝোলানো ছিল :
'এখানে সকল প্রকার ইমারতি দ্রব্য পাওয়া যায়।'

ভাষান্তর : বিকাশ গণচৌধুরী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবির কাঁদছেন

নগরে-নগরে ঢ্যাঁড়া পেটা হল, কেউ ভিক্ষা চাইলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

গ্রেপ্তারি শুরু হল।

লোকজন আনন্দ করতে লাগল, কারণ একটা পুরনো খারাপ জিনিস দূর হল।

এই দেখে কবিরের চোখে জল এসে গেল।

লোকজন জিজ্ঞেস করল : 'এই জোলা তুই কাঁদছিস কেন?'

কবির কেঁদে বললেন : 'কাপড় তৈরি করতে লাগে টানা আর পোড়েন, তা ধর-পাকড়ের পোড়ানিটা তো শুরু হয়ে গেল, কিন্তু পেট ভরাবার টানাটানিটার কী হবে?'

একজন এম এ, এল এল বি কে দু'শো তাঁত দেওয়া হল।

এই দেখে কবিরের চোখে জল এসে গেল।

এম এ, এল এল বি জিজ্ঞেস করল : 'এই জোলার বাচ্চা, তুই কাঁদছিস কেন?...আমি তোর হক হাপিস্ করে দিয়েছি বলে কাঁদছিস?'

কবির কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিলেন : 'তোমার কানুন তোমাকে এই প্যাঁচ শিখিয়েছে যে তাঁত পড়ে যাক, আর কোটায় যে সুতো পাওয়া যাবে তা বেচে দাও, আর বেকার খটাখট্ করে কী লাভ...কিন্তু এই খটাখট্ই তো জোলার প্রাণ।'

ছাপা বইয়ের অনেক ফরমা ছিল, সেগুলো দিয়ে ছোট বড় খাম বানানো হচ্ছিল।

কবির ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন—দু'তিনটে খাম তুলে নিলে[illegible]র তাতে ছাপা হওয়া পদ্য পড়ে তাঁর চোখে জল এসে গেল।

খাম তৈরিওয়ালা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল : 'মি[illegible] কবির, [illegible]ছেন কেন?'

কবির উত্তর দিলেন : 'এই কাগজে ভক্ত সুরদাসের ক[illegible]তা [illegible]য়েছে..খাম বানিয়ে এই কাগজগুলোর অপমান করো না

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খাম বানানোর লোকটা অবাক হয়ে বলল : 'যার নাম সুরদাস সে কখনও ভক্ত হতে পারে না।'

কবির ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

একটা উঁচু বাড়িতে খুব সুন্দর লক্ষ্মীমূর্তি বসানো ছিল।

কিছু লোক বাড়িটায় নিজেদের অফিস বানানোর সময় মূর্তিটা টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল।

দেখেই কবিরের চোখ জলে ভরে গেল।

অফিসের লোকজন তাকে সাবধান করে দিল :

'আমাদের সম্প্রদায়ে এইসব মূর্তি-ফুর্তি বিধিসম্মত নয়।'

কবির মূর্তির টুকরোগুলোর দিকে সজল চোখে তাকিয়ে বললেন : 'সুন্দর জিনিসকে কুৎসিত বানিয়ে দেওয়া কোনও সম্প্রদায়ের বিধি নয়।'

অফিসের লোকজন হাসাহাসি করতে লাগল—কবির অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন।

কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যদের সামনে জেনারেল ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন : 'সব্জিপাতি বাড়ন্ত, কোনও পরোয়া নেই...ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, চিন্তা নেই...আমাদের সৈন্যরা খালি পেটেই শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করবে।'

দু'লাখ সৈন্য 'জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে লাগল।

কবির চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।

জেনারেলের খুব রাগ হ'ল—তিনি হাঁক পাড়লেন : 'এই ব্যাটা তুই কাঁদছিস কেন?'

কবির কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললেন : 'বাহাদুর জেনারেল সাহেব, খিদের সঙ্গে কে লড়বে?'

দু'লাখ সৈন্য 'কবির মুর্দাবাদ' শ্লোগান দিতে শুরু করে দিল।

'ভাইসব, দাড়ি রাখো, গোঁফ কেটে ফ্যালো আর চোস্ত পাজামা পরো...বোনেরা, বেণী বাঁধো, পাউডার লাগিও না আর বোর্খা পরো...' বাজারের মধ্যে একশ মৌলবি চেল্লাচ্ছিল।

এইসব দেখে কবিরের চোখ জলে ভিজে গেল।

চিৎকার করতে থাকা মৌলবিটা আরও জোরে চিল্লিয়ে জিজ্ঞেস করল : 'কবির, তুই কাঁদছিস কেন?'

কবির চোখের জল সামলে বললেন : 'তোর না আছে কোনও ভাই না কোনও বোন...আর তোর এই দাড়ি, তাতে তুই কলপ কেন লাগিয়ে রেখেছিস...তোর সাদা ভাল লাগে না?'

মৌলবি কবিরকে গালি দিতে শুরু করল—কবিরের চোখ থেকে টপ্‌টপ্ করে কান্না ঝরতে লাগল।

~ www.amarboi.com ~

এক জায়গায় ঝগড়া হচ্ছিল।

আদব কায়দা 'শিষ্টাচারের' বাইরে।

'বাজে বকো না...আদবকায়দা জীবনের বাইরে।'

'সেসব দিন চলে গেছে...এখন তো প্রোপোগেট করার আরেক নাম আদবকায়দা।'

'চুলোয় যাও...'

'তোমার স্টালিন চুলেও যাক...'

'তোমার প্রতিক্রিয়াশীল আর অজানা সব রোগে মরে যাওয়া ফ্লবের আর বোদলেয়ার চুলোয় যাক...'

কবির কাঁদতে লাগলেন।

যারা ঝগড়া করছিল তারা ঝগড়া ছেড়ে তাঁর দিকে তাকাল।

একজন কবিরকে প্রশ্ন করল : 'তোমার অবচেতনায় অবশ্যই এমন কিছু আছে যাতে আঘাত লেগেছে।'

অন্যজন বলল : 'তোমার কান্না তো গভীর আঘাতের ফল।'

কবির আরও বেশি করে কাঁদতে লাগলেন।

যারা ঝগড়া করছিল তারা বিরক্ত হয়ে জিগ্যেস করল : 'মিয়া, এটুকু তো বলো তুমি কাঁদছো কেন?'

কবির বললেন : 'আমি এজন্য কাঁদছিলাম যাতে আপনারা বুঝতে পারেন কি আদব-কায়দা শিষ্টাচারের বাইরে না জীবনের বাইরে।'

যারা ঝগড়া করছিল তারা হাসতে লাগল।

একজন বলল : 'এটা তো মুটে মজুরদের রসিকতা হল।'

অন্যজন বলল : 'না, না, এ তো সাতকেলে বহুরূপী।'

কবিরের চোখে আবার জল এসে গেল।

আদেশ জারি হয়ে গেল যে সমস্ত বেশ্যারা যেন এক মাসের ভেতর বিয়ে করে নেয় আর ভদ্র জীবন যাপন করে।

কবির একটা পাড়া দিয়ে যাবার সময় বেশ্যাদের উড়ো-খুরো চেহারাগুলো দেখে কাঁদতে শুরু করলেন।

একজন মৌলবি তাকে জিজ্ঞেস করল : 'মওলানা আপনি কাঁদছেন কেন?'

কাঁদতে-কাঁদতে কবির উত্তর দিলেন, 'আদবকায়দার মুরুব্বিরা এইসব বেশ্যাদের বরের কী বন্দোবস্ত করবেন?'

মৌলবি কবিরের ক[illegible] হাসতে লাগল, আর কবিরের চোখ আরও জলে ভরে গেল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হাজার লোকের ভিড়ে একটা লোক জ্ঞান দিচ্ছিল : 'ভাইসব, বাজেয়াপ্ত মেয়েদের সমস্যা আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। সবার আগে আমাদের এদের কথা ভাবতে হবে...আমরা এ-ব্যাপারে গাফিলতি করলে এরা সব পানশালায় গিয়ে বেশ্যা হয়ে যাবে...শুনতে পাচ্ছো, বেশ্যা হয়ে যাবে...তোমাদের কর্তব্য ওদের এই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের হাত থেকে বাঁচানো, নিজেদের বাড়িতে ওদের জন্য জায়গা তৈরি করে দাও।...নিজের নিজের ভাই কিংবা ছেলের বিয়ে দেবার আগে এইসব মেয়েদের কথা অবশ্যই ভেবো...'

কবির ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

বক্তৃতাবাজি করছিল যে লোকটা সে থেমে গেল, কবিরের দিকে ইশারা করে উঁচু গলায় বলল : 'দেখ, এই লোকটির হৃদয়ে কত কষ্ট জেগেছে।'

কবির নরম গলায় বললেন : 'কথার বাদশা, তোমার দেওয়া জ্ঞান আমার মনে কোনও প্রভাব ফেলেনি...যখন ভাবলাম যে মালদার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য তুমি এখনও চিরকুমার হয়ে বসে আছো, তখন আমার চোখে জল এসে গেল।'

একটা দোকানে বোর্ড লাগানো ছিল : জিন্নাহ্ বুট হাউস।

দেখে কবির জোরে কাঁদতে লাগলেন।

লোকজন দেখল একটা লোক সাইনবোর্ডটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর কেঁদে যাচ্ছে, ওরা হাততালি দিতে শুরু করল : 'পাগল...পাগল...'

দেশের সবচেয়ে বড় বিপ্লবী প্রয়াত হলে চারিদিকে শোকের ছায়া নেমে এল।

প্রায়শই লোকজন হাতে কালো ব্যাজ বেঁধে ঘুরতে লাগল। এই দেখে কবিরের চোখে জল এসে গেল।

কালো ব্যাজবাঁধা লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল : 'তোমার কী দুঃখ যে তুমি কাঁদছ?'

কবির উত্তর দিলেন : 'এই কালো কাপড়ের টুকরোগুলো যদি একসাথে জুড়ে নেওয়া যেত তো হাজার হাজার মানুষের শরীর ঢাকতে পারত।'

কালো ব্যাজ পরা লোকগুলো কবিরকে পেটাতে আরম্ভ করল : 'তুই কমিউনিস্ট, ফিফ্‌থ্ কলামনিস্ট, তুই পাকিস্তানের শত্রু।'

কবির হাসতে লাগলেন : 'কিন্তু বন্ধু, আমার হাতে তো কোনও ব্যাজ নেই।'

ভাষান্তর : বিকাশ গণচৌধুরী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

য়াজিদ

১৯৪৭-এর দাঙ্গা এল আর গেল। সব ঋতুতেই যেমন একবার একটা খারাপ আবহাওয়া আসে আর যায় প্রায় সেরকম। এরকম অবশ্য নয় যে করিমদাদ তার জীবনে যা কিছু আসছে সবকিছুকেই খোদার ইচ্ছে বলে মেনে নিত। না, সে ভাগ্যের সব পরিবর্তনকে বরং সহিষ্ণুতার সঙ্গে, বীরের মতো মোলাকাত করত। বিরোধী শক্তিগুলিকে সে মুখোমুখি সামলে নিত—তাদেরকে হারিয়ে দেবার জন্যে ঠিক নয়, বরং শুধু সামনাসামনি মোকাবিলা করার জন্যে। সে জানত, শত্রুরা তাকে গণ্যই করছে না, কিন্তু সে বিশ্বাস করত যে এটা একটা অপমান, শুধু তার ওপর নয়, সমস্ত মানবজাতির ওপর, বিপদে পড়লে হার মানা-টা। সত্যি কথাটা বলতে গেলে, অন্য সকলে তার সম্পর্কে এরকমই মতামত পোষণ করত—যারা তাকে অদ্ভুত দুঃসাহসের সঙ্গে বর্বর মানুষদের সামলাতে দেখেছে। কিন্তু করিমদাদকে যদি জিগ্যেস করো, পরাজয় মেনে নেওয়াটা সে নিজের বা সমগ্র মানবজাতির বলাৎকার বলে মনে করে কিনা, বিরোধীপক্ষের সামনে সে নিঃসন্দেহে গভীর চিন্তায় পড়বে। যেন তাকে একটা জটিল অঙ্কের প্রশ্ন জিগ্যেস করা হচ্ছে।

করিমদাদ যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ কিছুই জানত না। ৪৭-এর দাঙ্গা এল আর গেল। লোকজন জীবন আর বিষয়সম্পত্তির লাভ লোকসানের হিসেব কষতে বসে গেল। কিন্তু করিমদাদকে এসব কিছুই স্পর্শ করল না। সে কেবল যা জানত, তা হল : তার বাবা রহিমদাদ, যুদ্ধে 'খরচা' হয়ে গেছে। সে তার বাবার মরদেহ তুলে নিয়ে এসেছিল নিজের কাঁধে, কবর দিয়েছিল একটা কুয়োর ধারে।

গ্রামটা অনেক বিপর্যয় দেখেছিল। হাজার হাজার যুবক-বৃদ্ধ নিহত হয়েছিল। অনেক মহিলা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। অনেকেই চূড়ান্তভাবে ধর্ষিত হয়েছিল। উৎপীড়িতদের অনেকেই বসে বসে কাঁদত—নিজেদের দুর্ভাগ্যকে দোষ দিত—আর দোষ দিত তাদেরকে যারা এইসব হৃদয়হীন ঘটনা ঘটিয়েছে। করিমদাদ কিন্তু একটি ফোঁটা অশ্রুও ঝরায়নি। সে তার বাবার মৃত্যু তক বীরত্বের জন্যে গর্বিতই ছিল। তার বাবা ২৫-৩০ জন

~ www.amarboi.com ~

কুড়োল-তরোয়ালে সশস্ত্র দাঙ্গাবাজের সঙ্গে একা লড়াই করেছিল। করিমদাদ যখন শুনল তার বাবা আক্রমণকারীদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মরে পড়ে আছে, সে শুধু বাবার বীরত্বকে সম্মান জানানোর জন্যে বলে উঠেছিল : 'এটা ঠিক হল না। আমি তোমাকে অন্তত একটা অস্ত্র কাছে রাখতে বলেছিলাম'।

সে রহিমদাদের মৃতদেহটা তুলে নিল কাঁধে, কুয়োর পাশে গর্ত খুঁড়ল আর বাবাকে কবর দিল। তারপর, সে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল : 'দোষীদের আর গুণীদের হিসেব রাখেন খোদা। তিনি যেন তোমাকে জন্নতে পাঠান।'

দাঙ্গাবাজরা রহিমদাদকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। রহিমদাদ যে শুধু করিমদাদের বাবা ছিলেন তা-ই নয়, তার প্রিয় বন্ধুও ছিলেন। তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ডের কথা যারাই শুনত তারাই দুর্বৃত্তদের অভিশাপ দিত। করিমদাদ কিন্তু কিছুই বলত না, কাউকে, একটি কথাও উচ্চারণ করত না। কত যে ক্ষতি হয়েছিল করিমদাদের। আগেই পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের দু-দুটো বাড়ি। তা সত্ত্বেও, এই ক্ষতিগুলো সে বাবাকে হারানোর ক্ষতির সঙ্গে যোগ করত না। সে শুধু নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিত যে, 'যা কিছু হয়েছে, সবই আমাদের নিজেদের দোষেই হয়েছে।' আর কেউ যখন জিগ্যেস করত সেই দোষটা ঠিক কী, সে চুপ করে থাকত।

গ্রামের অন্য সব লোকেরা যখন সাম্প্রতিক দাঙ্গা নিয়ে হা-হুতাশ করত, করিমদাদ ঠিক করল বিয়ে করবে—শ্যামলা রঙের বিষণ্ণ মেয়ে জিনাকে, যার দিকে তার নজর ছিল অনেক দিনের। জিনা ছিল দুঃখের ভারে ভারাক্রান্ত। তার ভাই, শক্ত সমর্থ জোয়ান ভাই, দাঙ্গায় নিহত হয়েছিল। বাবা-মা'র মৃত্যুর পর তার ভাই-ই ছিল তার একমাত্র আশ্রয়। করিমদাদকে জিনা খুবই ভালবাসত ঠিকই, কিন্তু ভাইকে হারানোর পর তার ভালবাসা একটা হৃদয়বিদারক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার যে-চোখদুটো একসময় সদা-হাস্যময় ছিল সেগুলোই বিষাদে পরিপূর্ণ থাকত সবসময়।

কান্নাকাটি বা ফোঁপানিকে ঘৃণা করত করিমদাদ। জিনাকে অসুখী দেখলেই হতাশ হয়ে পড়ত সে। কিন্তু তাকে ভর্ৎসনা করা থেকে নিজেকে সংযত রাখত কারণ সে তো একজন মহিলা আর সে ভাবত তার তিরস্কার হয়তো তার যন্ত্রণাকাতর হৃদয়কে আরও আহত করবে। একদিন, ফাঁকা মাঠে সে জিনাকে ধরল, বলল, 'প্রায় বছর খানেক হতে চলল যারা মারা গেছে তাদের আমরা কবর দিয়েছি। এতদিনে তারা হয়তো আমাদের অনুতাপ দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে গেছে। দুঃখ টুঃখ সব ভুলে যাও, বুঝলে। সামনের দিনগুলোয় আরও কতো মৃত্যু আমাদের দেখতে হবে কে জানে। চোখের জলগুলো আগামী দিনগুলোর জন্যে বাঁচিয়ে রাখো।'

এসব কথা জিনার ভাল লাগল না। কিন্তু সে করিমদাদকে ভালবাসত বলে সে যা যা বলেছে সেসব নিয়ে গভীর ভাবে ভাবল। নিরালায়, তার কথাগুলোর মানে খুঁজতে চাইল, আর অবশেষে, নিজেকে বোঝাতে পারল যে, করিমদাদ ঠিকই বলেছে।

করিমদাদের সঙ্গে জিনার বিয়ের বিষয়টা যখন প্রথম জানাজানি হল, গ্রামের বুড়োরা

~ www.amarboi.com ~

এর বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু তাদের বিরোধিতাটা ছিল দুর্বল। নিরন্তর শোকেদুঃখে তারা এতো ভারাক্রান্ত ছিল যার ফলে, করিমদাদের বিয়েটা ঠিকভাবেই হয়ে গেল। গায়ক বাদকদের ডাকা হল। সব ক্রিয়াকর্মই করা হল। করিমদাদ তার প্রেমিকাকে আইনসঙ্গতভাবে বিবাহিত স্ত্রী হিসেবে বাড়িতে নিয়ে এল।

দাঙ্গার বছরখানেক পরেও গ্রামটা কারবালার মতো হয়ে গিয়েছিল। করিমদাদের বিয়ের শোভাযাত্রা যখন গ্রামের মানুষের চিৎকার আর কান্নাকাটির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, কয়েকজন গ্রামবাসী তখন বেশ ভয়ই পেয়েছিল। তারা ভেবেছিল এটা একটা বীভৎস ভৌতিক মিছিল। করিমদাদের বন্ধুরা যখন তাকে এসব কথা বলল, হো হো করে হেসে উঠল সে। কিন্তু সে তার স্ত্রীকে হাসতে হাসতে যখন এসব বর্ণনা করছিল, তার বৌ ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

করিমদাদ জিনার লাল-বালা-পরা হাতটা নিজের হাতে নিল, বলল, 'এই ভূতটা তোমাকে বাকি জীবনটা তাড়িয়ে ফিরবে...এমনকি গ্রামের ডাইনিরাও তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না, তাদের ডাকিনীবিদ্যা দিয়ে।'

জিনা তার হেনা-করা আঙুলটা দাঁতে কাটল, আর ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'কিমি, তুমি কোনও কিছুকেই ভয় পাও না।'

করিমদাদ নিজের জিভটা তার বাদামি-কালো গোঁফে বুলিয়ে নিয়ে হাসল, 'ভয় পাবার কী আছে এত?'

জিনার বিষণ্ণতার ধার ক্রমশ ভোঁতা হয়ে আসছিল। সে মা হতে চলেছে। করিমদাদ তার প্রস্ফুটিত মাতৃত্ব-চিহ্ন দেখে খুশি। 'ভগবানের দিব্যি, জিনা, তোমাকে এত সুন্দর কখনও লাগেনি! আমার যে বাচ্চাটা আসতে চলেছে, শুধু তার জন্যেই যদি তুমি এতো সুন্দর হতে থাকো, তাহলে তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হবে কী করে?'

জিনা শাল দিয়ে নিজের স্ফীত পেট লুকিয়ে রাখে। করিমদাদ হাসে আর তার পেছনে লাগে আরও, 'লুকচ্ছো কেন? তুমি কি ভাবছ আমি জানি না যে তুমি ওই শুয়োরের বাচ্চাটার জন্যে সব কষ্ট সহ্য করছো?'

জিনা হঠাৎ ক্ষেপে গেল, বলল, 'তুমি নিজের ছেলেকে গালাগাল দিচ্ছো কী করে?'

করিমদাদের বাদামি-কালো গোঁফ চাপা হাসিতে কাঁপতে লাগল। 'করিমদাদ ওদের মধ্যে সবচেয়ে বড় শুয়োর।'

প্রথম ঈদ এল। দ্বিতীয় ঈদও এল। করিমদাদ ধুমধাম করে দুটো উৎসবই পালন করল। দাঙ্গাবাজরা শেষ ঈদের ঠিক বারো দিন আগে এই গ্রামটাকে আক্রমণ করেছিল, যখন করিমদাদ আর জিনার ভাই, ফজল ইলাহি, খুন হয়েছিল। জিনা তাদের দু-জনের জন্যেই বড় বড় ফোঁটায় চোখের জল ফেলেছিল। কিন্তু যে সঙ্গী কোনও রকম দুঃখের স্মৃতিকে পাত্তাই দিতে চায় না তার সঙ্গে থেকে থেকে, সে ঠিক যেরকম ভাবে চাইছিল সেরকম ভাবে শোক করতে পারছিল না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যখনই জিনা স্থির হয়ে নিজের বিগত জীবনের কথা ভাবত, অবাক হয়ে যেত ভেবে যে কী করে সে তার জীবনের এত বড় দুর্ঘটনার কথা ভুলে যেতে পারছে। বাবা-মা'র মৃত্যুর কথা তার মনেই পড়ে না। ফজল ইলাহি তার থেকে ছ-বছর বড় ছিল। সে ছিল তার বাবা, মা, ভাই, সব একসঙ্গে। জিনা ভালভাবেই জানত তার ভাই তার জন্যেই বিয়েটা করেনি। আর সারা গ্রাম জানত যে ফজল ইলাহি তার বোনের সম্মান বাঁচানোর জন্যে নিজে বিয়েটা করেনি। পরিষ্কার কথা, তার মৃত্যু তার বোনের জীবনে একমাত্র বিয়োগান্ত ঘটনা। আগে থেকে জানান না দিয়ে একটা দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি তার জীবনে এসেছিল, দ্বিতীয় ঈদের ঠিক বারো দিন আগে। যখনই সে এসব কথা ভাবত, অবাক হয়ে ভাবত যে সে ওই দুর্ঘটনার দুঃখ থেকে কত দূরে সরে এসেছে।

মহরমের সময় করিমদাদের কাছে জিনা তার প্রথম অনুরোধটা রাখল। শোভাযাত্রায় বেরোনা ঘোড়াটা কিংবা তাজিয়া দেখার জন্যে সে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। বন্ধুদের কাছ থেকে এই শোভাযাত্রা সম্পর্কে সে অনেক কিছুই শুনেছিল। তাই সে করিমদাদকে বলল, 'আমার শরীর যদি মোটামুটি ভাল থাকে, তুমি কি আমাকে তাজিয়া দেখাতে নিয়ে যাবে?'

করিমদাদ হাসল, বলল, 'তোমার শরীর খারাপ থাকলেও আমি তোমাকে নিয়ে যাব... এমন কী ওই শরীরের শুয়োরের বাচ্চাটাকেও।'

জিনা তার ভূমিষ্ট-না-হওয়া শিশু সম্পর্কে এভাবে কথা বলাটাকে ঘৃণা করত। ওরকম মন্তব্য শুনলেই তার খুব অভিমান হত। করিমদাদের বলার ভঙ্গিটা এতো ভালবাসায় ভরা থাকত যে জিনার রাগ একরকম অবর্ণনীয় মিষ্টতায় ভরে যেত, সে অবাক হত ভেবে যে ওই 'শুয়োরের বাচ্চাটা' কথাগুলোয় মধ্যে কীভাবে এতো ভালোবাসা ভরে দেওয়া যায়।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ লাগবে এরকম একটা গুজব শোনা যাচ্ছে আজকাল। বাস্তবিক পক্ষে, পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর, এটা একটা প্রায়-নিশ্চিত ঘটনা হতে যাচ্ছে যে দু-দেশের মধ্যে যুদ্ধ লাগতে চলেছে। যদিও গ্রামের কেউই ঠিক ঠিক জানত না যুদ্ধটা ঠিক কখন শুরু হবে। করিমদাদকে কেউ এ-ব্যাপারে জিগ্যেস করলে ব্যঙ্গ ভরে ছোট করে বলত, 'যখন লাগবে, তখন লাগবে। এসব নিয়ে ভাববার কী আছে এতো?'

যুদ্ধের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থাকত জিনা। সে ছিল শান্তিপ্রিয় স্বভাবের মেয়ে। বন্ধুদের সঙ্গে সামান্য কথাকাটি হলেই তার খারাপ লাগত। লুঠপাট, খুনখারাপি সে অনেক দেখেছে গতবারের দাঙ্গায়, প্রিয় ভাইটাকেও হারিয়েছে। ত্রস্তভীত, সে করিমদাদকে একদিন জিগ্যেস করল, 'কিমি, কী হবে বলো তো?'

করিমদাদ হাসল, বলল, 'আমি কী করে জানব বলো তো, মেয়ে হবে, না ছেলে?'

এ ধরনের প্রত্যুত্তর তাকে পাগল পাগল করে তুলতো, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সে করিমদাদের হাসিঠাট্টায় ভুলে যেত আর যুদ্ধভীতির যাবতীয় মেঘ তার মাথা থেকে সরে যেত। করিমদাদ ছিল শক্তসমর্থ, নির্ভীক, পুরোপুরি জিনার প্রেমিক। সে একটা বন্দুক কিনেছিল, ঠিকঠাক লক্ষ্যভেদ করা অভ্যেস করেছিল। এই সব মিলিয়ে জিনা সাহস পেতো

~ www.amarboi.com ~

ঠিকই, কিন্তু যখনই কোনও গ্রামবাসীর কাছে বা বন্ধুদের কাছে হাল্কা গল্পগুজব শুনত, তার যাবতীয় ভয়ভীতি ফিরে আসত ফের।

একদিন, বাখ্‌তো দাই, যে জিনাকে রোজ পরীক্ষা করতে আসত, খবর নিয়ে এল যে ভারতীয়েরা নদীর কাছাকাছি এসে গেছে। এসবের অর্থ কী, জিনা জানত না, তাই বাখ্‌তোকে জিগ্যেস করল, 'নদীর কাছাকাছি মানে?'

বাখ্‌তো উত্তর দিল, 'নদী, তো আমাদের ফসলদের জল দেয়।'

জিনা এক মূহূর্ত চিন্তা করল। তারপর হেসে বলল, 'পাগলের মতো কথা বলছো...নদীর কাছে কে আসতে পারে, এটা নদী, নালা-টালা নয়।'

বাখ্‌তো মোলায়েমভাবে জিনার বিস্তৃত উদরে মালিশ করে দিতে দিতে বলল, 'অতশত জানি না...আমি যা শুনেছি তাই বলছি। সবাই বলছে, খবরের কাগজ জুড়ে এই এক কথা।'

'কী কথা?' জিনা বিশ্বাস করতে পারছিল না।

বাখ্‌তো তার কোঁচকানো হাত দিয়ে জিনার পেট পরীক্ষা করতে করতে বলল, 'এই কথা, যে তারা নদীর কাছাকাছি আসছে।' বলে জিনার জামাটা টেনে দিল, উঠে দাঁড়াল, বলল, বেশ বিজ্ঞভাবে, 'সবকিছু যদি ঠিক থাকে, দশদিনের মধ্যে বাচ্চাটা হয়ে যাবে।'

জিনা করিমদাদকে নদীটা সম্পর্কে জিগ্যেস করল বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই। প্রথমে করিমদাদ এড়িয়ে যেতে চাইল। কিন্তু জিনা বার বার জিগ্যেস করতে সে বলল, 'হ্যাঁ, আমিও সেরকমই শুনেছি।'

'কী শুনেছো?' জিনা জানতে চাইল।

'ভারতীয়েরা নদীর কাছাকাছি এসে গেছে।'

'কিন্তু কেন?'

'যাতে আমাদের ফসল নষ্ট হয়ে যায়।'

ততক্ষণে জিনা বুঝে গেছে নদীর কাছাকাছি কেউ আসতে পারে। অসহায়ভাবে সে শুধু বলতে পারল, 'লোকগুলো কী নিষ্ঠুর!'

শুনে, একটু থেমে, করিমদাদ হাসল, বলল, 'এসব কথা ভুলে যাও, বলো তো, বাখ্‌তো এসেছিল?'

নিরাসক্তভাবে জিনা বলল, 'হ্যাঁ এসেছিল।'

'কী বলল?'

'বলল, দশ দিনের মধ্যে বাচ্চাটা হয়ে যাবে।'

করিমদাদ আনন্দে লাফিয়ে উঠল, 'ও অনেকবছর বাঁচবে।'

অসুখী জিনা তার নিরানন্দ প্রকাশ করল, বিড় বিড় করে বলল, 'নিজের দিকে তাকাও, এই দুর্দিনে তুমি আনন্দ করছো...যখন, আল্লা জানেন, কী ধরনের দুর্ভিক্ষ শুরু হতে চলেছে।'

করিমদাদ চৌপলে গেল, যেখানে প্রায় সব গ্রামবাসীরা এসে জড়ো হয়েছে। গ্রামপ্রধান চৌধুরী নাথুকে ঘিরে ধরেছে আর তাকে প্রশ্ন করছে, নদীটা রুদ্ধ হয়ে যাবার ব্যাপারে।

~ www.amarboi.com ~

কেউ কেউ পণ্ডিত নেহরুকে গালাগাল দিচ্ছে, সবরকম দুরবস্থার জন্যে দোষ দিচ্ছে তাকে, আবার কেউ কেউ বলছে নদীর গতিপথ এমনিতেই পাল্টে যেতে পারে। আবার কেউ কেউ বলছে, যা যা হতে চলেছে তা সবই নিজেদের কৃতকর্মের ফল আর এইসব থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল মসজিদে গিয়ে প্রার্থনা করা।

করিমদাদ এক কোণে বসে চারপাশের সব কথাবার্তা শুনছিল। চৌধুরী নাথু সবায়ের চেয়ে বেশি নিন্দা করছিল ভারতীয়দের। করিমদাদ এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছিল অস্থিরভাবে যেন সে অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত। সকলে একবাক্যে একমত হয়েছিল একটা ব্যাপারে : নদীটা বন্ধ করে দেওয়া একটা ঘৃণ্য, নীচ চাল, এটা একটা ফালতু, অসাধু, এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যাপার।

করিমদাদ কয়েকবার কাশল, যেন সে কিছু বলতে চায়। কিন্তু চৌধুরী নাথুর মুখ থেকে অনবরত যেসব অবজ্ঞামূলক কথাবার্তার ঝরনাধারা বেরোতে লাগল, তাতে করিমদাদ নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। সে চিৎকার করে উঠল, 'অন্যদের গাল দেবেন না, চৌধুরী!'

চৌধুরীর গলায় একটা মাতৃ-অবজ্ঞা কেমন যেন আটকে গেল। সে করিমদাদের দিকে ঘুরে তাকাল, করিমদাদ তার পাগড়িটা ঠিক করছিল।

'কী বললে তুমি?'

করিমদাদ নরম কিন্তু কঠিন গলায় বলল, 'আমি বললাম, অন্যদের গালাগাল দেবেন না।'

চৌধুরী নাথু গলায় জমে থাকা অবজ্ঞাটা থুতু ফেলে পরিষ্কার করল, রাগত ভাবে করিমদাদকে জিগ্যেস করল, 'গাল দিচ্ছি কাকে? তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী?' আর তার পর চৌপলে যারা জড়ো হয়েছিল তাদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'শুনলে, তোমরা? ও বলছে... অন্যদের গাল দিও না! ওকে জিগ্যেস করো, ওদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কী?'

করিমদাদ শান্তভাবে উত্তর দিল, 'ওরা আমার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে যাবে কেন? ওরা তো আমার শত্রু, আর কী?'

উচ্চৈঃস্বরে বিরক্তি ভরা হাসি বেরিয়ে এল চৌধুরীর গলা থেকে এমন জোরে যে তার গোঁফের চুলগুলি কেঁপে উঠল। 'শুনলে তোমরা? তারা নাকি ওর শত্রু। আর, শত্রুদের কি ভালবাসা উচিত, বেটা?'

যেমনভাবে লোকে গুরুজনের প্রশ্নের উত্তর দেয় করিমদাদ উত্তর দিল, 'না, আমি সে কথা বলিনি। আমি যা বলেছি তা হল, অন্যদের গালাগালি দেবেন না।'

করিমদাদের বাল্যবন্ধু, মিরনবক্স, যে তার পাশে বসে ছিল, বলল, 'কিন্তু কেন?'

করিমদাদ সোজাসুজি মিরনবক্সের সঙ্গে কথা বলল, 'যুক্তিটা কী, ইয়ার? ওরা নদীটা বন্ধ করার চেষ্টা করছে, তোমাদের সব শস্য ধ্বংস করার চেষ্টা করছে, আর তুমি ভাবছ তুমি তাদের গালাগাল দেবে আর সব ঠিক হয়ে যাবে? এর মানে আছে? লোকে গাল পাড়ে যখন কোনও উত্তর খুঁজে পায় না।'

~ www.amarboi.com ~

মিরনবক্স জিগ্যেস করল, 'তোমার কাছে কোনও উত্তর আছে?'

করিমদাদ একটুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'প্রশ্নটা আমার একার নয়, এর সঙ্গে হাজার হাজার লোক জড়িয়ে আছে। আমার উত্তরটা প্রত্যেক মানুষের উত্তর হবে না হয়তো। এরকম পরিস্থিতিতে, কেউ একজন শুধু সাবধানী বিবেচনার পর উত্তর দেবার কথা ভাবতে পারে। ওরা নদীর গতিপথ একদিনেই পাল্টে দিতে পারে না। বছরের পর বছর লাগবে। আর এখানে, তোমার এক সেকেন্ড লাগবে, মনের বিষ ঢেলে দিতে।' সে মিরনবক্সের কাঁধে একটা হাত রাখল আর স্নেহের সঙ্গে বলল, 'যা আমি জানি তা হল, ভারতকে সন্দেহজনক, শস্তা বা নিষ্ঠুর বলাটা ভুল হবে, ইয়ার।'

মিরনবক্সের বদলে, চৌধুরী নাথু চেঁচিয়ে উঠল, 'শোনো কথা!'

করিমদাদ মিরনবক্সকে বলে চলল, 'শত্রুর কাছ থেকে দয়া বা করুণা ভিক্ষা করা বা আশা করা, একটা বোকা বোকা ব্যাপার ইয়ার। যখন যুদ্ধ বাধল, আর আমরা চেঁচাতে লাগলাম যে ওরা আমাদের চেয়ে বড় বন্দুক বা বড় বোমা ব্যবহার করছে, সমস্ত সততার সঙ্গে আমি তোমাদের জিগ্যেস করেছি, এইসব অভিযোগ করা কি ঠিক? একটা ছোট ছুরি দিয়েও সফলভাবে কাউকে খুন করা যায় যেরকম একটা বড় ছুরি দিয়েও করা যায়। আমি কি সত্যি বলছি না?'

মিরনবক্সের বদলে, চৌধুরী নাথু ভাবতে লাগল, বিরক্তও হয়ে উঠল দ্রুত। 'কিন্তু এখন বিষয়টা হল ওরা আমাদের জল বন্ধ করে দিচ্ছে.... ওরা চায় আমরা ক্ষুধাতৃষ্ণায় মারা যাই।'

করিমদাদ মিরনবক্সের কাঁধ থেকে তার হাত সরিয়ে নিল, চৌধুরীকে ধরল, 'যখন আপনি কাউকে আপনার শত্রু বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছেন, তখন অভিযোগ করছেন কেন যে সে আপনাকে বুভুক্ষু আর তৃষিত রেখে মেরে ফেলতে চায়? সে যদি ক্ষুধাতৃষ্ণায় আপনাকে কাবু করে ফেলতে না পারে, সে যদি আপনার শস্যশ্যামল ভূমিকে পতিত নিষ্ফলা না করতে পারে, আপনি কি ভাবেন সে আপনাকে পেট পুরে পোলাও-মিষ্টি এনে খাওয়াবে, শরবত খাওয়াবে, ফলমূলের বাগান বানিয়ে দেবে?'

এতে শুধু আরও রেগে গেল চৌধুরী। 'এসব বাজে কথার মানে কী?', রেগে জিগ্যেস করল সে।

এমনকি মিরনবক্সও তার বন্ধুকে নরম গলায় জিগ্যেস করল, 'সত্যিই তো, এসব বাজে কথার মানে কী?'

'এসব বাজে কথা নয়, মিরনবক্স!' যেন ব্যাখ্যা করছে, এমনভাবে করিমবক্স বন্ধুকে বলল, 'শুধু ভেবে দেখো, যুদ্ধ বাধলে একে অন্যকে হত্যা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। ঠিক কুস্তিগীরেরা যেমন উরু চাপড়ায় তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে মাটিতে পেড়ে ফেলার জন্যে।'

মিরনবক্স তার মুণ্ডিতমস্তক অবনত করে বলল, 'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

করিমদাদ হাসল। 'তাহলে নদীটা বন্ধ হয়ে গেলেও কোনও ক্ষতি নেই। এটা আমাদের কাছে নিষ্ঠুরতা মনে হতে পারে; কিন্তু ওদের পক্ষে একদম ঠিক কাজ।'

'যখন তোমার জিভ এক ফোঁটা জলের জন্যে মাটি চাটবে তৃষ্ণায়, তখন তোমাকে

~ www.amarboi.com ~

জিগ্যেস করব এটা ঠিক কাজ কিনা। যখন তোমার বাচ্চারা একমুঠো ভাতের জন্যে চিৎকার করে কাঁদবে, তখনও কি তুমি বলবে, নদীটা বন্ধ হয়ে যাওয়া ঠিক আছে?'

করিমদাদ তার শুকনো ঠোঁট জিভ বুলিয়ে ভিজিয়ে নিল, বলল, 'আমি এখনও মনে করি একই কথা। আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন, তারাই যে শুধু আমাদের শত্রু তা নয়, আমরাও কিন্তু তাদের শত্রু। যদি আমরা পারতাম, আমরাও ওদের খাদ্য আর জল বন্ধ করে দিতাম। কিন্তু এখন যখন ওরা আমাদের নদী বন্ধ করে দিচ্ছে, আমাদের একটা উপায় খুঁজে বের করতেই হবে। কিন্তু অর্থহীন পরিশ্রমের প্রয়োজন কী? শত্রুরা আপনার জন্যে দুধের নদী তৈরি করে দেবে না। যদি পারত, জলের প্রতিটি ফোঁটায় বিষ মিশিয়ে দিত ওরা। আপনি একে নিষ্ঠুরতা বলতে পারেন, বর্বরতাও বলতে পারেন, কারণ আপনি এইভাবে জীবন নেওয়া পছন্দ করেন না। এটা কি অদ্ভুত নয়? যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে, দুই পক্ষের মধ্যে একটা চুক্তিপত্র করার দরকার ছিল কিনা, নিকাহ্ করার মতো? আমাদের কি ওদের বলা উচিত, আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণার মধ্যে ফেলে মেরে না ফেলে স্বাগত জানাচ্ছি বন্দুক নিয়ে আক্রমণ করতে, একধরনের নির্দিষ্ট বন্দুক দিয়ে? এটাই হল আসল বাজে কথা...ব্যাপারটা একটু ভাবুন, সাবধানে আর ঠাণ্ডা মাথায়।'

কিন্তু এতক্ষণে চৌধুরী তার হতাশার শেষ স্তরে পৌঁছে গেছে। চিৎকার করে উঠল সে, 'বরফ নিয়ে এসো কেউ, আমার বুকের ওপর চড়াও।'

'আপনি আমাকে সেটাও করতে বলছেন?' করিমদাদ হাসল। তারপর মিরনবক্সের পিঠ চাপড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল আর চলে গেল।

চৌকাঠ পেরোতে যাবে, সে দেখল, বাখ্‌তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে। সে করিমদাদকে দেখে ফোকলা দাঁতে হাসল মুখ ভরে।

'সালাম, কিমি! তোমার একটা স্বাস্থ্যবান সুন্দর ছেলে হয়েছে। একটা সুন্দর নাম ভাবো এখন।'

'নাম?' করিমদাদ এক সেকেন্ডও না ভেবেই বলল, 'য়াজিদ—য়াজিদ।'

বাখ্‌তোর মুখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে, করিমদাদ বাড়িতে ঢুকল। জিনা বিছানায় শুয়ে ছিল। আগের চেয়ে অনেক শীর্ণ দেখাচ্ছে তাকে। স্বাস্থ্যবান একটি শিশু তার পাশে, নিজের আঙুল চুষছে। করিমদাদ তার দিকে গর্ব আর ভালবাসা নিয়ে তাকাল। আঙুল দিয়ে আলতো করে তার গাল স্পর্শ করে বলল, 'আমার ছোট্ট য়াজিদ!'

জিনার কপাল কুঁচকে গেল, বিস্ময়ে অস্ফুটে বলল, 'য়াজিদ?'

করিমদাদ ছেলের দিকে গভীর ভাবে তাকাল, সবকিছু দেখল তার, 'হ্যাঁ, য়াজিদ। ওটাই ওর নাম।'

জিনার গলা অস্পষ্ট হয়ে এল, 'কী বলছো কিমি? য়াজিদ...'।

করিমদাদ হাসল, 'তাতে কী হয়েছে? শুধু তো একটা নাম!'

জিনা যা করতে পারল তা শুধু ফিস্ ফিস করে বলা, 'কিন্তু কার নাম?' করিমদাদ গম্ভীর

~ www.amarboi.com ~

ভাবে বলল, 'সেই য়াজিদ নয়। সে নদীটা বন্ধ করে দিয়েছিল; আমাদের সন্তান সেটা খুলে দেবে।'

ভাষান্তর : সোমক দাস

[য়াজিদ : মহম্মদের তিরোধানের পঞ্চাশ বছর পর, মুসলমানদের ছোট্ট সম্প্রদায় নেতৃত্বের দাবিতে দ্বিধাজীর্ণ ছিল। সিরিয়ার রাজা, মবিয়া, আলি'র বিরোধিতা করেছিলেন, এবং খলিফা পদ তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র, য়াজিদ, শত্রুতাটা জিইয়ে রেখেছিল এবং বশ্যতা দাবি করেছিল আলি'র ছেলের ও উত্তরাধিকারী হুসেনের কাছ থেকে। আলির ছেলে আর মহম্মদের নাতি হুসেন যখন রাজি হল না, য়াজিদ দ্বিধাহীন ভাবে আহ্বান করল : হয় সমর্পণ করো, কিংবা মৃত্যুবরণ করো। সমর্পণ মানে য়াজিদকে মেনে নেওয়া, তার ক্ষমতাকে যা সে অন্যায় ভাবে ছিনিয়ে নিয়েছিল। হুসেনের কাছে দুটোই সমর্থনের অযোগ্য; বরং সে বেছে নিয়েছিল আত্মত্যাগের পথ, তার পরিবার আর সমর্থকদের আত্মদানের পথ।

খ্রিস্টপূর্ব ৬৭৯ সালে, কুফা থেকে প্রায় ৭০ কিমি দূরে, কারবালা নামে এক মরুভূমিতে, চার হাজার জন যোদ্ধার বিরুদ্ধে মাত্র সত্তর জন মানুষ লড়াই করেছিল। খাদ্যের অভাবে, যুদ্ধে অবসন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল, কেটে ফেলা হয়েছিল শিশুদের, ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দলে ঘিরে ফেলা হয়েছিল, শত্রুদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে। যুদ্ধের অষ্টম দিনে জল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ইউফ্রেটিস নদীটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল চক চক করছে কিন্তু জল আসার পথটা বন্ধ করা। অসুস্থ, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণায় মরো-মরো, সিক্ত ও শতচ্ছিন্ন পোশাকে, প্রবল বিক্রমে যুদ্ধের দশম দিনটা কাটল, দিনটাকে বলে আসরা, যেদিন সবাই ধ্বংস হয়ে গেল, শুধু তিনজন পুরুষ আর কয়েকজন নারী ও শিশু ছাড়া, যারা হেঁটে এসেছিল যতক্ষণ না দামাস্কাসকে য়াজিদের সামনে আনা হয়। তারপর থেকে, স্বাভাবিকভাবেই, য়াজিদকে মুসলমানদের ইতিহাসে একজন ঘৃণ্য চরিত্র বলে ভাবা হয়।]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শরিফন

বাড়িতে ঢোকার সময়, ডানপায়ের ডিমের ভিতর গুলিবিদ্ধ ক্ষতটা যন্ত্রণায় টাটিয়ে উঠল কাসিমের। ভিতরে ঢুকে বিবির পড়ে থাকা লাশ দেখে তার চোখ দিয়ে রক্তবন্যা বয়ে যায়। অন্ধ করে দেয় কাসিমকে। উনুনের কাঠ চেরাই করার কুড়ুল নিয়ে, খুনের বদলা খুন করার জন্য বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়ে যেতে চেয়েছিল পথে, বাজারে দাঙ্গা লাগা শহরে। হঠাৎ মনে পড়ে যায় শরিফনের কথা।

'শরিফন...শরিফন।' ভয়ার্ত চিৎকার করে কাসিম। আতঙ্কে মেয়েটা নিশ্চয়ই ভিতরে লুকিয়ে আছে। দরজার সামনে এগিয়ে, বন্ধ দরজার মাঝে মুখ ঠেকিয়ে কাসিম ডাকে, 'শরিফন...শরিফন। আমি, আব্বা।' ভিতর থেকে কোনও উত্তর আসে না।

কাসিম দুহাত দিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে, দরজা খুলে যেতেই সে মুখ থুবড়ে বারান্দায় পড়ে যায়। কোনও মতে নিজের টাল সামলে ওঠার সময় কাসিমের মনে হয় ওখানে কেউ...। আর্তনাদ করে উঠে বসে।

এক গজ তফাতে এক কিশোরীর লাশ পরে আছে। ধবধবে ফরসা। সুডৌল শরীর, একেবারে উলঙ্গ। ছোট ছোট দুই স্তন ছাদ বরাবর উঁচু হয়ে রয়েছে। কাসিমের সারা শরীর কাঁপতে লাগল। হৃদপিণ্ড থেকে উঠে আসা হাহাকারকে আটকাতে চায় সে, নিজের ঠোঁট দুটিকে শক্ত করে চেপে রেখে। আগেই বন্ধ হয়ে গেছিল চোখ দুটি। তবু দুহাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেলে সে।

'শরিফন—।' আহত জন্তুর কণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসে। দুটো চোখ চেপে কাজ করে, উঠানের এখান থেকে, বারান্দা থেকে হাতড়ে হাতড়ে কয়েকটা জামা কাপড় জোগাড় করে কাসিম ছড়াতে থাকে মেয়ের লাশের ওপর। তারপর চোখ বন্ধ অবস্থায় বারান্দা থেকে বেরিয়ে আসে। কাপড়গুলো দিয়ে তার মেয়ের লজ্জা ঢাকা হল কিনা তা সে দেখতে চাইল না।

বাড়ি ছেড়ে বেরোবার আগে কাসিম নিজের মৃত বিবিকে একপলক দেখল না। এমনও হতে পারে বিবির কথা তার আর মনেই নেই। মাথায় শুধু শরিফন। শরিফনের নগ্ন লাশটা তার চোখে আটকে আছে। এক কোণে রাখা উনুনের জ্বালানি কাঠ কাটার কুড়ুলটা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল কাসিম।

~ www.amarboi.com ~

ডান পায়ে ডিমের ভিতরে একটা বারুদখণ্ড ঢুকে আছে। ঘরে ঢোকার পর থেকেই তা মাথা থেকে উড়ে গেছিল। এমন কি বিবির কথাও মাথায় নেই। পরম-যত্নে, বিশ্বাসে ভালবাসায় ভরিয়ে দিয়েছিল কাসিমের জীবন, সেই মনের মানুষটির গলার নলি-কাটা লাশটার কথা ভুলে গেল কাসিম। শুধু একটাই ছবি বার বার ভাসে। নগ্ন শরিফনের ছবি। এই দৃশ্য অন্ধ করে দেবার জন্য যথেষ্ট। কাসিমের শরীরে রক্তের বদলে তরল লাভা স্রোত বইতে থাকে।

কুড়ুল হাতে কাসিম চলতে চলতে নির্জন বাজারের দিকে এগোয়। পথে একটি শিখ পাঞ্জাবির মুখোমুখি হয় সে। লম্বা চওড়া শিখ লোকটি, কিছু বুঝতে পারার আগেই ধারালো কুড়ুলটা দিয়ে কোপ মারে কাসিম। ঝড়ে উপড়ে যাওয়া গাছের মতো মাটিতে পরে যায় শিখটি।

কাসিমের রক্ত আরও তেতে ওঠে। ফুটন্ত তেলে দু-এক ফোঁটা জলের ছিটে পড়লে যেমন ফট্‌ফট্ শব্দ হয়, কাসিমের অবস্থা অবিকল তাই।

খানিকটা দূরে, রাস্তার ওধারে নজরে এল চারজন দাঁড়িয়ে আছে। তির বেগে কাসিম তাদের সামনে ছুটে যেতেই তারা 'হর হর মহাদেব' বলে স্লোগান দিতে শুরু করল। কাসিম স্লোগানের উত্তরে, মা বোন তুলে কদর্য সব খিস্তি দিতে দিতে ওদের ওপর কুড়ুলের কোপ মারতে শুরু করল। দু-এক মিনিটের মধ্যে তিনজন মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পরে ছটফট করতে থাকে। একজন পালিয়ে বাঁচল। কাসিমের হাতে কুড়ুলটা তখনও শূন্যের ভিতরে হাওয়াকে কাটছে। চোখদুটো বন্ধ করেই এগিয়ে যাচ্ছিল কাসিম, শূন্যে অস্ত্রটা ঘোরাতে ঘোরাতে, একটা মৃতদেহে হোঁচট খেয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ে যায়। ওকে কেউ ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে মনে করে, আবার গালাগালি দেওয়া শুরু করে, চিৎকার করে বলে, 'মেরে ফেল, আমায় মেরে ফেল।'

তার ঘাড়ের ওপর কেউ থাবা বসাচ্ছে না, বা কেউ তাকে আঘাতও করছে না। চোখ খুলে তাকায় কাসিম। তিনটে লাশ আর সে ছাড়া রাস্তায় কেউ নেই।

মুহূর্তের জন্য কাসিমের মনে হয়, সে মরে গেলেই ভাল। শরিফন, শরিফনের উলঙ্গ দৃশ্যটা আবার মাথার ভিতর একটা জ্বলন্ত বারুদের গোলা হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে। কাসিম লাফিয়ে উঠে ধারালো অস্ত্র হাতে, আগ্নেয়গিরি হয়ে, ঘসটাতে ঘসটাতে বাজারের দিকে এগিয়ে যায়।

বাজারগুলো সব জনমানবশূন্য। এবার ঘুরতে ঘুরতে একটা গলির মধ্যে ঢুকে যায়। গলিটা মুসলমানদের এলাকা বুঝতে পেরে, জ্বালাপোড়া শরীর ও মনকে টেনে হিঁচড়ে অন্য দিকে নিয়ে যায়।

আরও একটা নির্জন বাজারে গিয়ে, শূন্যে কুড়ুল চালিয়ে মা-বোন তুলে খিস্তি আওড়াতে থাকে। হঠাৎ কাসিমের আফশোস হয়। কেন এতক্ষণ শুধু মা-বোন তুলে গালাগালি দিচ্ছে সে? তখন মেয়ে তুলেও অশ্রাব্য ভাষায় চিৎকার করতে থাকে। যত ধরনের নোংরা গালাগালি জানা ছিল সব এক নিশ্বাসে উগড়ে দিল। তবুও তার জ্বালা কমল না।

একটা বাড়ির কাছে গিয়ে কাসিম দেখল দরজার ওপর হিন্দি ভাষায় কিছু শব্দ লেখা আছে। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। উন্মাদের মতন কুড়ুল দিয়ে দরজায় ঘন ঘন আঘাত করতে থাকে সে। মিনিট খানেকের মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে যায় দরজাটা। বাড়িটা ছোট।

~ www.amarboi.com ~

ঢুকে যায় ভিতরে। শুকনো ঘরঘরে গলাতে জোর এনে চিৎকার শুরু করে, 'বাইরে আয়, বেরিয়ে আয় বলছি।'

সামনের বারান্দার দরজা চড় চড় শব্দ করে উঠল। কাসিম নিজের মনে খিস্তি দিয়েই চলেছে অবিরত। একটা মেয়ে বেরিয়ে আসে দরজা খুলে। কাসিম দাঁত কড়মড় করে জিজ্ঞাসা করে 'তুই কে?' শুকনো রক্তশূন্য ঠোঁট জিবে চেটে নিয়ে মেয়েটা উত্তর দেয়, 'হিন্দু।'

লোহার রডের মতন টানটান হয়ে গেল কাসিম। জ্বলন্ত কয়লার মত চোখ দিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটার বয়স চোদ্দ অথবা পনেরো হবে। হাত থেকে কুড়ুলটা পড়ে যায়। কাসিম বাজপাখি হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিশোরীর ওপর। ধাক্কা মেরে দালানের ভিতরে নিয়ে যায়। তারপর, উন্মত্ত হয়ে হিন্দু মেয়েটার জামা কাপড় ছিঁড়তে ছিঁড়তে এমন ভাবে ওড়াতে থাকে, যেন কোনও ধ্বংসকর শূন্যে তুলো ওড়াচ্ছে পিটিয়ে পিটিয়ে।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে প্রতিশোধ নেয় কাসিম। মেয়েটা বাধা দেয় না। বস্তুত আগেই মেঝেতে পড়ে চেতনা হারিয়েছে সে।

কাসিম চোখ খুলে দেখে, তার হাত দুটো শক্ত করে মেয়েটার গলা চেপে রেখেছে। এক ঝটকায় হাত দুটো আল্গা করে উঠে দাঁড়ায় সে। এক পলক দেখে, আরও কোনও প্রতিশোধ নেওয়া বাকি আছে কী?

এক গজ তফাতে এক কিশোরীর মৃতদেহ পরে আছে। একেবারে উলঙ্গ, ফর্সা নিটোল শরীর, ছোট ছোট দুটি স্তন জেগে আছে ছাদ বরাবর।

দুচোখ বুজে ফেলে কাসিম, দুহাতে মুখ ঢাকে সে, গরমে ঘাম বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে ঝরছে, তরল লাভা, যা রক্তের বদলে প্রবাহিত হচ্ছিল তার শরীরে খানিক আগে, কখন পাথর হয়ে জমে গেছে।

খানিকক্ষণ পরে তলোয়ার হাতে একটি লোক বাড়িটায় ঢোকে। লোকটি দেখতে পেল, আরেকজন চোখ বন্ধ করে কাঁপা কাঁপা হাতে একটা কম্বল ছুঁড়ে দিচ্ছে মেঝেতে পড়ে থাকা কিছু একটার ওপর। গর্জে উঠে জানতে চায়, 'কে তুমি?'

কাসিম চমকে ওঠে। চেনবার চেষ্টা করে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে। দেখতে পায় না কিছুই।

অস্ত্র হাতে লোকটি আবার চিৎকার করে, 'কাসিম'। কেঁপে ওঠে কাসিম, দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে চিনতে চায় সে, তার ঘোলাটে দৃষ্টি কিছুই দেখে না।

তলোয়ার হাতে লোকটি ভয় পেয়ে যায়। ফ্যাসফ্যাসে গলায় জিজ্ঞাসা করে, 'কী করছিস এখানে তুই?'

কাসিম মেঝেতে ঢাকা কম্বলটার দিকে কাঁপা কাঁপা তর্জনি তুলে ভূতে পাওয়া গলায় বলে, 'শরিফন—।'

দৌড়ে লোকটা কম্বল সরিয়ে নগ্ন লাশটি দেখে আঁতকে ওঠে। তার চোখ বন্ধ হয়ে যায়। হাত থেকে খসে পড়ে তলোয়ার। দু হাতের তালুতে মুখ ঢেকে টলতে টলতে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। যাবার সময় 'বিমলা... বিমলা' বলে বিড় বিড় করছিল সে।

আলোর পথে
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ভাষান্তর : তিয়াষা বল

~ www.amarboi.com ~

১৯১৯-এর একটি কাহিনি

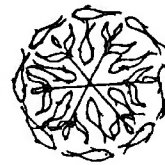

১৯১৯-এর সেই সব দিনের কথা বলছি দোস্ত, যখন রাউলাট আইনের বিপক্ষে মানুষের ক্ষোভ গোটা পঞ্জাব প্রদেশকে প্লাবিত করে তুলেছিল। আমি অমৃতসরের কথা বলছি। স্যার মাইকেল ডায়ার ভারত রক্ষা আইন বলে পঞ্জাবে মহাত্মা গান্ধীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। গান্ধীজির যাত্রাপথে তাঁকে পালোয়ালের কাছে আটকের পর গ্রেপ্তার করে বোম্বাইতে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমি যতটা অনুমান করতে পারি, ইংরেজরা যদি এই ভয়ানক ভুলটি না করত, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, যা কিনা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সবচেয়ে রক্তাক্ত অধ্যায় বলে চিহ্নিত, তা কখনোই ঘটত না।

হিন্দু হোক মুসলমান হোক বা শিখ হোক, সকলের ভিতরেই গান্ধীজির ছিল এক গভীর শ্রদ্ধার আসন। প্রত্যেকেই তাঁকে মহাত্মা—মহৎ মানুষ হিসেবে গ্রহণ করেছিল, সত্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ প্রাণ। যখন তাঁর গ্রেপ্তারের খবর লাহোরে পৌঁছল, সমস্ত কিছু স্তব্ধ হয়ে গেল। যখন অমৃতসরের মানুষ এই খবর শুনল, কয়েক মুহূর্তের ভিতরে সম্পূর্ণ এক ধর্মঘট গোটা নগরকে পঙ্গু করে দিল।

বলা হয় যে, ৯ এপ্রিলের সন্ধ্যার ভিতরেই ডঃ সত্যপাল এবং ডঃ কিচলুর জেলা থেকে বিতাড়নের আদেশ ডেপুটি কমিশনারের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার ওই আদেশ পালন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তার কারণ, যে ভাবেই হোক তিনি বুঝে গিয়েছিলেন অমৃতসরে দাঙ্গার ভয় বা আইন শৃঙ্খলার অবনতি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে নেই। জনসাধারণ তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করার জন্য শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করছে বটে, কিন্তু তার ভিতরে বিন্দুমাত্র হিংসার চিহ্ন নেই। বন্ধু, আমি আপনাকে বলছি আমার নিজের চোখে কী দেখেছিলাম সেই কথা। সেই ৯ এপ্রিল ছিল রামনবমী। প্রতিবারের মতো রামনবমীর শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। কিন্তু কোথাও সেই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের কেউ প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করার কথা ভাবেনি। কিন্তু স্যার মাইকেল ছিলেন উন্মাদ প্রকৃতির মানুষ। তিনি ডেপুটি কমিশনারের পরামর্শ শোনার প্রয়োজন বোধ করেননি। তিনি এব্যাপারে নিশ্চিত ভাবে বুঝে গিয়েছিলেন যে সেই

~ www.amarboi.com ~

সময়ের রাজনৈতিক নেতারা মহাত্মা গান্ধীর আদেশে এদেশের সাম্রাজ্যবাদী শাসন উৎখাত করতে নাছোড়বান্দা ছিলেন। আর এই নেতারা ছিলেন ধর্মঘট এবং শোভাযাত্রার পিছনে। সেই মস্ত ষড়যন্ত্রের অংশীদার ছিলেন তাঁরা।

ডঃ সত্যপাল এবং ডঃ কিচলুর বিতাড়নের খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। মানুষ যন্ত্রণাবিদ্ধ হল। নিদারুণ মর্মবেদনায় ভেঙে পড়ল। যে কোনও মুহূর্তে ভয়ানক কিছু ঘটতে পারে, তারা এমন এক আতঙ্কে আচ্ছন্ন হল। কিন্তু সেখানে এমন কেউ ছিল না, যে তাদের এই আতঙ্ক থামাতে পারে। দোকানপাট বন্ধ, শহরটি তখন এক কবরখানার মতো স্তব্ধ। কিন্তু সেই কবরখানার নীরবতার ভিতরে এক কোলাহল ভেসে ছিল। ডঃ সত্যপাল এবং ডঃ কিচলুর গ্রেপ্তারের খবর শহরে পৌঁছলে, সহস্রাধিক মানুষের জমায়েত হল, তারা যাবে ডেপুটি কমিশনারের কাছে, পেশ করবে তাদের প্রিয় নেতাদের ওপর থেকে বিতাড়নের আদেশ প্রত্যাহারের আবেদনপত্র। কিন্তু, তখন ওই আবেদনপত্র গ্রহণের সঠিক সময় ছিল না। মাইকেল ডায়ারের মতো অত্যাচারী ছিলেন তখন অমৃতসরের প্রশাসক। আবেদন গ্রহণ না করে তিনি রায় দিলেন যে জনতার সমাবেশ অসাংবিধানিক এবং আইন-বিরুদ্ধ!

অমৃতসর—যে-অমৃতসর ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের মহৎ কেন্দ্র, যে-নগর জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর ক্ষতচিহ্ন বুকের উপর পদকের মতো বয়ে গর্বিত, সেই নগরের দিকে এখন একবার ফিরে তাকান আপনি। থাক, ও কথা ছেড়ে দিই, ওসব কথা আমার বুকে ব্যথা আনে... লোকে বলে পাঁচ বছর আগে এই পবিত্র নগরে যা ঘটেছিল তার জন্য ইংরেজ দায়ী। তাই-ই হবে, কিন্তু আপনি যদি আমাকে সত্যের কথা বলতে বলেন, আমি বলব, এ ছিল আমাদের নিজেদের হাত যা রক্তাক্ত হয়েছিল এখানে, রক্ত ঝরিয়েছিল এখানে। যা হোক, ওসব থাক এখন।

ডেপুটি কমিশনারের বাংলো ছিল সিভিল লাইন্সে। সমস্ত বড় বড় অফিসার এবং তাদের সাঙ্গোপাঙ্গোরা এই নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করতেন। যদি আপনি অমৃতসর যান, দেখতে পাবেন মূল শহর আর সিভিল লাইন্সকে যোগ করেছে একটি সেতু। যদি যেতে হয় সেই স্বতন্ত্র নির্জন বসতিতে, যেখানে নগরের অভিজাত সম্প্রদায় তাদের এক খণ্ড স্বর্গ নির্মাণ করেছিল, আপনাকে সেতু পার হয়ে আসতে হবেই।

সিটি হলের দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে জনতা দেখল অশ্বারোহী গোরা সৈন্যরা সেতু পাহারা দিচ্ছে। তবু জনতা থামল না। শুনুন বন্ধু, আমিও সেই মিছিলের একজন ছিলাম। আমি বর্ণনা করতে পারব না, কী দুর্দম আবেগ প্রত্যেক মানুষের বুকের ভিতরে জেগে উঠেছিল। কিন্তু প্রত্যেক মানুষই ছিল নিরস্ত্র; তারা তাদের সঙ্গে একটি লাঠিও রাখেনি সেদিন। তারা তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছিল শুধু মাত্র একটি অনুরোধ ডেপুটি কমিশনারের কাছে নিয়ে যেতে, ডঃ সত্যপাল ও ডঃ কিচলুকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হোক। জনতা সেতুর দিকে এগোতে লাগল না-থেমে। গোরা সৈন্যরা গুলি বর্ষণ করল। তার ফলে আতঙ্কিত জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগল সেতুর দিকে। গোরাসৈন্যরা জনা বিশের বেশি ছিল না। মিছিলের মানুষ ছিল সহস্রাধিক, কিন্তু আপনি কল্পনা করতে পারবেন না, কী আতঙ্ক বুলেটে তৈরি হতে পারে, যে-উন্মত্ততা দেখা গিয়েছিল সেই সময়,

~ www.amarboi.com ~

তা না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। কিছু মানুষ বুলেটে বিদ্ধ হল, কিছু মানুষ পদপিষ্ট হয়ে পড়ে গেল।

বাম দিক দিয়ে একটি নোংরা নর্দমা বয়ে যাচ্ছিল, জনতার ধাক্কায় আমি সেই নর্দমায় পড়ে গেলাম। যখন গুলিবর্ষণ থামল, আমি নর্দমা থেকে উঠে এসে দেখি জনতা অন্তর্হিত। আহতরা রাস্তায় পড়ে রয়েছে আর গোরা সৈন্যরা তাদের দিকে চেয়ে হাসছে, পরিহাস করছে। শুনুন, সেই সময়ে আমার মনের যে অবস্থা হয়েছিল, তা আমি এখন বর্ণনা করতে পারব না। আমার সন্দেহ, আমি আমার পরিপূর্ণ চেতনার মধ্যে ছিলাম কিনা। যখন আমি নর্দমার ভিতরে পড়েছিলাম তখনও আমার জ্ঞান পুরোপুরি ছিল কিনা সন্দেহ। সময় গেলে আমি ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসেছি, যা ঘটেছিল তাও ক্রমশ থিতিয়ে যাচ্ছিল, আকার নিচ্ছিল।

দূর থেকে আমি কিছু মানুষের চিৎকার শুনতে পাই, তারা ক্রুদ্ধস্বরে, উঁচু গলায় পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিল। আমি নর্দমা পার হয়ে, পুণ্যবতী জাহিরার কবরের ধার দিয়ে টাউন হলের গেটে পৌঁছে গেলাম। সেখানে তিরিশ-চল্লিশজন যুবককে দেখতে পেলাম, তারা পাথর ছুঁড়ছিল টাউন হলের গেটে। যখন গেটের কাচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে রাস্তায় ছড়িয়ে গেল, একটি যুবক আর একজনকে বলল, চলো আমরা রানির মূর্তি ভাঙি।

অন্যজন বলল, না বরং আমরা কোতোয়ালি পুড়িয়ে দিই।

তৃতীয় একজন বলল, আর সমস্ত ব্যাঙ্কগুলোও।

চতুর্থ একজন বলল, দাঁড়াও, ওতে আর কী হবে? বরং, চলো আমরা ব্রিজের ওপরের গোরা সৈন্যদের মারি।

আমি চতুর্থজনকে চিনতে পারলাম। সে থাইলা কনজর। তার আসল নাম মহম্মদ তুফায়েল, কিন্তু সকলে তাকে থাইলা কনজর নামেই চিনত। সে এক বেশ্যার গর্ভে জন্মেছিল। সে কোনও কাজেরই উপযুক্ত ছিল না। খুব কম বয়স থেকেই মদ ও জুয়ায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল সে। তার দুটি বোন ছিল, সামশাদ ও আলমাস—তাদের সময়ের সবচেয়ে আদুরী বেশ্যা। সামশাদ খুব ভাল গান গাইত। ধনী অভিজাত ব্যক্তিরা তার গান শুনতে অনেক দূর থেকে এসে তার পাশে জড়ো হত। দুই বোন তাদের ভাইয়ের উচ্ছৃঙ্খল কাজের জন্য হতাশ হয়ে গিয়েছিল, শহরের সকলে জানত তারা তাদের ভাইকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। তবুও যে কোনও কারণে হোক, সে তার বোনদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ খিচে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। আর এটা শুধু কথাই নয়, সে ভাল খেত, ভাল মদ পান করত। সত্যি কথা বলতে কী, সে ছিল একটি ফুলবাবু। সুন্দর, হাসিখুশি একটি যুবক, কথা বলিয়েও। সে জানত কী করে কোনও কাহিনিকে ঘুরিয়ে দিতে হয়, ঠাট্টা তামাশাতেও তার জুড়ি ছিল না। তার চারপাশে তার মতো অশ্লীল কথা বলতে, খিস্তি করতেও তার জুড়ি কেউ ছিল না। শক্তপোক্ত দেহের এক লম্বা মানুষ। তার কাটা মুখখানিও ছিল সুন্দর।

উত্তেজিত যুবকরা তার কথায় মনোযোগ না দিয়ে রানির মূর্তির দিকে এগোয়। আবার

~ www.amarboi.com ~

থাইলা কনজর বলল, তোমাদের ভিতরের ক্রোধকে ওই ভাবে শেষ করে দিও না, আমার সঙ্গে এস, এস আমরা ওই শাদাগুলোকে খুন করে আসি, ওরা ক'জন নিরীহ মানুষের জীবন নিয়েছে, আর কতজনকে আহত করেছে বলো। উপরঅলার কৃপায় আমরা ইচ্ছে করলে ওদের গলা মুচড়ে ছিঁড়ে নিতে পারি, এস, আমার সঙ্গে এস।

কয়েকজন যুবক এর ভিতরেই আরম্ভ করে দিয়েছিল এগোতে; অন্যেরা দাঁড়িয়ে পড়ল। যখন থাইলা ব্রিজের দিকে চলতে শুরু করল, তারা তাকে অনুসরণ করে। আমি নিজের কাছে প্রশ্ন করলাম, এই সব দুর্ভাগা, গরিব যুবক কেন যে নিশ্চিত এক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে? আমি ফোয়ারার পিছনের লুকনোর জায়গা থেকে থাইলাকে ডেকে উঠলাম, খবদ্দার যেও না, কেন তুমি নিজেকে আর এইসব নিরীহ গরিবলোকগুলোকে শেষ করতে নিয়ে যাচ্ছো?

থাইলা আমার কথা শুনতে পেয়ে এক বিচিত্র হাসিতে হো হো করে ওঠে। বলল, 'থাইলা কেবলমাত্র প্রমাণ করতে চায় যে সে বুলেটকে ভয় পায় না।' তারপর সে জনতার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমরা যদি ভয় পাও, ফিরে যেতে পারো।'

যারা এগোতে শুরু করেছিল এক সঙ্গে, তারা কী করে ফেরে একসঙ্গেই, যখন তাদের নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল যে ব্যক্তিটি সে বুক চিতিয়ে ক্রমশ চরম বিপদের দিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছিল। যখন থাইলা তার হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিচ্ছিল, তার সঙ্গীদেরও তেমনই করতে হচ্ছিল।

টাউন হলের গেট থেকে ব্রিজের দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। ৬০—৭০ গজের বেশি হবে না কিছুতেই। সকলকে থাইলাই নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। দুজন শ্বেতাঙ্গ অশ্বারোহী সৈন্য ব্রিজের মুখে পৌঁছে গেল। আমার মনে হল, তারা একসঙ্গেই সেখানে পড়ে যাবে বোধহয়, কিন্তু আমি দেখতে পেলাম সে জীবিত, হেঁটেই চলেছে সমুখে। তার সঙ্গীরা ততক্ষণে পালাতে শুরু করে দিয়েছে, সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কেউ পালিয়ো না, আমার সঙ্গে এস।'

সে যখন আমার মুখোমুখি, তখন আবার একটি গুলির শব্দ শোনা যায়। সে শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের দিকে ঘুরে যায় পর মুহূর্তেই। তার হাত এবং পিঠ একসঙ্গেই ঘুরে গেল, দোস্ত, আমি আপনাদের বলতে পারি আমি কিছুই দেখিনি, কিন্তু আমি আপনাদের বলতে পারি আমি দেখেছিলাম শুধু তার শাদা শার্ট রক্তরঞ্জিত হয়ে গেছে। সে আহত সিংহের মতো লাফ দিল, তখনই আর একটি বুলেট তাকে বিদ্ধ করল। সে একটু টলে গেল, তারপর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে এনে লক্ষমাত্রায় অবিচল থেকে এক অশ্বারোহী সৈনিকের দিকে ছুটে গেল। চোখের পলক পড়ার ভিতরে দেখলাম, অশ্বপৃষ্ঠ শূন্য। শ্বেতাঙ্গ সৈনিকটি মাটিতে পড়ে আছে এবং থাইলা তাকে উপর থেকে চেপে ধরেছে। অন্য যে শ্বেতাঙ্গ অশ্বারোহী কাছেই ছিল, সে এই ঘটনায় হতবুদ্ধি হয়ে তার ভয়ার্ত ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরতেই সে মস্ত একটা লাফ দিল। সৈনিক বুলেট বর্ষণ করতে লাগল। আমি জানি না এরপর কী হয়েছিল। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফোয়ারার পাশে পড়ে যাই।

বন্ধু, যখন আমার জ্ঞান ফেরে, আমি বাড়িতে। পথচারীদের যারা আমাকে চিনত, তারা আমাকে বাড়িতে দিয়ে গিয়েছিল। তারা পরে আমাকে বলেছিল, ব্রিজের ওপর গুলিবর্ষণ

~ www.amarboi.com ~

জনতাকে উন্মত্ত করে তুলেছিল, তার ফলে রানির মূর্তি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। টাউন হল এবং তিনটি ব্যাঙ্কে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পাঁচ-ছ'জন ইউরোপিয়ানকে হত্যা করা হয়েছিল। লুঠপাট আর প্রচুর গোলমাল হয়েছিল।

ইংরেজ অফিসাররা ওই সব লুঠপাট আর হিংসাকে তোয়াক্কা করত না। জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তস্নান সংগঠিত হয়েইছিল ওই পাঁচ-ছ'জন ইউরোপিয়ান-হত্যার প্রতিশোধ নিতে। ডেপুটি কমিশনার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব জেনারেল ডায়ারের উপর অর্পণ করলেন এরপর। ১২ এপ্রিল জেনারেল শহরের বাজার এবং রাস্তার ভিতর দিয়ে সেনাবাহিনী মার্চ করিয়ে অসংখ্য নিরীহ মানুষকে গ্রেপ্তার করলেন। ১৩ এপ্রিল পঁচিশ হাজারের মতো মানুষ জালিয়ানওয়ালাবাগে জমায়েত হল। জেনারেল ডায়ার সশস্ত্র গোর্খা এবং শিখ বাহিনী নিয়ে পৌঁছে সেই সব নিরস্ত্র গরিব মানুষের উপর গুলি বর্ষণ করলেন।

কেউ বলতে পারবে না ঠিক কতজন মানুষ সেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগে নিহত হয়েছিল। পরে তদন্তে জানা গিয়েছিল, এক হাজার মানুষ হত হয়েছিল এবং তিন থেকে চার হাজার মানুষ আহত হয়েছিল ওই দিন। যাই হোক, আমি আপনাদের থালিয়ার সম্পর্কে বলছিলাম। বন্ধু, আমি আপনাদের বলছি নিজের চোখে যা দেখেছিলাম তাই-ই। একমাত্র সর্বশক্তিমান খোদাই সমস্তরকম পাপ থেকে মুক্ত এবং পবিত্র। মৃত থালিয়া ছিল শরিয়ত নিষিদ্ধ চারটি পাপের কারণে অপরাধী। সে এক পেশাদার দেহপোজীবিনীর গর্ভে জন্মালেও ছিল এক সাহসী পুরুষ। আমি আপনাদের নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি, সে শ্বেতাঙ্গ অশ্বারোহীর প্রথম গুলিতেই বিদ্ধ হয়েছিল। যখন সে ঘুরে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গীদের ডেকেছিল তাকে অনুসরণ করতে, মনে হয়, উত্তেজনার মুহূর্তে সে ধরতেই পারেনি একটি গরম সিসের বুলেট তার বুকে ঢুকে গেছে আগেই। দ্বিতীয় বুলেটটি তার পিঠে বিদ্ধ হয়, তৃতীয়টি আবার তার বুকে। আমি দেখিনি, কিন্তু পরে শুনেছি, যখন থাইলার দেহ শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের উপর থেকে তুলে আনা হচ্ছিল, তার দুই হাত মৃত সৈনিকটির গলা এত শক্ত করে আঁকড়ে ছিল যে একজন থেকে অন্যজনকে আলাদা করা কষ্টকর হয়ে উঠেছিল।

পরের দিন যখন থাইলার দেহ তার পরিবারের কাছে শেষকৃত্যের জন্য দেওয়া হল, তার দেহ ছিল গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা। অন্য সৈনিকটি তার তার সমস্ত গুলিই থাইলার জন্য খরচ করে ফেলেছিল। কিন্তু তখন থাইলার রুহ্ (আত্মা) তার দেহ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। শ্বেতাঙ্গ সৈনিকটি তার মৃত দেহের উপর লক্ষ্যভেদের অভ্যাসটি ঝালিয়ে নিয়েছিল মাত্র।

আমি শুনেছিলাম, যখন থাইলার দেহ তার বাড়িতে আনা হয়, প্রতিবেশীরা প্রবল কান্নায় চোখের জল ফেলতে থাকে। থাইলা প্রতিবেশীদের খুব পছন্দের মানুষ ছিল না, কিন্তু তার কিমা হয়ে যাওয়া শবদেহ দেখার পর তারা শিশুর মতো কাঁদতে থাকে। তার বোনেরা, শামসাদ এবং আলমাস, জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। যখন তার দেহ কবর দেওয়ার জন্য নিয়ে যেতে বাড়ি থেকে বের করা হয়, তাদের বিলাপ আর কান্নায় সমবেত শোকগ্রস্তরা রক্তের অশ্রুপাত করতে থাকে যেন।

~ www.amarboi.com ~

বন্ধু, আমি কোথাও যেন একবার পড়েছিলাম, ফরাসি বিপ্লবের সময় প্রথম গুলিটি এক বেশ্যাকে বিদ্ধ করেছিল। প্রয়াত মহম্মদ তুফায়েল এক বেশ্যার সন্তান ছিল। এই বৈপ্লবিক সংগ্রামে, সেই গুলিটি প্রথম অথবা দশম কিংবা পঞ্চাশতম কোনটি, তা খুঁজে দেখতে চেষ্টা করেননি কেউ। বোধহয় তার কোনও সত্যকার সামাজিক অবস্থান ছিল না, তাই। আমার মনে হয়, সেই রক্তস্নানে যাঁরা যাঁরা হত হয়েছিলেন, তাদের নামের তালিকার ভিতরেও থাইলা কনজরকে রাখা হয়নি। সেই কারণেই বলা যায় কেউই জানে না, এই ধরনের কোনও তালিকা কখনও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে কিনা।

সে সব দিনগুলি ছিল প্রবল জনবিক্ষোভের। সেনাবাহিনীর শাসন রেখে দেওয়া হয়েছিল অমৃতসরে। সেই দানব আইন, যাকে সামরিক আইন বলা যেতে পারে, তা শহরের রাস্তা আর সংলগ্ন অঞ্চলে গর্জন করে বেড়াতে লাগল। সেই সমস্ত রকমের গোলমালের সময়, দরিদ্র থাইলাকে দ্রুততার সঙ্গে খুব দৃষ্টিকটুভাবে কবর দেওয়া হল কারণ তার আত্মীয়দের কাছে এই মৃত্যু এতই লজ্জার ছিল যে তারা খুব তাড়াতাড়ি এই মৃত্যুর সমস্ত চিহ্ন মুছে দিতে চাইছিল।

'আর কী হল, বন্ধু, থাইলা মৃত, তাকে কবর দেওয়া হল...আর...আর'...এত সময়ে এই প্রথম আমার সঙ্গী মানুষটি তাঁর কাহিনি থামিয়ে দিলেন নিজেকে সংবরণ করে। নীরব হয়ে গেলেন। ট্রেন ছুটছিল। রেললাইন থেকে যেন স্বর উঠে আসতে লাগল, 'থাইলা মারা গেল...থাইলার কবর হল।' তার মৃত্যু এবং কবরে যাওয়ার ভিতরে কোনও ব্যবধান, কোনও অবকাশ, কোনও দূরত্ব বোধহয় ছিল না। সে এক মিনিটে মরেছিল, তারপরেই যেন তাকে কবরে পাঠানো হয়েছিল। রেলপথের সেই ক্রমাগত ঘর্ষণের শব্দের ভিতরে, সেই শব্দগুলির ভিতর থেকে উৎসারিত ছন্দ আমাকে এমন এক অনুভূতির ভিতরে নিয়ে যায় যে ওখানে থেকে সরে আসার জন্যই আমি আমার সহযাত্রীকে বলি, 'আপনার আরও যেন কিছু বলার ছিল, যখন আপনি থামলেন।'

চমকে উঠে তিনি আমার মুখোমুখি হলেন, 'হ্যাঁ সত্যি, এখনও এক ভয়ানক অংশ বাকি রয়ে গেছে ওই কাহিনির।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী?'

তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, 'আমি আপনাকে বলেছি, থাইলার দুটি বোন ছিল, সামশাদ আর আলমাস। তারা ছিল আশ্চর্য সুন্দরী। সামশাদ ছিল দীর্ঘাঙ্গী, চাবুকের মতো শরীর, বড় বড় দুটি চোখ। সে ঠুংরি গাইত চমৎকার। লোকে বলত, সে খান সাহেব ফতে আলি খানের কাছে তালিম নিয়েছিল। অন্যজন, আলমাস, গানের একটি স্বরও জানত না, কিন্তু তার পায়ের সঙ্গে তাল মেলানোর কেউ ছিল না সেই শহরে। সে যখন নাচতে আরম্ভ করত, মনে হত তার দেহের প্রতি রন্ধ্র, তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ যেন জীবন্ত হয়ে উঠতে। নৃত্যের প্রতি মুদ্রা নিয়েই বহু কথা বলা যায়। তার চোখদুটিতে এমন এক জাদু ছিল যে আপনাকে তা মোহমুগ্ধতায় এলোমেলো করে দিতে পারে।'

~ www.amarboi.com ~

সহযাত্রী সেই দুই কন্যার রূপ আর গুণ বর্ণনায় মগ্ন হয়ে গেলেন, মনে হল তাঁর কথায় বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। অবশেষে, তিনি তাঁর দীর্ঘ প্রশস্তি-বাণী থেকে বেরিয়ে এলেন, তারপর প্রবেশ করলেন এই কাহিনির সবচেয়ে বিষাদময় অংশে।

'বন্ধু, সেই ঘটনা যে ভাবে ঘটেছিল বলছি। কয়েকজন মোসায়েব জাতীয় লোক ইংরেজ অফিসারদের কাছে গিয়ে থাইলার ওই সুন্দরী বোনদুটির কথা বলে। একজন ইংরেজ রমণী সেই দাঙ্গায় নিহত হয়েছে... কী নাম ছিল সেই ডাকিনির?...মিস...মিস শেরউড! তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত হয়ে গেল দুই বোনকে নিয়ে এসে বড় প্রতিহিংসা নেওয়া হবে। আপনি কি বুঝতে পারছেন কী ভাবে তা হবে, পারছেন না?'

আমি বললাম, 'পারছি।'

আমার সহযাত্রী দীর্ঘ শ্বাস নিলেন, বলতে লাগলেন, 'কোনও কোনও সূক্ষ্ম ব্যাপারে, বেশ্যা, বারাঙ্গনাদের মা কিংবা বোন হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু বন্ধু, কখনও কখনও মনে হয় আমাদের দেশের মানুষের সমস্ত রকম লাজ-লজ্জার অনুভূতি শেষ হয়ে গেছে। যখন উপর থেকে আদেশ নীচে পৌঁছে গেল, থানেদার নিজেই সঙ্গে সঙ্গে রাজি হল যেতে। সে দুই বোনের বাড়ি গিয়ে তাদের বলল, ইংরেজ সায়েব তাদের নাচ আর গান করতে ডেকে পাঠিয়েছে। বোনদের ভাইয়ের কবরের মাটি তখনও কাঁচা। মাত্র দুদিন হল সে মারা গেছে যখন এই আদেশ এল : এস, এসে আমাদের সামনে নাচ দেখাও—এর চেয়ে কি আর কোনও উপায় ছিল তাদের হৃদয়কে বিদ্ধ করতে? আমার সন্দেহ আছে এর চেয়ে চরম কোনও নিষ্ঠুরতার উদাহরণ থাকতে পারে কিনা। তারা কি এমন কোনও নির্দেশ পাঠিয়েছিল যে বেশ্যাদেরও কোনও আত্মমর্যাদা থাকতে পারে তা বিবেচনা করার কোনও প্রয়োজন নেই? তারা তো পারত এমন নির্দেশ দিতে, পারত না কি?'

সহযাত্রী নিজেকেই যেন জিজ্ঞেস করছিলেন এই প্রশ্নটি আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা কি গিয়েছিল?'

সহযাত্রী একটু সময় নিয়ে বিষণ্ণ হয়ে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, গিয়েছিল...আর ওরা সেজেগুজে মরতেই যেন গিয়েছিল।'

আচমকা তাঁর বিষাদময় কণ্ঠস্বর বুঝি তীব্র এক ব্যঙ্গের রূপ নিল, 'তারা তাদের আঁখি পল্লব, ভ্রূ এঁকে চলল। লোকে বলে, এটা একটা বড় ঘটনা নিশ্চয়ই, দুই বোন তাদের জীবনের সবচেয়ে ভাল সময়ে পৌঁছে গিয়েছিল তখন। সুন্দর পোশাকে তাদের তখন রূপকথার রাজকন্যার মতো লাগছিল। জলের মতো মদ গড়িয়ে যাচ্ছিল সেই সভায়। লোকে বলে, রাত দুটোর সময়, যখন একজন উচ্চপদস্থ অফিসার অনুষ্ঠান শেষ করতে ইঙ্গিত করলেন, সেই আনন্দ অনুষ্ঠান শেষ হয়ে এল।'

সহযাত্রী উঠে দাঁড়ালেন, দ্রুত পিছন দিকে ছুটে যাওয়া গাছগুলিকে দেখতে লাগলেন জানালায় দাঁড়িয়ে। তাঁর শেষ দুটি বাক্য যেন ট্রেনের চাকা আর রেল লাইনের ভিতর থেকে ওঠা সুরের সঙ্গে মিশে গিয়ে নাচতে লাগল, 'শেষ হয়ে এল, শেষ হয়ে এল, শেষ হয়ে এল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাথার ভিতরে ঘটে যাওয়া বাক্যগুলির অভিঘাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর কী হল?'

পিছন দিকে ছুটে যাওয়া গাছ আর টেলিগ্রাফের পোস্টগুলো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে তিনি দৃঢ় গলায় বললেন, 'তারা সেই কন্যাদের সুন্দর পোশাক টেনে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল, ইংরেজ অফিসারদের সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে তারা দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "আমরা থাইলার বোন—সেই শহিদের বোন আমরা। যাকে তোমরা গুলিতে ঝাঁঝরা করে মেরে ফেলেছ শুধু মাত্র তার এমন একটা হৃদয় ছিল যে তার দেশকে ভালবাসত। আমরা দুজন তার সুন্দর দুটি বোন। এস,আমাদের এই সুরভিত দেহকে তোমাদের কামনার গলন্ত সিসে দিয়ে কলঙ্কিত করে দাও, কিন্তু তার আগে একবার তোমাদের মুখে থুতু ছিটাতে দাও—একবার।"

এই কথার পরে মানুষটি চুপ করে গেলেন। তিনি আর কোনও কথাই বললেন না। আমি তখনই জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল তারপর?'

তাঁর চোখে জল এসে গেল, তিনি বললেন, 'তারা গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হল।'

আমি আর কিছুই বললাম না। ট্রেনের গতি ক্রমশ কমে আসছিল স্টেশনে থামবে বলে। তিনি একটি কুলিকে ডাকতে লাগলেন তাঁর বাক্সপেটরা নিয়ে যাওয়ার জন্য। যখন তিনি ট্রেন ছাড়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন, আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে আপনি এই কাহিনির শেষটা নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছেন।'

চমকে উঠে তিনি ঘুরে তাকালেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করে আপনি বুঝলেন?'

আমি বললাম, 'আপনার কণ্ঠস্বরের ভিতরে এক গভীর যন্ত্রণার ছায়া ছিল।'

তাঁর মুখের ভিতরের তিক্ত হয়ে যাওয়া লালা আর থুতু কোনও রকমে গিলে, আমার সহযাত্রী বললেন, 'হ্যাঁ, সেই কুক্কুরীরা...', তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে অশ্লীল উচ্চারণের থেকে বিরত হলেন, বললেন, 'তারা তাদের শহীদ ভাইয়ের নাম কলঙ্কিত করেছিল।' বলতে বলতে তিনি ট্রেন থেকে নেমে গেলেন।

ভাষান্তর : অমর মিত্র

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঠান্ডা গোস্ত

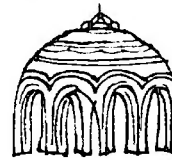

ঈশ্বর সিং হোটেলের ঘরে ঢুকতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল কুলবন্ত কাউর। ধারালো চোখে তার দিকে তাকিয়ে দরজা বন্ধ করল কুলবন্ত। মধ্যরাত্রি পেরিয়ে গেছে। এক অদ্ভুত রহস্যময় নীরবতায় ডুবে আছে শহরের আশপাশের অঞ্চল।

কুলবন্ত হাঁটু ভাঁজ করে বিছানায় গিয়ে বসল। ঈশ্বর সিং সম্ভবত তার জট-পাকানো ভাবনাগুলোর গিঁট খোলার চেষ্টা করছিল। কৃপাণ হাতে সে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত নীরবে পার হয়ে গেল। বসতে যেন অস্বস্তি হচ্ছিল, তাই কুলবন্ত কাউর বিছানার ধারে এসে পা দুটো নামিয়ে দোলাতে লাগল। ঈশ্বর সিং তখনও চুপ।

কুলবন্ত কাউর বেশ শক্তপোক্ত মহিলা। চওড়া, গোলালো নিতম্ব, অস্বাভাবিক বড় স্তন আর ধারালো চোখ। তার ঠোঁটের ওপরে হাল্কা গোঁফের নীলচে আভা। চিবুকের গড়ন দেখে তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

ঈশ্বর সিং তখনও মাথা নিচু করে এক কোণে দাঁড়িয়ে। তার মাথার আঁটোসাঁটো পাগড়ি বেশ ঢিলে হয়ে গেছে। কৃপাণ-ধরা হাতটা কাঁপছে। তবু তার শারীরিক গঠন ও দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকে স্পষ্ট, সে-ই কুলবন্ত কাউরের জন্য যথার্থ পুরুষ।

আরও কিছু মুহূর্ত নীরবে কেটে যাওয়ার পর কুলবন্ত কাউর সহ্য ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। তার দুই চোখ প্রবল ভাবে ঘুরছিল, তবে একটা কথাই মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'ঈশ্বর সিয়াঁ!'

মাথা তুলে ঈশ্বর সিং তাকানোর চেষ্টা করল, কিন্তু কুলবন্ত কাউরের জ্বলন্ত দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে চোখ ফিরিয়ে নিল।

কুলবন্ত কাউর চেঁচিয়ে উঠল, 'ঈশ্বর সিয়াঁ।' পরক্ষণেই গলার স্বর নিয়ন্ত্রণে এনে তার কাছে গিয়ে জিগ্যেস করল, 'ক'দিন কোথায় ছিলে তুমি?'

শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে ঈশ্বর সিং বলল, 'জানি

ক্ষেপে উঠল কুলবন্ত কাউর। 'মানে? এটা কোনও উত্তর হল?'

ঈশ্বর সিং তার কৃপাণ ছুঁড়ে ফেলে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

~ www.amarboi.com ~

দেখে মনে হয়, গত কয়েকদিন ধরে সে অসুস্থ। বিছানায় চিত হয়ে থাকা ঈশ্বর সিংয়ের দিকে তাকাল কুলবন্ত কাউর। তার মন নরম হল, ঈশ্বর সিংয়ের কপালে হাত রেখে জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে, জানি? কোনও ঝামেলা?'

সিলিংয়ের দিকে তাকানো ঈশ্বর সিংয়ের চোখ কুলবন্ত কাউরের দিকে ফিরল, তার চোখের ভাষায় করুণা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। 'কুলবন্ত।'

তার কণ্ঠস্বরে স্পষ্টতই যন্ত্রণা। কুলবন্ত কাউরের অস্তিত্ব যেন তার ওপরের ঠোঁটে এসে নিবদ্ধ হল। ঠোঁট কামড়ে সে বলল, 'বলো, জানি।'

পাগড়ি খুলে ঈশ্বর সিং আবার তার দিকে তাকাল—তার চোখ খুঁজে ফিরছে সহমর্মিতা ও সাহায্য। এবার কুলবন্তের মাংসল পাছায় চাপড় মেরে সে মাথা ঝাঁকিয়ে এমন ভাবে কথা বলল, যেন নিজেকেই সে বলছে, 'আমি পাগল হয়ে গেছি।'

ঝাঁকুনিতে ঈশ্বর সিংয়ের দীর্ঘ চুল ছড়িয়ে পড়ল। কুলবন্ত কাউর তার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে অন্তরঙ্গ হয়ে বলল, 'ঈশ্বর সিয়াঁ, এ-ক'দিন তুমি কোথায় ছিলে?'

'আমার দুশমনের মায়ের সঙ্গে বিছানায়।'

ঈশ্বর সিং তার দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই কুলবন্তের স্তন টিপতে শুরু করল। 'কসম ওয়াহে গুরু কি, বড় জানদার মেয়েছেলে তুমি।'

কুলবন্ত কাউর তার হাত এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে জিগ্যেস করল, 'তুমহে মেরি কসম, কোথায় ছিলে, আমাকে বলো। শহরে গিয়েছিল?'

ঈশ্বর সিং তার চুল গোছ করতে করতে বলল, 'না।'

কুলবন্ত কাউর তেতে উঠল। 'শহরেই ছিলে তুমি। নিশ্চয়ই অনেক টাকা লুঠ করেছ, এখন আমার কাছে লুকোতে চাইছো।'

'মিথ্যে বললে আমি আমার বাপের পুত্তর না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কুলবন্ত কাউর আবার জ্বলে উঠল, 'সেই রাতে তোমার কী হয়েছিল? বিছানায় আমার পাশেই তো রোজকার মতো শুয়েছিলে। শহর থেকে লুঠ করে আনা সব গয়না আমাকে পরিয়েছিলে। চুমু খেতে খেতে হঠাৎই তোমার মাথায় কী ভর করল। ভগবানই জানেন! সঙ্গে সঙ্গে জামাকাপড় পরে তুমি বেরিয়ে গেলে।'

ঈশ্বর সিং ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আর তা দেখতে পেয়ে কুলবন্ত কাউর আরও ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'এমন হলুদ হয়ে গেলে...ঈশ্বর সিয়াঁ। ওয়াহে গুরুর-নামে দিব্যি, কিছু একটা গণ্ডগোল আছে।'

'তোমার দিব্যি, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না।'

কিন্তু তার কথা বলার ধরনে প্রাণ নেই ; কুলবন্ত কাউরের সন্দেহ তাতে আরও বেড়ে গেল। ওপরের ঠোঁট কামড়ে সে বলল, 'আট দিন আগে যে-মানুষ তুমি ছিলে, এখন তা নও, ঈশ্বর সিয়াঁ। কেন?'

কেউ যেন তাকে আক্রমণ করেছে সে-ভাবেই লাফিয়ে উঠল ঈশ্বর সিং। কুলবন্ত কাউরকে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল। 'জানি, আমি একই আছি। আরও জোরে চেপে ধরো, হাড়ের ভিতরের আগুন তাহলে ঠাণ্ডা হবে।'

~ www.amarboi.com ~

কুলবন্ত কাউর তাকে বাধা দিল না। কিন্তু তার মুখ থেকে বারবার একই অভিযোগ শোনা গেল। 'সে-রাতে তোমার কী হয়েছিল, বলো।'

'দুশমনের মায়ের কাছে গেছিলাম।'

'তার মানে আমাকে তুমি বলবে না?'

'কী বলব? বলার কিছু আছে নাকি?'

'মিথ্যে বললে, তুমি আমাকে নিজের হাতে পোড়াবে।'

কুলবন্ত কাউরের কাঁধ জড়িয়ে ধরে ঈশ্বর সিং তার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। তার গোঁফ কুলবন্তের নাকে ঢুকে পড়ায় সে হাঁচতে শুরু করল। তারপর দুজনেই হাসিতে ফেটে পড়ল।

কামনাঘন চোখে কুলবন্ত কাউরকে দেখতে দেখতে ঈশ্বর সিং তার জহর কোট খুলে ফেলে। 'এসো, তাসের বাজি হয়ে যাক।'

কুলবন্ত কাউরের ওপরের ঠোঁটে কয়েক বিন্দু ঘাম। সে চোখ নাচিয়ে আদুরে গলায় বলল, 'জাহান্নামে যাও।'

কুলবন্তের চওড়া, গোলালো পাছায় চিমটি কাটল ঈশ্বর সিং। সে এক পাশে সরে গিয়ে বলল, 'এমন করো না, ঈশ্বর সিয়াঁ, ব্যথা লাগে।'

ঈশ্বর সিং আরও কাছে এসে কুলবন্ত কাউরের ঠোঁট চুষতে লাগল। কুলবন্ত নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ঈশ্বর সিং জামা ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'এসো, তুরুপের চাল দিই তবে...।'

কুলবন্ত কাউরের ওপরের ঠোঁট কাঁপতে লাগল। কুলবন্তের শরীর থেকে পোশাক খুলে ফেলে ঈশ্বর সিং তার নগ্ন শরীর চোখ দিয়ে চাটছিল। কুলবন্তের হাতে চিমটি কেটে সে বলল, 'কসম ওয়াহে গুরু কি, কুলবন্ত, বড় কঠিন মেয়েছেলে তুমি...।'

হাতে রক্ত জমে যাওয়ার চিহ্ন দেখে কুলবন্ত কাউর বলল, 'তোমার মতো নিষ্ঠুর অত্যাচারী হয় না।'

ঈশ্বর সিংয়ের ঘন গোঁফের আড়ালে মৃদু হাসি দেখা গেল। 'তাহলে আজ অত্যাচারই হোক।' আরও বেশি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হল সে—কুলবন্তের ওপরের ঠোঁট, কানের লতি কামড়াতে লাগল, ভারী বুক দোমড়াতে-মোচড়াতে লাগল, পাছায় নাগাড়ে চাপড় মারতে থাকল। জোর করে চুমু খেতে লাগল, স্তন চুষতে চুষতে লালায় ভিজিয়ে তুলল। কুলবন্ত কাউরের ভিতরে কামনার অগ্নিশিখা—কেটলির জল ফুটছে। কিন্তু এত সব সুরত ঈশ্বর সিংয়ের কামনায় আগুন জ্বালাতে পারল না। পরাজিত মুষ্টিযোদ্ধার মতো সব চেষ্টা চালিয়েও সে ব্যর্থ। কুলবন্ত কাউরের শরীরের প্রতিটি স্নায়ু তখন কাঁপছে আর ঈশ্বর সিং ঝোঁপে অনর্থক লাঠি চালিয়ে যাচ্ছে। কুলবন্ত কাউর কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'ঈশ্বর সিয়াঁ, তাস তো অনেক ভাঁজলে এবার তুরুপের দান দাও।'

ঈশ্বর সিংয়ের মনে হল, হাতের সব তাসগুলোই মেঝেতে পড়ে গেছে। হাঁফাতে হাঁফাতে সে কুলবন্ত কাউরের পাশে শুয়ে পড়ল, তার কপালে ঠাণ্ডা ঘামের আস্তরণ।

~ www.amarboi.com ~

তাকে উত্তেজিত করার সব চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল কুলবন্ত কাউর। এইসব নীরব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর কুলবন্ত কাউরের শরীর যখন অতৃপ্ত, বিরক্তিতে তার মন তেতো হয়ে গেল। চাদর দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে সে হিসহিস করে উঠল, 'কোন কুত্তির সঙ্গে এই ক'টা দিন তুমি কাটিয়েছ? সে তোমাকে ছিবড়ে বানিয়ে ছেড়েছে।'

ঈশ্বর সিং একই ভাবে শুয়েছিল, নীরব আর হাঁফাচ্ছিল।

কুলবন্ত কাউর রাগে ফুটছে, 'বলো আমাকে, কুত্তিটা কে... তোমার নাঙ, তোমার তুরুপ, তাই না?'

ঈশ্বর সিং দুর্বল স্বরে বলতে পারল, 'কেউ না কুলবন্ত। বিশ্বাস করো, কেউ না।'

নিজের চওড়া পাছায় হাত রেখে কুলবন্ত কাউর বলল, 'আজ আমাকে সত্যিটা জানতেই হবে। ওয়াহে গুরুর নামে দিব্যি করে বলো, মেয়েছেলেটা কে?'

ঈশ্বর সিং কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু কুলবন্ত কাউর তাকে থামিয়ে দিল, 'দিব্যি করার আগে মনে রেখো, আমি সরদার নিহাল সিংয়ের মেয়ে। মিথ্যে বললে তোমাকে কিমা করে ছাড়ব। এবার দিব্যি করে বলো যে এসবের পেছনে কোনও মাগি নেই।'

বিষণ্ণ ঈশ্বর সিং মাথা নাড়াল। কুলবন্ত কাউর যেন পাগল হয়ে গেছে। বিছানা থেকে নেমে সে কৃপাণ হাতে তুলে নিল, কলার খোসা ছাড়ানোর মতো খাপ থেকে কৃপাণ বার করে ঈশ্বর সিংয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পর মুহূর্তেই ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোল। তবু কুলবন্ত কাউর শান্ত হল না। সে বুনো বিড়ালীর মতো ঈশ্বর সিংয়ের চুল টানতে টানতে সেই অন্য মেয়েছেলেটিকে অকথ্য খিস্তি দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পর, ঈশ্বর সিং মিনতির সুরে বলল, 'ভুলে যাও কুলবন্ত, ভুলে যাও।' তার কণ্ঠস্বরে হৃদয়-ভাঙা আবেদন। কুলবন্ত কাউর পিছিয়ে গেল।

ঈশ্বর সিংয়ের থুতনির ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছিল, ভিজে যাচ্ছিল দাড়ি। কুলবন্ত কাউরের দিকে আর্ত, তীব্র চোখে তাকিয়ে সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'মেরি জান, তুমি বড় তাড়াতাড়ি করছো...যা হয়েছে ঠিকই হয়েছে...।'

হিংসায় কুলবন্ত কাউর আবার জ্বলে উঠল। 'আমি জানতে চাই, কে তোমার দুশমনের মা?'

রক্তের ধারা ঈশ্বর সিংয়ের ঠোঁট পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, নিজের রক্তের স্বাদ পেয়ে শরীরে ঠান্ডা কাঁপুনি অনুভব করল সে। 'আমি? এই কৃপাণ দিয়ে আমি ছ'জনকে মেরেছি। যার সঙ্গে তুমি...তাকেও...'

কুলবন্ত কাউরের মাথায় ভর করে আছে অন্য মেয়েছেলে। 'আবার তোমাকে জিগ্যেস করছি—কুত্তিটা কে?'

ঈশ্বর সিংয়ের চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎই তার চোখ জ্বলে উঠল, সে বলল, 'ওকে কুত্তি বোলো না।'

কুলবন্ত কাউর চেঁচিয়ে উঠল, 'মেয়েছেলেটা কে?'

ঈশ্বর সিংয়ের শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল। গলায় হাত দিয়ে গরম রক্ত স্পর্শ করে সে মৃদু হাসল। 'বলছি। সব ব্যাটাছেলে আসলে মাদারচোদ।'

~ www.amarboi.com ~

কুলবন্ত কাউর উত্তরের অপেক্ষা করছিল। 'ঈশ্বর সিয়াঁ, আসল কথায় এসো।'

গোঁফের পিছনে ঈশ্বর সিংয়ের হাসি আরও বড় হয়ে উঠল। 'হ্যাঁ, আসল কথায় আসছি। তুমি আমার গলায় ছুরি চালিয়েছ। সব কথাই তোমাকে বলব। তবে আস্তে আস্তে।'

তার মাথায় ঠাণ্ডা ঘামের স্রোত। সে কথা শুরু করল, 'কুলবন্ত, মেরি জান, কী যে হয়ে গেল, আমি তোমাকে বলতে পারব না। সব মরদ আসলে মাদারচোদ। শহরে লুঠতরাজ চলার সময় আমিও তাদের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। সেসব টাকা আর গয়না আমি তোমাকে দিয়েছি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলতে পারিনি।'

ক্ষতের যন্ত্রণায় ঈশ্বর সিং গোঙাতে লাগল। কুলবন্ত কাউর সেদিকে নজর না দিয়ে বলল, 'কী?'

দাড়ি থেকে কয়েকবিন্দু রক্ত ঝেড়ে ফেলল ঈশ্বর সিং, 'যে বাড়ি ভেঙে আমরা ঢুকেছিলাম...ওখানে সাতজন ছিল...আমি...আমি ছ'জনকে মেরেছি...ওই...ওই কৃপাণটা দিয়ে...ভুলে যাও...শোনো...ওখানে একটা মেয়ে ছিল...খুব সুন্দর...আমি ওকে তুলে নিয়ে গেলাম...'

কুলবন্ত কাউর মন দিয়ে কথা শুনছিল। ঈশ্বর সিং আবার দাড়ি থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত ঝেড়ে ফেলল। 'জানি, কী করে তোমাকে বলব...মেয়েটা যে কী সুন্দর ছিল। ওকে মেরে ফেলতে পারতাম—কিন্তু—নিজেকেই বললাম, ঈশ্বর সিয়াঁ, তুমি তো কুলবন্ত কাউরকে রোজ ভোগ করো...আজ নতুন খাবার পেয়ে চেখে দেখো।'

কুলবন্ত কাউর গরগর করে উঠল, 'বুঝেছি।'

'ওকে পিঠে চাপিয়ে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। পথে...কী বলছিলাম বলো তো? হ্যাঁ, যেতে যেতে, খালের পাশে ঝোপের আড়ালে মেয়েটাকে শুইয়ে দিলাম...প্রথমে ভেবেছিলাম...একটু তাস ভেঁজে নেব...তারপর...ঠিক করলাম...।'

কুলবন্ত কাউর থুতু দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল, 'বলে যাও...।'

ঈশ্বর সিং সবে বলতে শুরু করেছে, 'আমি...হ্যাঁ আমি তুরুপ ছুঁড়লাম, কিন্তু...' তার গলা গভীর খাদে হারিয়ে গেল।

কুলবন্ত কাউর উন্মত্তের মতো তাকে ঝাঁকাতে লাগল, 'তারপর?'

চেষ্টা করে চোখ খুলে ঈশ্বর সিং রাগে কাঁপতে থাকা কুলবন্ত কাউরের দিকে তাকাল।

'মেয়েটা...মেয়েটা মরে গিয়েছিল...মুর্দা...একেবারে ঠান্ডা গোস্ত। জানি, তোমার হাত ধরতে দাও।'

ঈশ্বর সিংয়ের হাতে হাত রাখল কুলবন্ত কাউর। লোকটার হাত বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা।

ভাষান্তর : রবিশংকর বল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একশো মোমবাতির আলোয় উজ্জ্বল একটা বাল্ব

কাইজার পার্কের বাইরের চৌরাস্তায় যেখানে কয়েকটা টাঙ্গা খদ্দের ধরার জন্যে দাঁড়িয়েছিল, সেইখানে একটা লাইটের থামে হেলান দিয়ে সেও দাঁড়িয়েছিল, আর ভাবছিল তার চারপাশে সবকিছুই কেমন একটা পরিত্যক্ত চেহারা নিচ্ছে একটু একটু করে।

দুবছর আগেও এই পার্কটা কত প্রাণবন্ত ছিল আর আজ যেন এক ফেলে যাওয়া পোড়ো জমি। একদিন যেখানে আকর্ষণীয় ফ্যাশন-দুরস্ত পোষাকে নারীপুরুষদের দেখা যেত ঘুরে বেড়াতে, আজ সেখানে জঘন্য নোংরা ন্যাতার মত কাপড়চোপড় পরা লোকজনকে দেখা যায় উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাজারে একটা ভিড় আছে ঠিকই, কিন্তু তার না আছে কোনও রং না কোনও উদ্দীপন। বাজারটাকে ঘিরে যে সিমেন্টের বাড়িগুলো তাদের সমস্ত ঔজ্জ্বল্য আজ মুছে গেছে, একে অপরের দিকে অপলক চেয়ে থাকে তারা, মুখ হাঁ করে, শূন্য দৃষ্টিতে, বিধবা মেয়েছেলেদের মতো।

এই বিবর্ণতা তাকে অসহায় করে। কোথায় মুছে গেল নববধূর সিঁদুর? কোথায় গেল সেইসব অসামান্য ধুন, সেই সমস্ত সুর যা সে শুনত এইখানে দাঁড়িয়ে? শেষবার যখন সে এসেছিল এখানে, খুব বেশি দিনের কথা তো নয়—দু বছর তো এমন কিছু দীর্ঘ সময় নয়—যখন আরও বেশি মাইনের লোভ দেখিয়ে কলকাতা থেকে তাকে এতদূরে নিয়ে এসেছিল একটা বেসরকারি কোম্পানি। কাইজার পার্কে একটা বাসা ভাড়া নেওয়ার জন্যে কী কষ্টই না সে করেছিল, অথচ হাজার চেষ্টা করেও শেষ অবধি কোনও সুরাহা করতে পারেনি!

কিন্তু এখন, এমনকি কোনও মুচি, কোনও নাপিত, কোনও তাঁতি, যারই ইচ্ছে হবে সটান এসে ঢুকে পড়ে দখল করে নিতে পারবে এই ফ্ল্যাটের ফাঁকা ঘরগুলো।

আগে যেখানে একটা ফিল্ম কোম্পানির ঝাঁ চকচকে অফিস ছিল, এখন সেখানে তোলা উনুন জ্বলছে। এ-শহরের সবচেয়ে চৌখশ লোকেরা যেখানে ভিড় জমাত, এখন সেখানে ধোপা তার নোংরা জামাকাপড় কাচছে। মাত্র দুবছরের মধ্যে কী সাংঘাতিক বিপ্লব ঘটে গেছে!

সে অবাক হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এই বিপ্লব কেন ঘটেছিল, কী কারণে ঘটেছিল, সবই সে ভালই জানত। খবরের কাগজ আর তার যেসব বন্ধুরা শেষ অবধি থেকে গিয়েছিল

~ www.amarboi.com ~

তারাই তাকে জানিয়েছিল, কী ঝড় বয়ে গেছে শহরটার ওপর দিয়ে। তবু তার অবাক লাগছিল এই ভেবে যে, কী অদ্ভুত ছিল এই ঝড়টা, যে বাড়িগুলোর সব রং আর জৌলুস এইভাবে শুষে নিল। পুরুষ পুরুষকে খুন করেছে, মেয়েদের ধর্ষণ করেছে, তাই বলে কাঠ আর সিমেন্টের বাড়িগুলোরও একই দশা তারা করল কী করে?

সে শুনেছিল, মেয়েদের একদম উদোম ন্যাংটো করে দিয়েছিল এই ঝড়টা। তাদের স্তন কেটে টুকরো করে দিয়েছিল। তার চারপাশের সবকিছু এখন, সেইসব মেয়েদের মতই নগ্ন আর যৌনতাহীন মনে হচ্ছিল।

লাইটের থামে হেলান দিয়ে সে একা বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছিল যে তাকে নতুন একটা বাসার খোঁজ দেবে বলেছে। কাইজার পার্কের বাইরে টাঙ্গা স্ট্যান্ড-এর কাছেই তাকে অপেক্ষা করতে বলেছিল বন্ধুটি।

দুবছর আগে যখন সে এসেছিল, এই টাঙ্গা স্ট্যান্ডটাই ছিল এ-শহরের সবচেয়ে বড় আর ব্যস্ততাম স্ট্যান্ড। সব থেকে শৌখিন আর সাজানো গোছানো টাঙ্গা এইখানেই পাওয়া যেত! কেননা এটাই সেই জায়গা সেখানে প্রলুব্ধ হওয়ার মতো সব কিছুর ঢালাও আয়োজন ছিল একসময়। দামি রেস্তোরাঁ আর হোটেলগুলো কাছেই ছিল—ছিল এক নম্বর চা, প্রচুর সুখাদ্য, আর তাছাড়া যা কিছু মানুষ চাইতে পারে, সব ছিল। এ-শহরের কুখ্যাত দালাল আর এজেন্টদেরও দেখা যেত এইখানে। টাকা আর মদের ফোয়ারা ছুটত একসময়; কেননা বেশ কয়েকটা বড় কোম্পানির অফিস ছিল এই কাইজার পার্কে।

তবে মনে আছে দুবছর আগে দারুণ কিছুটা সময় কাটিয়েছিল সে এখানে বন্ধুর সঙ্গে। প্রতি রাতে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটাই জুটতো তার পাশে। যুদ্ধের কারণে আর কোথাও স্কচ পাওয়া না গেলেও এইখানে এক মিনিটে এক ডজন বোতল ঠিক জুটে যেত।

কয়েকটা টাঙ্গা এখনও আছে, কিন্তু তাদের জাঁকজমক, ফিতে আর ঝালর, তাদের চকচকে তামার ফলকগুলোর কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। হয়ত সেগুলোরও ডানা গজিয়েছে আর অন্য সবকিছুর মতো তারাও একদিন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সে ঘড়ির দিকে তাকায়। বিকেল পাঁচটা। ফেব্রুয়ারির সন্ধের ছায়া ক্রমে দীর্ঘ হতে শুরু করেছে। মনে মনে তার বন্ধুটিকে খিস্তি দিতে দিতে সে তার বাঁদিকের হতচ্ছাড়া হোটেলটার দিকে চা খাবে বলে পা বাড়াতেই শুনতে পায় কে যেন মৃদু স্বরে তাকে ডাকছে। মুহূর্তের জন্যে তার মনে হয় বন্ধু বুঝি এসে গেছে, কিন্তু পরক্ষণেই পেছন ফিরে দেখে অপরিচিত একটা লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে। খুব সাধারণ দেখতে একটা লোক। লোকটার সাদা সুতির শালওয়ারে নতুন ভাঁজ পড়বার মত আর এতটুকু জায়গাও খালি নেই, আর তার গায়ের নীল পপলিনের শার্টটা এখনই কাচতে পারলে ভাল হয়।

সে বলল, 'কি দোস্ত ডাকছিলে না কি?'

লোকটা আবার মৃদুস্বরে বললে, 'হ্যাঁ।'

লোকটাকে তার কোনও উদ্বাস্তু বলেই মনে হচ্ছিল, হয়তো টাকা পয়সা চাইছে।

সে বলল, 'কী চাই?'

সেই একই নরম গলায় লোকটা এবার বলল, 'কিচ্ছু না।' তারপর তার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে, ফিসফিস করে বলল, 'আপনার কিছু চাই?'

~ www.amarboi.com ~

'কী?'

'মেয়ে লাগবে?' কথাটা বলেই, কয়েক পা পেছনে সরে গেল লোকটা।

যেন তার বুকে একটা তির এসে বিঁধে গেছে। তার মনে হল, কী অবস্থা, এরকম একটা সময়েও, এই লোকটা কিনা পুরুষের শরীরের খিদে নিয়ে দলাই মলাই করছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত মানুষ জাতটার বিরুদ্ধে একটা অসম্ভব রাগ যেন তাকে গ্রাস করে নিচ্ছিল।

নিজের অনুভবের মধ্যে হারিয়ে যেতে যেতে সে শুধু বলল, 'কোথায় আছে?'

দালালটা কিন্তু ঠিকই ধরতে পেরেছে, তার গলার স্বরে তেমন কোনও উৎসাহ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কয়েক পা পিছিয়ে লোকটা এবার বলল, 'ঠিক আছে, কিছু মনে করবেন না, আপনার মনে হয় এসব খুব একটা প্রয়োজন নেই।'

সে এবার দালালটাকে থামিয়ে দিয়ে জিগ্যেস করল, 'তুমি কী করে জানলে? তুমি যা দিতে চাইছো পুরুষ মানুষের সব সময় তার প্রয়োজন থাকে,...এমন কি সে যখন ফাঁসি কাঠে চড়ে ফাঁসুড়ের দড়ির জন্যে অপেক্ষা করছে কিংবা চিতায় উঠতে চলেছে, তখনও।'

সে আরও কিছুটা দার্শনিক কচকচানি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, 'দেখো ভাই, যদি কাছাকাছি কোথাও হয় তো যেতে পারি। আমার এক বন্ধু আসবে বলেছে, তাই এইখানে অপেক্ষা করছিলাম।'

দালালটা এবারে আরও কাছে সরে এসে বলল, 'এই তো একদম কাছেই।'

'কোথায়?'

'ওই তো—ওই বাড়িটায়, ওই যে উল্টোদিকে।'

'কোথায়? ওই বড় বাড়িটায়?'

'হ্যাঁ স্যার।'

ভেতরে ভেতরে সে একবার কেঁপে উঠল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, চলো...আমি কি তোমার সঙ্গেই আসব?'

'আসুন, তবে আমি আগে আগে যাচ্ছি।' এই বলে লোকটা তার আগে হাঁটতে শুরু করল।

নিজেকে ঘেন্না করার মত অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে, সে দালালের পিছনে হাঁটতে থাকল।

মাত্র কয়েক ফুট দূরত্বে বাড়িটা। কয়েক মিনিটেই রাস্তাটা পেরিয়ে এল তারা। এতক্ষণে নোনা ধরা বাড়িটার ভেতরে তারা ঢুকে পড়েছে। আশেপাশের বাড়িগুলো থেকে অনেক বেশি ভাঙাচোরা এই বাড়িটা—প্লাস্টার খসে পড়ছে, ইঁট দাঁত বের করে আছে, কয়েকটা ভাঙা পাইপ আর রাজ্যের আবর্জনা ছড়িয়ে আছে চারপাশে।

সন্ধে নেমে এসেছে। উঠোনটা পেরিয়ে যেতেই বাড়ির ভেতরটা অন্ধকার। বিরাট চওড়া উঠোনটা পেরিয়ে তারা একটা কোণের দিকে এসে দাঁড়াল। এই জায়গায়, বোঝা যায় মেরামতের কাজ শুরু হয়েও থমকে দাঁড়িয়ে আছে। চারধারে খোলা ইঁটের গাঁথনি, শক্ত হয়ে যাওয়া সিমেন্টের চাঙড় আর পাথরকুচির ছোট ছোট স্তূপ ছড়িয়ে পড়ে আছে।

দালালটা আধা তৈরি সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে তাকে বলল, 'এইখানে একটু দাঁড়ান। এক মিনিটের বেশি দেরি করব না।'

~ www.amarboi.com ~

নীচে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করছিল। দালালটা কোথায় উধাও হয়ে গেছে। সিঁড়ির ঠিক ওপর দিকে একটা জোরালো আলো জ্বলছে, সে মুখ তুলে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল। দুমিনিট পার হয়ে গেলে, সে এবার পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। একেবারে ওপরের ধাপে এসে দালালের জোরালো কঠিন গলা শুনতে পেল সে।

'তুমি উঠবে কি উঠবে না?'

নারীকণ্ঠে জবাব শোনা যায়, 'তোমাকে তো বললাম, বলিনি কি, এবার ঘুমোতে দাও আমায়।' মেয়েটার কণ্ঠস্বর জড়ানো, খুব আস্তে শোনা যায়।

দালালের গলার স্বর আরো চড়ে, ভাঙা স্বর, বলে, 'ওঠ মাগি, কথা না শুনিস তো দেখ কী করি...'

নারীকণ্ঠ বলে ওঠে, 'খুন করতে চাও করো, আমি উঠবো না। আল্লার দোহাই এবারে ছেড়ে দাও আমায়।'

দালালের সুর এবার নরম হয়ে আসে, 'সোনা একবার ওঠো। অত জেদ করো না। একবার ভাবো তো...কী খেয়ে বাঁচব আমরা?'

মেয়েটা জবাব দেয়, 'জাহান্নামে যাক সবাই। মরতে হয় তো না খেয়েই মরব। বিরক্ত করো না। আমি ঘুমোতে চাই।'

দলালের স্বর কঠিন হয়ে ওঠে, 'তো উঠবি না তুই, কুত্তি কোথাকার। শালি খানকির বাচ্ছা!'

মেয়েটা এবার চেঁচাতে শুরু করে, 'আমি উঠব না...উঠব না...উঠব না...'

দালাল এবার গলার সুর নামায় 'আস্তে কথা বল্, কেউ শুনতে পাবে...চল্। এবার ওঠ। তিরিশ, চল্লিশ টাকা তুই পাবি, চল একবার।'

নারীকণ্ঠে এবার অসহায়তা ফুটে ওঠে, 'দ্যাখো, আমি হাতজোড় করছি তোমার কাছে... এতক্ষণ জেগে থেকেছি এবার একটু ঘুমোতে দাও আমায়। দয়া করো, আল্লার দোহাই।'

'এক দু-ঘণ্টার তো ব্যাপার...পরে অনেক ঘুমোবি, চল্—তা না হলে আমি কী করব তুই জানিস।'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ হয়ে যায়। পা টিপেটিপে ঘরের কাছে এসে এবারে সে উজ্জ্বল আলো ঠিকরে বেরনো ঘরটার ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করে।

ঘরটা ছোট, একটা মেয়ে মেঝেতে এলিয়ে পড়ে আছে। কয়েকটা রান্নার জিনিস এলোমেলো ছড়িয়ে, তাছাড়া ঘরে আর কিছু নেই। দালালটা মেয়েটার পাশেই বসে তার পা টিপছে। কিছুক্ষণ পর লোকটা বলে, 'চলো, এবার উঠে পড়ো। আল্লার দোহাই এক দুঘণ্টার মধ্যেই তুমি ফিরে আসবে—তারপর যত খুশি ঘুমিও।'

মেয়েটা হঠাৎ আগুনের মুখোমুখি কোনও ইঁদুরের মত যেন লাফ মেরে ওঠে আর চিৎকার করে, 'ঠিক আছে, আমি উঠছি।'

সে এবার দরজা থেকে সরে দাঁড়ায়। আসলে একটু ভয়ও করে। পা টিপে টিপে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে তাড়াতাড়ি। একবার ভাবে, দৌড়ে পালাবে—দৌড়ে পালাবে এই শহরটার থেকে, এই পৃথিবীটা থেকে। কিন্তু কোথায় পালাবে সে?

তারপরেই তার মনে হয় : কে এই মেয়েটা? কেন এত অত্যাচার হচ্ছে তার ওপর?

~ www.amarboi.com ~

এই দালালটাই বা কে? মেয়েটার সঙ্গে কী সম্পর্ক ওর?.আর কেনই বা তারা ওইরকম একটা ঘরে থাকে যেখানে একটা বাল্বের আলো একশোটা মোমবাতির আলোর মতো উজ্জ্বল? কতদিন ধরে আছে ওরা এখানে?

বাল্বটার কড়া আলো এখনও তার চোখে বিঁধছে। চারপাশের কিছুই সে এখন দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু সে ভাবছিল, এরকম চোখে ধাঁধানো আলোর মধ্যে কেউ ঘুমোয় কী করে? আর এত বড় বাল্ব কেন? ছোট একটা বাল্ব রাখা যেত না—পনেরোটা কি কুড়িটা মোমবাতির আলো দেয়, এরকম?

নিজের ভাবনায় হারিয়ে যেতে যেতে, একটা পায়ের শব্দ শুনতে পেল সে। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল দুটো ছায়ামূর্তি তার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। একটা ছায়া, যেটা সেই দালালের, প্রথম কথা বলল, 'নিজেই দেখে নিন।'

সে বলল, 'আমি দেখেছি।'

'ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'চল্লিশ টাকা পড়বে।'

'তাই হবে।'

'টাকা আগে দিয়ে দিন।'

এতক্ষণে তার নিজেরও যুক্তিবুদ্ধি ঘুলিয়ে গেছে। পকেটে হাত গুঁজে সে কয়েকটা টাকা মুঠো করে তুলে নেয়, তারপর দালালটার দিকে বাড়িয়ে দেয়।

'গুনে নাও, কটা আছে।'

টাকা গোনার সবসময় আওয়াজ ওঠে।

'এখানে পঞ্চাশ আছে,' দালালটা বলে।

সে বলে, 'পঞ্চাশেই রাখো।'

'সালাম সাহেব।'

তার মনে হয়, একটা বড় পাথর তুলে মারে লোকটার মাথায়।

দালাল বলে, 'নিয়ে যান। কিন্তু দেখবেন খুব বেশি জ্বালাতন করবেন না আর চেষ্টা করবেন এক-দুঘণ্টার মধ্যে ফেরত পাঠিয়ে দিতে।'

'ঠিক আছে।'

বড় বাড়িটার ভেতর থেকে সে বেরিয়ে আসে। এই বাড়িটার সামনে একটা বোর্ড টাঙানো থাকত, আগে যেতে-আসতে গেলে কতবার সে ওই বোর্ডটা পড়েছে।

বাইরে একটা টাঙ্গা দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটাকে পেছনে নিয়ে সে ওই টাঙ্গাটার দিকে এগিয়ে গেল।

আর একবার দালালটা তার দিকে তাকিয়ে সেলাম করল। আরও একবার তার মনে হল, একটা ভারী পাথর তুলে লোকটার মাথাটা থেতলে দেয়।

টাঙ্গাটা চলতে শুরু করল। কাছেই একটা ছোট ঘুপচি হোটেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তারা। অনেক কষ্টে নিজের সব উদ্বেগ দূরে সরিয়ে রেখে সে এইবার ভাল করে মেয়েটাকে লক্ষ করল। নষ্ট হয়ে গেছে মেয়েটা—পা থেকে মাথা অবধি, নষ্ট। তার চোখের পাতা ফুলে আছে। নীচের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। সত্যি বলতে, মেয়েটার শরীরের

~ www.amarboi.com ~

পুরো ওপর দিকটাই যেন একটা ভাঙাচোরা বাড়ির মত সামনে ঝুঁকে আছে, যেন ভেঙে পড়তে পারে যে কোনও মুহূর্তে।

মেয়েটাকে সে বলল, 'মাথা তোলো।'

এক ঝাঁকুনি দিয়ে মেয়েটা বললো, 'কী?'

'কিছু না। বলছি, কিছু একটা বলো।'

মেয়েটার চোখ দুটো রক্তলাল। যেন কেউ লাল লঙ্কা ঘষে দিয়েছে, এতটাই লাল চোখ দুটো। মেয়েটা চুপ করে থাকে।

'নাম কী তোমার?'

'কিছু না।' মেয়েটার স্বর যেন অ্যাসিডের মতো পোড়ায়।

'কোথা থেকে এসেছো?'

'যেখান থেকে আপনার খুশি সেখানেই ধরে নিন।'

'এত তিক্ততা কিসের?'

এতক্ষণে মেয়েটাও পুরো সজাগ হয়েছে। লঙ্কার মত লাল চোখে সে সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'যা করার আছে তাড়াতাড়ি করুন। আমাকে যেতে হবে।'

সে বলে, 'কোথায়?'

পরোয়া করে না এরকম এক কণ্ঠস্বরে মেয়েটা তাকে বলে, 'যেখান থেকে আমায় এনেছেন সেখানে।'

'তুমি এখন যেতে পারো।'

'আপনার যা করবার আছে করে ফেলুন। আমাকে জ্বালাচ্ছেন কেন?'

হৃদয়ের সমস্ত বেদনা ঢেলে সে একবার বলতে চেষ্টা করে, 'আমি তোমায় জ্বালাচ্ছি না। সহানুভূতি জানাচ্ছি।'

এই কথায় মেয়েটা আরো রাগে ফুঁসতে থাকে। 'আমার কারো সহানুভূতি দরকার নেই।' তারপর প্রায় চেঁচিয়ে উঠে আবার বলে, 'যা করার আছে করে ফেলে আমাকে যেতে দিন।'

সে এগিয়ে এসে মেয়েটার মাথায় একবার আলতো করে স্পর্শ করতে যায়, মেয়েটা এক ঝটকায় তার হাত সড়িয়ে দেয়।

'আপনাকে সাবধান করছি, আমাকে বিরক্ত করবেন না। বহুদিন হয়ে গেছে আমি ঘুমোইনি। যেদিন থেকে এখানে এসেছি সেইদিন থেকে আমি জেগে আছি।'

মেয়েটার ওপর আবার করুণা হয় তার।

'এখানেই ঘুমিয়ে নাও তাহলে।'

মেয়েটার চোখটা আরো লাল হয়ে যায়, তীক্ষ্ণ গলায় সে বলে, 'আমি এখানে ঘুমোতে আসিনি ; এটা আমার বাড়ি নয়।'

'ওইটা কি তোমার বাড়ি—কোথা থেকে এসেছো তুমি?'

মেয়েটা আরও উত্তেজিত হয়।

'ওফ! বোকার মতো কথা বলা বন্ধ করবেন! আমার কোনও ঘর নেই। আপনি আপনার কাজ করুন না। আর নয়তো আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন আর টাকাটা ফেরত নিয়ে নিন ওই...ওই...' একটা ভয়ঙ্কর খিস্তি দিয়ে মেয়েটা চুপ করে।

~ www.amarboi.com ~

তার মনে হয় এই অবস্থায় মেয়েটার সঙ্গে কথা বলবার কোনও মানেই হয় না। সহানুভূতি দেখাবারও মানে হয় না। সে তাই বলে, 'চলো, তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

বড় বাড়িটায় আবার মেয়েটাকে পৌঁছে দেয় সে।

পরের দিন, কাইজার পার্কের একটা সস্তা হোটেলে বসে সে তার বন্ধুকে পুরো ঘটনা বলে। বন্ধুও মেয়েটাকে বোঝে। নিজের ঘৃণা আর বিরক্তি না চেপে বলে, 'মেয়েটা যুবতী?'

সে বলে, 'আমি জানি না, ঠিক মতো লক্ষ করিনি। আমি শুধু ভাবছিলাম একটা পাথর তুলে দালালটার মাথাটা থেঁতলে দিলাম না কেন?'

বন্ধু বলল, 'এটাই ঠিক কাজ হত।'

বন্ধুর সাথে হোটেলে বেশিক্ষণ থাকা গেল না। গতকালের ঘটনাটার ভার কিছুতেই তার মন থেকে সরছিল না। চা শেষ করে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সে।

টাঙ্গার স্ট্যান্ড অবধি বন্ধুও সঙ্গে গেল। সে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল দালালটাকে দেখা যায় কিনা। দেখতে পেল না। সন্ধে ছটা পেরিয়ে গেছে। কয়েক গজ দূরে সেই বড় বাড়িটা সেরকমই ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। সে আস্তে আস্তে ওদিকে হেঁটে গিয়ে একসময় ভেতরে ঢুকে পড়ল।

তার পাশ দিয়ে লোকজন চলাফেরা করছে, কিন্তু সে অনায়াসে সেই সিঁড়ি অবধি পৌঁছে গেল। আজও, সে দেখল, সিঁড়ি দিয়ে ওপরের আলো চুঁইয়ে নামছে। ওপরে একবার তাকিয়ে সে সিঁড়িতে চড়তে আরম্ভ করল। ওপরের ধাপে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। ঘরের ভেতর থেকে চোখ ধাঁধানো আলো ঠিকরে পড়ছে, কিন্তু একটাও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। সিঁড়ির ওপরে ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে গেল সে। ঘরের দরজাটা হাট করে খোলা। চারপাশে তাকিয়ে সে এবার ঘরের ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করল। বাল্বটা কোথায় দেখার আগেই তার তীব্র আলো এসে চোখে বিঁধছিল। সে ঘুরে গিয়ে তার পেছনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চোখটা সইয়ে নিতে চেষ্টা করল।

আর একবার দরজার কাছে ফিরে এল সে, এমনভাবে যাতে এবারে আর বাল্বের ওই চোখ ধাঁধানো আলো তাকে বিঁধতে না পারে। ভেতরে উঁকি দিল সে। দেখতে পেল, মেঝেতে মাদুরের ওপর একটা মেয়ে শুয়ে আছে। গলাটা বাড়িয়ে সে চেষ্টা করল আরও কিছু দেখা যায় কি না ; মেয়েটা মনে হল ঘুমিয়ে আছে। একটা দোপাট্টায় তার মুখ ঢাকা। নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার বুক উঠছে নামছে। আর একটু কাছে গিয়ে সে প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে দেখতে পেল, মেয়েটার থেকে একটু দূরে খোলা মেঝের ওপর একটা লোক পড়ে আছে। লোকটার মাথাটা টুকরো টুকরো করে থেঁতলে দিয়েছে কেউ। রক্ত-মাখা একটা ইঁট একটু দূরে পড়ে আছে। সব কিছুই সে দেখতে পেল এক পলকের মধ্যে আর তারপরেই দৌড়ে এল সিঁড়ির দিকে। পা পিছলে গেল তার, তবু শরীরে যতই আঘাত লাগুক, ওই অবস্থায় পড়তে পড়তেই সে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল নিজের বোধশক্তি সামলে রাখতে। খুব কষ্ট করেই সেদিন বাড়ি ফিরে এল সে, আর তার সারারাত ধরে ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে।

ভাষান্তর : সর্বজিৎ সরকার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শাহদৌলার ইঁদুর

একুশ বছর বয়সে সালিমার বিয়ে হয়েছিল।

পাঁচ বছর কেটে গেছে, কিন্তু ছেলেপুলে হল না। এ-জন্য তার মা আর শাশুড়ির খুব ভাবনা ছিল। বিশেষত মা ভীত হয়ে পড়েছিল দিনে দিনে এই চিন্তা করে, যদি সালিমার বর নাজিব আবার একটা বিয়ে করে। অনেক ডাক্তারবদ্যি করেও কোনও সুরাহা হয়নি।

বিয়ের পর অনেক মেয়েই তাড়াতাড়ি মা হতে চায় না। ওদের মতো সালিমা না, সে সন্তান চায়। মায়ের সঙ্গে অনেক পরামর্শও করেছিল বাচ্চা হওয়ার জন্য। মাও অনেক নিয়ম তাকে বাতলে দেয়। সে তা পালন করেছিল। কিন্তু তার বাচ্চা হয় না।

একদিন তার সই ফতিমা আসে। ফতিমাকে আগে সবাই বাঁজা বলেই জানত। সালিমা অবাক হয়ে দেখে ফতিমার কোলে একটা মোটাসোটা বাচ্চা ছেলে। সে ফতিমার কাছে জানতে চাইল, 'কী করে এমন বাচ্চা পেলি রে ফতিমা?'

সালিমার থেকে পাঁচ বছরের বড় ফতিমা মুচকি হেসে উত্তর দেয়, 'শাহদৌলা সাহেবের দয়ায় পেয়েছি। একটা বউ আমায় বলেছিল, মা হতে চাইলে গুজরাটে যাও। ওখানে শাহদৌলার মাজার আছে। মাজারে মানত করো। আর বোলো, হুজুর প্রথম যে বাচ্চাটা আমার হবে, তাকে আপনার খানকায় সেবায় দিয়ে দেব।'

আরও অনেক কথা বলে ফতিমা। শাহদৌলার মাজারে মানত করার পর প্রথম বাচ্চাটা মাথা খুব ছোট নিয়ে জন্মায়। সেই ছোট মাথার শিশুটিকে শাহদৌলার খানকায় রেখে আসতে হয়।

সালিমা ভেবে কূল কিনারা পায় না। কেমন দেখতে হয় সেই শিশু যার শরীরের তুলনায় মাথাটা ছোট? এমনটা হয় নাকি? মানত করার পর প্রথম বাচ্চাকে রেখে আসতে খানকায়? এ কী করে সম্ভব? ভাবতে তার কষ্ট হয়।

ফতিমার কথা শুনতে তার ভাল লাগে না, মনে বড় দুঃখ হয়, ভাবে, 'কোন মা পারে এমন কাজ? মা কিছুতেই তার দুধের বাচ্চাকে নিজের থেকে আলাদা করতে পারে না।

~ www.amarboi.com ~

নিজের বাচ্চার যতই থাকুক না কেন ট্যারা চোখ, চ্যাপটা নাক বা ছোট মাথা, মা সেই বাচ্চাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। এমন কাজ শুধু ডাইনিরাই পারে।'

বাচ্চার জন্য সালিমা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তাই সে ফতিমার কথা মেনে নেয়। ফতিমা থাকত গুজরাটে, সেখানেই শাহদৌলার মাজার। সে তার স্বামীকে বলে, 'ফতিমা খুব ধরেছে শাহদৌলার মাজারে যাবার জন্য। আমারও ইচ্ছে আছে যাবার। আপনি অনুমতি দিলে...।'

স্বামী তাকে নিষেধ করে না। সে বলে, 'যাও, তবে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

সালিমা একদিন ফতিমার সঙ্গে গুজরাট রওনা হয়ে গেল।

শাহদৌলার মাজার প্রাচীন কোনও ইমারত নয়। জায়গাটা খুব ছিমছাম, পরিষ্কার এবং সুন্দর। মাজারের পরিবেশ সালিমাকে বেশ মুগ্ধ করে, কিন্তু চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে শাহদৌলার ইঁদুর দেখে তার মেরুদণ্ড শির শির করে ওঠে। ঠাণ্ডা হয়ে যায় সে। ইঁদুরের মতো দেখতে সব মানুষ, অনবরত তাদের নাক দিয়ে হড়হড়ে নাল গড়াচ্ছে—মাথাটা বিকৃত। এলোমেলোভাবে ঘুরতে ঘুরতে এক যুবতীর মুখোমুখি হয় সে। তার শরীরের গড়ন খুব সুন্দর। ভরা যৌবন নিয়ে মেয়েটি অস্বাভাবিক আর হাস্যকর আচরণ করে চলেছে যা দেখে অনেক গম্ভীর লোকেরও হাসি আসবে। সালিমা নিজেও হেসে ফেলে। পরমুহূর্তে তার চোখে জল আসে। মেয়েটির ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে বিচলিত হয়। সে জানে, খুব শিগগিরি মাজারের দেখভালকরনেওলা লোকটা মেয়েটিকে বিক্রি করবে। যে খরিদ্দার কিনবে, সে বাঁদরনাচ নাচাবে ওকে। মেয়েটাকে ভাঙিয়ে টাকা রোজগার করবে।

মেয়েটির মাথা শরীরের তুলনায় অস্বাভাবিক ছোট। সালিমা ভাবে, ছোট মাথা হলেই যে কপাল মন্দ হবে তা তো নয়। ঘাড় মাথা বাদ দিলে তার চেহারা একদম নিখুঁত। হাত-পায়ের গড়ন নিটোল। ভারি সুন্দর। তবে দেখা মাত্রই বোঝা যায় মানসিক ভারসাম্যহীন। ওর আচরণ দেখে সন্দেহ হয়, কেউ বোধহয় নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য মাথাটা জোর করে বিকৃত করে দিয়েছে। ইঁদুর-কন্যাটি কথা বলছে বা চলাফেরা করছে একটি দম দেওয়া পুতুলের মতো। মেয়েটিকে দেখতে দেখতে সালিমার মনে হয় সে নিজেও ওর মতো হয়ে যাচ্ছে। বোধহীন দম দেওয়া পুতুলের মতো।

তবুও ফতিমার জোরাজুরিতে সে সন্তানের জন্য মানত করে। সে শপথ করে প্রথম বাচ্চাকে এখানে দিয়ে যাবে।

সালিমা বাড়ি চলে আসে। ডাক্তার-বদ্যির পরামর্শ নিয়ম করে পালন করে। অবশেষে, দুমাসের মধ্যে বুঝতে পারে সে মা হতে চলেছে। সময় মতো একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে প্রসব করে। দুঃখের কথা, সালিমার গর্ভে ছেলেটি থাকার সময় চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। তাই বাচ্চাটির ডান গালে একটি কালো তিল ছিল। তিলটির জন্য ওকে মোটেই খারাপ দেখাত না।

ফতিমা একদিন এসে বলে, বাচ্চাকে তাড়াতাড়ি শাহদৌলার মাজারে দিয়ে আসতে হবে। সে নিজেই তো এই মানত করেছিল ওখানে। কয়েকদিন ধরে সালিমার ভিতরে টালমাটাল চলে—তার মমতা ভাবতেও পারে না যে প্রাণের থেকে প্রিয়কে সে ফেলে

~ www.amarboi.com ~

আসবে। সালিমা প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করে, শাহাদৌলা সাহাবের কাছে মানত করে যে বাচ্চা আসে তারা তো ছোট মাথা নিয়ে জন্মায় কিন্তু তার ছেলের মাথা তো একেবারেই স্বাভাবিক।

ফতিমা বলে, 'কোনও বাহানা না! তোমার ছেলে শাহদৌলা সাহেবের মাজারেই যাবে। ওর ওপর তোমার কোনও দাবি নেই। কথার খেলাপ করলে তোমার জীবনে এমন দুঃখ নেমে আসবে, যে জীবনভর ভুলতে পারবে না।' সালিমা ভয় পায়। বুকে পাথর বেঁধে মাজারে যায়। নিজের হাতে, গালে তিল-চিহ্নিত শিশুটিকে তুলে দেয় মাজারের কর্মীর হাতে।

বাড়ি ফিরে আসে সালিমা। চিৎকার করে বুক চাপড়ে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে অসুস্থ হয়ে যায়। গোটা একটা বছর ধরে যমে-মানুষে টানাটানি চলে তাকে নিয়ে। কিছুতেই ভুলতে পারে না ছেলেকে। ভুলতে পারে না উজ্জ্বল কালো চিহ্নটিকে যা তার ছেলের ডান গালে ছিল। বার বার চুমু খেত সেখানে। বড় ভাল লাগত সেই তিলটি দেখতে।

এতটাই মায়াময় ছিল সেই জন্ম চিহ্নটি, সে নির্নিমেষে চেয়ে থাকত আবিষ্ট হয়ে। থেকে থেকে সেই স্মৃতি তাকে রক্তাক্ত করে।

অসুস্থতার সময় সে এক মুহূর্তের জন্যও ছেলেকে ভুলতে পারেনি। মাঝে মাঝেই নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখত। বেদনায় অচ্ছন্ন হত। সে দেখতে পেত, ছুঁচলো দাঁত নিয়ে শাহদৌলার ইঁদুর তার সামনে উন্মত্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার তীব্র ধারালো দাঁত সালিমার শরীর থেকে এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে আনল। স্বপ্নের ঘোরে সে চিৎকার করে উঠত, 'বাঁচাও! বাচাও আমায়... ইঁদুরটা আমার মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে।'

কোনও কোনও সময় দিগভ্রান্ত কল্পনায় সে দেখে, বাচ্চাটা একটা ইঁদুরের গর্তে ঢুকেছে। সালিমা আপ্রাণ চেষ্টা করছে লেজ ধরে নিজের দিকে টেনে আনবার জন্য, কিন্তু গর্তের ভিতর অনেকগুলো ধেঁড়ে ইঁদুর তার বাচ্চার ছুঁচোলো মুখটি শক্ত করে ধরে রেখেছে। গর্ত থেকে নিজের ছেলেকে কিছুতেই বার করতে পারছে না।

আবার কখনও জ্বরের ঘোরে তার মনে হয়, শাহদৌলা সাহেবের মাজারের সেই সুন্দর মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি এপাশ-ওপাশ করে ছোটো মাথাটা হাস্যকর ভাবে দোলাচ্ছে। দেখে সালিমা হাসতে শুরু করে। তারপরই হাসি থামে, সে কাঁদতে শুরু করে। সেই কান্না ও হতাশ্বাস দেখে তার স্বামী নাজির বিহ্বল হয়ে যায়। বেগমের চোখের জল কী ভাবে আটকাবে বুঝতে পারে না। সালিমা দেখে বাড়িময় ইঁদুর দৌড়চ্ছে। বিছানায়, সোফায়, রান্নাঘরে, স্নানঘরে। সব জায়গায় ইঁদুর আর ইঁদুর। সে অনুভব করে, কানের ভিতরে ইঁদুর ঢুকে গেছে। এমনকি বুকের ভিতরেও ইঁদুর চলাফেরা করছে। সারা শরীর জুড়ে সে এই প্রাণীর উপস্থিতি অনুভব করে। এই বোধ এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে, নিজেকেই সে মনে করে একটি ইঁদুর। তার নাক দিয়ে নাল ঝরছে। শাহদৌলা মাজারে ইঁদুরের ভিড়ে সে নিজেকে দেখতে পায়। ছোট্ট মাথা আর ভাঙা কাঁধ নিয়ে উৎকট ভঙ্গি করছে। মাজারের দর্শনার্থীরা তাকে দেখে মজা পাচ্ছে আর হাসিতে ফেটে পড়ছে।

~ www.amarboi.com ~

সালিমা যেখানেই তাকায় সেখানেই কালো তিল দেখতে পায়। ব্রহ্মাণ্ড যেন মস্ত বড় একটা গাল। সূর্য ভেঙে গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে টুকরো টুকরো হয়ে। অজস্র কালো তিল সূর্যের গুঁড়োগুলির ওপর আটকে আছে।

শেষ পর্যন্ত তার জ্বর কমে যায়। ধীরে ধীরে সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। নাজির স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। যে যন্ত্রণায়, যে দুরবস্থায় একটা বছর তার বেগমের কেটেছে তা নাজিব খুব ভাল করেই জানে। এমনিতে সে খুব আবেগহীন গম্ভীর প্রকৃতির ছাড়াও ধর্মভীরু ও কুসংস্কারচ্ছন্ন মানুষ। তাই সন্তান হারাবার শোক সে পায়নি। বাচ্ছাটাকে মাজারে দেওয়ার জন্য কোনও আপত্তি তার ছিল না। এমনকি প্রথম থেকেই সে জানত শিশুটা তার নয়, শিশুটি শাহদৌলারই প্রাপ্য।

সালিমার অসুখ কমে যাবার পর তার উথালি-পাথালি মন যখন খানিক শান্ত হল, নাজিব তাকে বলে, 'বিবিজান, ভুলে যাও বাচ্চাটার কথা। সে তো তোমার না। সে ছিল মাজারের সম্পত্তি। পীরবাবার সেবায় তাকে ভেট দেওয়া হয়েছে।'

সালিমা বিষণ্ণ গলায় বলে, 'মানি না একথা। কোনও দিন নিজেকে ক্ষমা করব না। মা হয়ে এ কী কাজ করলাম আমি? আমার সোনাকে, কলজের টুকরোকে কীভাবে দিয়ে দিলাম ওদের হাতে? মাজারের লোকেরা ওকে যত্ন করবে না, আদর করবে না। আমার মতো করে কেউ ওরা খেয়াল রাখবে না। মাজারের কেউ ওকে মার মতো ভালবাসবে না।'

এক রৌদ্রস্নাত দিনে সালিমা নিখোঁজ হয়ে গেল। গুজরাটে গিয়ে সপ্তাহ খানেকের বেশি থাকল। শাহদৌলার মাজারে ছেলের খোঁজখবর নেবার অনেক চেষ্টা করল। ছেলেকে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এক রাশ শূন্যতা নিয়ে ফিরে এসে স্বামীকে বলল, 'আর কোনওদিন ওকে মনে আনব না।'

এখন বাচ্চাকে সে মনের গভীরে, গভীরতম কোণে সযত্নে রেখে দেয়। গোপনভাবে তার স্মৃতিকে লালন করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা শুকনো ক্ষতচিহ্ন থেকে যায় তার হৃদয়ের ভিতরে। ডান গালে কালো উজ্জ্বল তিলটির মতো।

এক বছর পর একটি মেয়ে হয় তার। মেয়েটি অনেকটা প্রথম বাচ্চাটার মতো দেখতে। তবে এর গালে তিল নেই। মেয়েটির নাম দেওয়া হল মুজিবা। সালিমা ছেলেকে মুজিব নামে ডাকতে চেয়েছিল।

মেয়েটা দুমাসের হলে, ওকে কোলে শুইয়ে ডান গালে একটা বড় গোল টিপ এঁকে দেয় সুরমা দিয়ে। ঠিক সেই কালো আঁচিলটার মত। আর ছেলের কথা মনে করে কাঁদে। চোখের জল গাল বেয়ে কোলের বাচ্চাটার মুখ ভিজিয়ে দেয়। তখনই সে তাড়াতাড়ি ওড়না দিয়ে জল মোছে। আর হাসি হাসি ভাব আনে নিজের মুখে। অনেক চেষ্টা করে নিজের দুঃখ ভুলতে চায়।

এরপর আরও দুটি সন্তানের মা হয় সালিমা। এখন [illegible] খুব খুশি। অনেক বছর কষ্টে গেছে।

একবার সালিমাকে ছেলেবেলার এক সই-এর বিয়েতে গুজরাট যেতে হয়েছিল। সেই

~ www.amarboi.com ~

সুযোগে আবার শাহদৌলার মাজারে গিয়ে ছেলের খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু খোঁজ মেলে না। নিরাশ হয়ে ভাবে হয়তো ছেলেটা মরে গেছে। এক শুক্রবারের বিকালে ছেলের স্মরণে শোকসভা হয়। সেখানে আল্লার কাছে প্রার্থনা ও কোরান পাঠের আয়োজন। অনেক লোকের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রতিবেশী মহিলারা হকচকিয়ে যায়। কার মৃত্যু হল এদের পরিবারে তা তারা বুঝে উঠতে পারে না। কোনও একজন প্রতিবেশিনী তাকে কারণটা জিজ্ঞাসা করে। সালিমা নীরব থাকে।

সেই সন্ধ্যায় দশ বছরের মুজিবার হাত ধরে ঘরের ভিতরে নিয়ে যায়। মেয়েটার ডান গালে সুরমা দিয়ে গোলাকার টিপ এঁকে দেয়, তারপর সেই গালে, সেই আঁকা চিহ্নটির ওপর চুমুর পর চুমু এঁকে দেয় অনেকক্ষণ ধরে।

আগে সালিমা মুজিবাকে হারিয়ে যাওয়া ছেলে মুজিব বলেই মেনে করত। এখন আর তেমন মনে করে না। সেই স্মরণসভা হবার পর তার বুকের ভারটা অনেকটা হাল্কা হয়ে গেছে।

কল্পনায় ছেলের জন্য তার হৃদয়ের ভিতরে ফুলবেছানো সমাধি নির্মাণ করে সযত্নে রেখে দেয়।

সালিমার তিন ছেলেমেয়েই স্কুলে যায়। অনেক সকালে উঠে তাদের তৈরি করে। নিজে স্নান করে, বাচ্চাদেরও স্নান করিয়ে জামাকাপড় পরিয়ে দেয়। টিফিন তৈরি করে তাদের স্কুলে পাঠায়। বাচ্চারা স্কুলে যাবার পর একমুহূর্তের জন্য সে মুজিবকে বুকের ভিতর থেকে সামনে আনে। পরমুহূর্তে তার মনে পড়ত শোক সভার কথা। তার বুকটা আবার হাল্কা হয়ে যায়। তবুও কখনও-সখনও মনে হত, ছেলের মুখে সেই কালো তিলটা বোধহয় তার মাথার ভিতর আটকে রয়েছে।

একদিন তিন বাচ্চা দৌড়ে তার কাছে এসে বলে, 'আম্মি, আম্মি, আমরা তামাশা দেখব।'

সালিমা সস্নেহে জানতে চায়, 'কী রকম তামাশা?'

মজিদই সবচেয়ে বড়, বলে 'আম্মিজান ওখানে একটা লোক আছে, ওই তো তামাশা দেখাচ্ছে—।'

সালিমা বলে, 'যাও ওকে ডেকে আনো। তবে ঘরের ভিতরে না, বাইরেটায় যেন খেলা দেখায়।'

বাচ্চারা দৌড়ে তাকে নিয়ে আসে এবং তামাশা দেখতে থাকে।

তামাশা দেখানো শেষ হবার পর মুজিবা মার থেকে পয়সা আনতে যায়।

সালিমা ব্যাগ থেকে একটা চার-আনা বার করে নিয়ে বারান্দার দিকে এগোয়, দরজার কাছে এসে দেখে শাহদৌলার এক ইঁদুর সেখানে দাঁড়িয়ে মজাদার অঙ্গভঙ্গি করছে, ছোটো মাথাটাকে লিকপিক করে নাড়াচ্ছে। দেখে তার হাসি পেয়ে যায়। দশ বারোটা ছোট ছেলেমেয়ে অদ্ভুত ইঁদুরের মত জীবটিকে ঘিরে হা-হা-হি-হি করে চলেছে। কোনও কথা কানে আসছে না তাদের চিৎকার চেঁচামেচির জন্য।

সালিমা আরও কিছুটা এগিয়ে, হাত বাড়িয়ে চার-আনা পয়সাটা সেই মানুষরূপী

~ www.amarboi.com ~

ইঁদুরের হাতে দিতে গিয়ে পিছিয়ে আসে কয়েক পা। তার সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায়। সেই ইঁদুরটির ডান গালে একটা কালো তিল। সালিমা খুব ভাল করে লক্ষ করে সেই মুখ। তার নাক দিয়ে হড়হড়ে নাল বেরচ্ছে অনবরত।

মুজিবা মায়ের পাশেই দাঁড়িয়েছিল, মাকে বলে, 'আম্মিজান, এই—এই ইঁদুরটা অনেকটা আমার মত দেখতে। তাই না? তাহলে আমিও কি ইঁদুর?'

সালিমা শাহদৌলার ইঁদুরের হাত ধরে ভিতরে নিয়ে যায়। ঘরের দরজা বন্ধ করে তাকে চুমু খায়। এই তো তার মুজিব। কিন্তু ছেলেটা এমন অস্বাভাবিক আর হাস্যকর আচরণ করতে থাকে। তার বুক ভেঙে যেতে থাকে।

সে বোঝাবার চেষ্টা করে মুজিবকে, বলে, 'বেটা, আমি তোর মা।'

শাহদৌলার ইঁদুরটি হাসতে থাকে। হাতের তালু দিয়ে শিকনি মুছে হাত বাড়িয়ে দেয় সালিমার দিকে : 'এক পয়সা।' সালিমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। সে ব্যাগ খুলে একশো টাকার নোট নিয়ে সেই লোকটাকে দেয় যে মুজিবকে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় তামাশা দেখিয়ে টাকা রোজগার করে।

লোকটি টাকা ফিরিয়ে দেয় তাকে। বলে, তার পক্ষে এত কম টাকায় ওকে বেচা সম্ভব নয়। এর রোজগারেই তো তার দিন চলে। শেষ পর্যন্ত সালিমা পাঁচশো টাকায় বোঝাপড়া করে। তাকে টাকা মিটিয়ে ঘরে এসে দেখে মুজিব নেই।

মুজিবা বলে, 'ও তো পেছনের দরজা দিয়ে চলে গেছে।'

সালিমার গর্ভ যেন আর্তনাদ করে ওঠে, 'মুজিব ফিরে আয়'। কিন্তু ছেলেটা চলে গেছে, আর ফিরবে না।

ভাষান্তর : সীমা বল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সহায়

'এমন বলো না যে এক লাখ হিন্দু আর এক লাখ মুসলমান মারা গেছে...বলো, দু লাখ মানুষ মারা গেছে...দু লাখ মানুষের মৃত্যুর চেয়েও আসল ট্র্যাজেডি হল, যারা মরেছে, তারা কোনও হিসেবের খাতাতেই ঢোকেনি...এক লাখ হিন্দু মেরে মুসলমানরা ভেবেছে, হিন্দুত্ব নিকেশ হয়ে গেছে, কিন্তু তা বেঁচে আছে আর বেঁচে থাকবেও...একই ভাবে এক লাখ মুসলমানকে কোতল করে হিন্দুরাও নিশ্চয়ই বগল বাজিয়ে বলেছে, ইসলাম খতম হয়ে গেছে...কিন্তু তোমরা তো সবাই জানো, ইসলামের গায়ে একটা আঁচড়ও পড়েনি...বেওকুফরাই ভাবতে পারে বন্দুক দিয়ে ধর্মকে শিকার করা যায়...ধর্ম, দীন, ইমান, বিশ্বাস—এসব তো আমাদের শরীরে থাকে না, থাকে আত্মায়। ছুরি, তলোয়ার, বন্দুক দিয়ে ওদের হত্যা করা যায় না।' মমতাজ সেদিন আশ্চর্যরকম উত্তেজিত ছিল।

আমরা তিনজন ওকে জাহাজে বিদায় জানাতে গিয়েছিলাম। ও আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছিল—কত দিনের জন্য কেউই জানতাম না—গন্তব্য পাকিস্তান, এমন এক দেশ, যার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম না।

আমরা তিনজন হিন্দু। পশ্চিম পঞ্জাবে আমাদের আত্মীয়দের জীবন ও সম্পত্তির অনেক ক্ষতি হয়েছিল। সম্ভবত সেজন্যই মমতাজ আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। লাহোর থেকে আসা চিঠিতে যুগল জানতে পেরেছিল, দাঙ্গায় ওর কাকা মারা গেছেন। খবরটা ওকে ধসিয়ে দিয়েছিল। একদিন এলোমেলো কথার মাঝে যুগল মমতাজকে বলেছিল, 'আমাদের মহল্লায় দাঙ্গা বাঁধলে, আমি কী করব, তাই ভাবছিলাম।'

মমতাজ জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী করবে?'

যুগল গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছিল, 'ভাবছিলাম...আমি তোমাকে খুন করে ফেলব।'

মমতাজ কথাটা শুনে একেবারে চুপ করে গিয়েছিল ; আট দিন নীরবতায় ডুবে থাকার পর সে আমাদের জানিয়েছিল, পৌনে চারটের জাহাজে ও করাচি চলে যাচ্ছে। ওর হঠাৎ চলে যাওয়ার কারণ আমরা তিনজনের কেউই খুঁজিনি। যুগল জানত, ওর

~ www.amarboi.com ~

কথাটাই—'ভাবছিলাম...আমি তোমাকে খুন করে ফেলব'—সম্ভবত চলে যাওয়ার কারণ। আর সেজন্যই হয়তো ও ছিল সবচেয়ে চুপচাপ। আশ্চর্যের ব্যাপার, চলে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে মমতাজ ওর স্বভাবের বিপরীতে গিয়ে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল।

সকাল থেকে ও মদ্যপান করে যাচ্ছিল। খোশমেজাজে জিনিসপত্তর গোছাচ্ছিল, যেন সে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে, না থেমে কথা বলে যাচ্ছিল, নিজের বলা ঠাট্টায় নিজেই হাসছিল। ওই অবস্থায় তাকে দেখলে কারুর মনে হতে পারত, বম্বে ছেড়ে যেতে পারার জন্য সে খুব উল্লসিত। কিন্তু আমরা তিনজনেই জানতাম, নিজের অনুভূতিকে গোপন করে ও আমাদের আর নিজেকে বোকা বানাচ্ছে।

আমি অনেকবার ওকে জিগ্যেস করার চেষ্টা করেছিলাম, হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত সে কেন নিল। যুগলকেও ইশারাতে বলেছি, প্রশ্নটা তোলার জন্য। কিন্তু মমতাজ আমাদের সামান্য সুযোগটুকুও দেয়নি।

যুগল তিন-চার পেগ খেয়ে আরও চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল, তারপর পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। ব্রিজমোহন আর আমি মমতাজের সঙ্গে ছিলাম। ডাক্তারের বিল মেটানো, ধোপাখানা থেকে জামাকাপড় নিয়ে আসার সময় ও শুধু কথা বলে যাচ্ছিল আর হাসছিল। মোড়ের গোবিন্দর দোকান থেকে পান কেনার সময় তার চোখ জলে ভরে উঠল। ব্রিজমোহনের কাঁধে হাত রেখে মুখ ঘুরিয়ে বলেছিল, 'মনে আছে ব্রিজ, দশ বছর আগে আমাদের অবস্থা যখন খারাপ ছিল, গোবিন্দ আমাদের এক টাকা ধার দিয়েছিল?'

সারা পথ মমতাজ চুপ করে ছিল। কিন্তু ঘরে ফিরে আবার সে কথা শুরু করেছিল—একটা কথার সঙ্গে আরেকটা কথার কোনও সম্পর্ক নেই—কিন্তু এমন সব মজাদার কথা যে আমি আর ব্রিজমোহনও যোগ দিয়েছিলাম। তার যাওয়ার সময় এগিয়ে এল, যুগলও আমাদের সঙ্গে এসে ভিড়ল। ট্যাক্সিতে ডকইয়ার্ডে যাওয়ার সময় আমরা কেউই কথা বলতে পারছিলাম না।

বন্দরে ট্যাক্সি ঢোকার আগে পর্যন্ত মমতাজের দৃষ্টি বম্বের ছড়িয়ে থাকা বাজারগুলোকে বিদায় জানাচ্ছিল। বন্দর ভিড়ে ভিড়াক্কার। হাজার হাজার উদ্বাস্তু, কিছু বড়লোক, বেশিরভাগই হতদরিদ্র—দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল, মমতাজ একাই চলে যাচ্ছে, আমাদের ফেলে রেখে এমন এক জায়গায় যা আগে সে দেখেনি, আর শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে ওখানে অপরিচিতই থেকে যাবে। এমনটাই আমি ভাবছিলাম। মমতাজের মনের ভিতরে কী চলছিল, তা আমি জানি না।

কেবিনে তার ব্যাগপত্তর ঢোকার পর সে আমাদের নিয়ে ডেকে এসে দাঁড়াল। আকাশ ও সমুদ্র যেখানে মিশেছে, সেদিকে দীর্ঘসময় তাকিয়ে থাকল। তারপর যুগলের হাত নিজের হাতে নিয়ে বলল, 'কী প্রতারক দেখো, আকাশ আর সমুদ্রের মিলন, অথচ কী আনন্দময়।'

যুগল চুপ করে ছিল। হয়তো তার ওই কথা—'আমি তোমাকে খুন করে ফেলব'—তখনও তার ভিতরে খোঁচা দিয়ে যাচ্ছিল।

জাহাজের পানশালা থেকে মমতাজ ব্র্যান্ডির অর্ডার দিল। সকাল থেকে সে ব্র্যান্ডিই খেয়ে যাচ্ছিল। গ্লাস হাতে আমরা রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। জাহাজে যতই উদ্বাস্তুরা

~ www.amarboi.com ~

উঠছিল, ততই চিৎকার-চেঁচামেচি, ঠেলাঠেলি বাড়ছিল। আপাত শান্ত জলের ওপর সমুদ্রপাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ যুগল একবারে গ্লাস শেষ এর বিকৃত স্বরে বলে উঠল, 'আমাকে ক্ষমা করো মমতাজ। ওইদিন তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছি।'

মমতাজ একটু থেমে থেকে জিগ্যেস করল, 'কথাগুলো যখন বলেছিলে, আমি তোমাকে খুন করে ফেলব, ওই কথাগুলোই কি তখন তুমি ভাবছিলে? ঠান্ডা মাথায় কি তুমি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলে?

যুগল মাথা নেড়ে বলেছিল, 'আমি—আমি দুঃখিত।'

মমতাজ ঘোরের ভিতর থেকে বলে, 'আমাকে সত্যিই খুন করলে, তুমি আরও খারাপ বোধ করতে। কিন্তু একবার যদি ভাবতে, তুমি মমতাজকে, একজন মুসলমানকে, বন্ধুকে মারোনি, মেরেছো একজন মানুষকে। সে যদি খারাপ মানুষ হত, মনে রেখো, তুমি তার খারাপটাকে মারোনি, মেরেছো মানুষটাকে, সে মুসলমান হলে, তার মুসলমানিকে মারতে পারোনি, মেরেছো তার অস্তিত্বকে। মুসলমানরা তার মৃতদেহ পেলে আর একটা কবরের সংখ্যা বাড়ত, কিন্তু দুনিয়ায় একজন মানুষ কম পড়ে যেত।'

ভাবার সময় নিয়ে সে একটু চুপ করে থাকল, তারপর আবার বলতে লাগল, 'আমার ধর্মের মানুষরা আমাকে হয়তো শহিদ ঘোষণা করত, কিন্তু সত্যি বলছি, কবরে আমি ছটফট করতাম, চিৎকার করে বলতাম, ওই তকমা আমি চাই না। পরীক্ষা না দিয়ে আমি এই ডিপ্লোমা চাই না। লাহোরে কিছু মুসলমান তোমার কাকাকে মেরেছিল, বম্বেতে বসে তুমি সেই খবর পেয়ে আমাকে খুন করলে। এর জন্য কী পুরস্কার আমরা পেতে পারি, বলো আমাকে? লাহোরে তোমার কাকা আর তার হত্যাকারীই বা কী সম্মান পেতে পারে? হ্যাঁ, যারা মরেছে, তারা কুকুরের মতো মরেছে আর হত্যাকারীর হাত রক্তাক্ত হয়েছে, প্রয়োজন ছাড়া—কোনও প্রয়োজনই ছিল না।'

কথা বলতে বলতে মমতাজ বড় আবেগী হয়ে পড়েছিল, কিন্তু ওর উত্তেজনার মধ্যেও ছিল ভালবাসার স্পর্শ। সেই মুহূর্তে আমারও মনে হচ্ছিল, ধর্ম, দীন, ইমান, বিশ্বাস আমাদের শরীরে থাকে না, থাকে আত্মায়। ছুরি, তলোয়ার, বন্দুক দিয়ে তাদের হত্যা করা যায় না। আমি ওকে আবেগতাড়িত হয়ে বলেছিলাম, 'তুমি ঠিক কথা বলেছো।'

আবারও কিছুক্ষণ ভাবল মমতাজ। তারপর অস্বস্তির সঙ্গে বলতে লাগল, 'না, আমি ঠিক বলছি না। আমি যা সত্যিই বলতে চাই, তা স্পষ্ট করে বলতে পারিনি। ধর্ম বলতে আমি এমন কিছুকে বোঝাচ্ছি না যাতে আমরা নিরানব্বই শতাংশ মানুষ বন্দি হয়ে আছি। ধর্ম বা বিশ্বাস বলতে আমি সেই গুণকেই বুঝি যা আমাকে পাশের মানুষের থেকে উন্নত করে, এমন এক অলৌকিক আভা দেয় যাতে আমরা সত্যিই মানুষ হয়ে উঠি। কিন্তু সেই আভাটা কী? আমি তো তোমাদের হাতে করে দেখাতে পারব না।' তার চোখে আশ্চর্য এক আলো দেখা গেল আর সে নিজেকেই প্রশ্ন করতে শুরু করল, 'সেই লোকটার মধ্যে বিশেষ কী ছিল? ও একটা কট্টর হিন্দু ছিল, একটা নোংরা পেশায় জড়িয়ে থাকা মানুষ অথচ তার আত্ম, কী উজ্জ্বল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'কার?' আমি জিগ্যেস করেছিলাম।

'একটা বেশ্যার দালালের।'

আমরা তিনজনেই চমকে উঠেছিলাম। তার উচ্চারণে বিন্দুমাত্র মিথ্যে শালীনতা ছিল না। আমি আন্তরিক ভাবে জিগ্যেস করেছিলাম, 'বেশ্যার দালালের?'

মমতাজ মাথা নেড়েছিল, 'আমি অবাক হয়ে ভাবি, ও তো একটা সাধারণ মানুষ। তার চেয়েও বিস্ময়ের, বেশির ভাগ লোকের কাছে সে বেশ্যার দালাল মাত্র, অথচ তার আত্মা কী পবিত্র।'

মমতাজ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, যেন সে মনের ভিতরে পুরনো ঘটনাগুলিকে নতুন করে দেখতে পাচ্ছে। তারপর বলতে শুরু করেছিল, 'তার পুরো নাম মনে নেই...সহায় বা ওইরকম কিছু একটা হবে। বাড়ি ছিল বেনারসে। খুব পরিচ্ছন্নতা ভালবাসত...যে ছোট্ট ঘরটায় থাকত, তাকে সবসময় সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখত...পর্দা দিয়ে আড়াল তৈরি করেছিল...চারপাই ছিল না, তবে খদ্দেরদের জন্য মাদুর-বালিশের ব্যবস্থা ছিল...চাদর, বালিশের খোল সব সময় পরিষ্কার...একটা কাজের লোক ছিল কিন্তু সে নিজে হাতেই সব পরিষ্কার করত...সত্যি বলতে কি, নিজেই সব কাজ করত...কখনও মিথ্যে কথা বলেনি, কাউকে ঠকায়নি...বেশি রাত বলে যদি মদ না পাওয়া যেত তবে সে খদ্দেরদের বলে দিত, জল মেশানো সস্তা মদে টাকা খরচ না করাই ভাল...কোনও মেয়ের ব্যাপারে সন্দেহ হলে স্পষ্ট জানিয়ে দিত...একবার সে আমাকে বলেছিল, শেষ তিন বছরে ও কুড়ি হাজার টাকা রোজগার করেছে...মেয়েদের আনা প্রতি দশ টাকায় তার কমিশন ছিল আড়াই টাকা...তার ইচ্ছে আরও দশ হাজার রোজগার করবে...জানি না, কেন দশ হাজার, কেনই বা বেশি নয়। আমাকে বলেছিল, পুরো তিরিশ হাজার রোজগার করতে পারলে সে বেনারসে ফিরে গিয়ে কাপড়ের দোকান খুলবে। কেন কাপড়ের দোকান, কেন অন্য ব্যবসা না, তাও আমি জানি না।'

আমি নিজেকে সামলাতে না জোর বলে উঠলাম, 'আশ্চর্য মানুষ তো!'

মমতাজ বলে যেতে লাগল, 'আমি ভাবতাম, লোকটা একেবারে বোগাস, পা থেকে মাথা অব্দি জোচ্চোর। যে মেয়েদের দিয়ে ব্যবসা চালায়, তাদের সে নিজের কন্যাসম মনে করে এ-কথা বিশ্বাস করবে? একদিন জেনে অবাক হলাম, সে পোস্ট অফিসে প্রত্যেকটা মেয়ের জন্য সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছে, প্রতি মাসে তাদের আয় সে অ্যাকাউন্টে জমা করে দেয়। আরও অবাক ব্যাপার, দশ থেকে বারোটা মেয়ের থাকা-খাওয়ার খরচ সে নিজে দিত। ভাবতাম, ওর সব কথা আর কাজই বানানো চাতুরি।

'একদিন ওর ডেরায় যেতে বলল, "আমিনা আর সখিনার আজ ছুটি। আমি ওদের সপ্তাহে একদিন ছুটি দিই যাতে বাইরে গিয়ে আমিষ খাবার খেতে পারে। এখানে, আপনি তো জানেন, শুদ্ধ নিরামিষাশী।" আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে ভেবে মুচকি হাসলাম। আরেকদিন আমাকে বলল, আমেদাবাদের হিন্দু মেয়েটিকে নাকি এক মুসলমান খদ্দেরের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি এখন লাহোরে থাকে আর চিঠি লিখে জানিয়েছে দাতা সাহেবের মাজারে সে মানত করেছিল, তার ফলও মিলেছে। এবার নাকি মেয়েটি

~ www.amarboi.com ~

সহায়ের জন্য মানত করছে, যাতে তিরিশ হাজার টাকা জমিয়ে দেশে গিয়ে কাপড়ের দোকান খুলতে পারে। শুনে আমি হাসিতে ফেটে পড়লাম। ভেবেছিলাম, আমি মুসলমান বলেই লোকটা আমাকে খুশি করার জন্য এইসব বলছে।'

মমতাজকে জিগ্যেস করলাম, 'তোমার ভাবনা ভুল ছিল?'

'এক্কেবারে ; তার কথার আর কাজে কোনও ফারাক ছিল না। ওর হয়তো কিছু দোষ ছিল, সন্দেহ নেই। হয়তো অনেক ভুল করেছিল, যা আমরা সকলেই করি। কিন্তু, আমি বলছি, ও এক অপূর্ব মানুষ, আমার জানাশোনার মধ্যে সবচেয়ে ভাল।'

যুগল জিগ্যেস করেছিল, 'কীভাবে জানতে পারলে?'

'ওর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।' কথাটা বলেই মমতাজ চুপ করে গিয়েছিল। আকাশ ও সমুদ্র যেখানে অস্পষ্টভাবে মিশেছে, সেই দিগন্তের দিকে সে তাকিয়ে থাকল। দীর্ঘ নীরবতার পর বলতে শুরু করেছিল, 'দাঙ্গা তখন শুরু হয়ে গেছে। একদিন খুব সকালে আমি ভিণ্ডি বাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। কারফিউ চলছিল, লোকজন রাস্তায় খুবই কম। ট্রাম চলছিল না। ট্যাক্সির খোঁজে জে জে হাসপাতালের কাছে পৌঁছে দেখি, ফুটপাথে একটা লোক পড়ে আছে, তার পাশে একটা বেতের ঝুড়ি। ভাবলাম, রাস্তার কোনও লোক ফুটপাথে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু রাস্তার ওপর জমাট রক্ত দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তার মানে, ব্যাপারটা খুন। চলে যাওয়ার সময় লক্ষ করলাম, শরীরটা একটু নড়ছে। চারপাশে তাকালাম। রাস্তায় কেউ নেই। লোকটাকে কাছ থেকে দেখার জন্য ঝুঁকে পড়লাম। সহায়ের পরিচিত মুখ, রক্ত আর নোংরায় মাখামাখি। ফুটপাথে ওর পাশেই বসে পড়লাম, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওকে দেখছিলাম। ওর ধবধবে সাদা জামা রক্তে ভিজে গেছে। তার মানে বুকেই আঘাত করা হয়েছে। খুব আস্তে গোঙাচ্ছিল, আমি কাঁধ ধরে ঠেলতে লাগলাম। ওর অর্ধেক নামটুকু ধরেই ডাকতে লাগলাম। যখন চলে যাওয়ার জন্য উঠে পড়ছি, ও চোখ খুলে তাকাল। আধ-খোলা চোখে, পলকহীন সে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর হঠাৎই ওর শরীরে কাঁপুনির স্রোত বয়ে গেল, আমাকে চিনতে পেরে বলে উঠল 'আপনি...আপনি!'

'আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছিলাম। তুমি এখানে কীভাবে এলে? কীভাবে আহত হলে? ফুটপাথে কতক্ষণ পড়ে আছো? কাছের হাসপাতালে খবর দেব?

'উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না ওর। আমার সব প্রশ্ন শেষ হয়ে যাওয়ার পর ও শুধু বলতে পারল, "আমার সময় এসে গেছে—ভগবানের ইচ্ছা।"

'ভগবানের ইচ্ছা কী আমি জানি না, কিন্তু আমি যা জানতাম, তা মেনে নিতে পারিনি : মুসলমান-অধ্যুষিত এলাকায় দাঁড়িয়ে আমি একজনকে মরে যেতে দেখছি—মানুষটা হিন্দু—আর আমি ভাল করেই জানি, যে ওকে আক্রমণ করেছে, সে মুসলমান আর মৃত্যুর দরজায় শুয়ে থাকা মানুষটার সামনে দাঁড়িয়ে আমিও একজন মুসলমান, আমি ভীতু নই, কিন্তু সেই মুহূর্তে অনেক ভীতুর চেয়ে আমি ভীতু। মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষের সঙ্গে আমাকে ধরা হবে ভেবে আতঙ্কিত হয়েছিলাম, অভিযুক্ত যদি নাও হই, আমাকে তো গ্রেফতার করা হবে, জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে

~ www.amarboi.com ~

ভাবতেও ইতস্তত করছিলাম : ওকে যে এমন মারাত্মক ভাবে আঘাত করেছে, তার ওপর শোধ তুলতে যদি আমাকে ফাঁসিয়ে দেয়? সহায় জানত, ও মরছে ; তার হারানোর আর কী আছে? আমি চলে যাচ্ছিলাম—বলতে পারো পালিয়ে যাচ্ছিলাম—সহায় আমার নাম ধরে ডাকল। আমি থেমে গেলাম, থাকতে চাইনি, তবু দাঁড়িয়ে পড়তে হল। ওর দিকে তাকিয়ে যেন বলছিলাম : তাড়াতাড়ি মরো, আমাকে যেতে হবে।

'যন্ত্রণায় দুমড়ে-মুচড়ে ও রক্তমাখা জামার বোতাম খুলে ভেতরে হাত ঢোকাল। শত চেষ্টাতেও ও কিছু করতে পারল না, আরও নেতিয়ে পড়ল। তারপর আমাকে বলল, 'আমার ফতুয়ার ভেতরটা একটু দেখুন। কিছু গয়না আর বারশো টাকা পাবেন...ওগুলো সুলতানার...নিরাপদে রাখার জন্য এক বন্ধুর কাছে দিয়েছিলাম...ওগুলো ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলাম...সুলতানাকে পাঠাতে চেয়েছিলাম, কারণ...আপনি তো জানেন...দিন দিন পরিস্থিতি খুব খারাপ হচ্ছে...ওগুলো নিন...সুলতানকে দেবেন...ওকে বলবেন, চলে যেতে...এক্ষুনি... আপনি...আপনি নিজের দিকে খেয়াল রাখবেন।"

গল্প শেষ করে মমতাজ নীরবতায় ডুবে গিয়েছিল। আমি ভাবছিলাম, ওর আর সহায়ের কণ্ঠস্বর—জে জে হাসপাতালের পাশের ফুটপাথে যা শেষবার শোনা গিয়েছিল—এক হয়ে যাচ্ছে, যেমন দূর দিগন্তের অস্পষ্টতায় সমুদ্র ও আকাশ এক হয়ে গেছে।

জাহাজের ভোঁ বেজে উঠলে মমতাজ বলেছিল, 'আমি সুলতানার কাছে গিয়ে ওকে টাকা আর গয়না দিয়ে এসেছিলাম। ওর দুই চোখ জলে ভরে উঠেছিল।'

বিদায় জানিয়ে আমরা জাহাজ থেকে নেমে পড়েছিলাম। মমতাজ ডেকে দাঁড়িয়ে ডান হাত নাড়ছিল। যুগলকে বললাম, 'মনে হয় না, মমতাজ সহায়ের আত্মাকে ওর সঙ্গে যাওয়ার জন্য ডাকছে?

যুগল বলেছিল, 'ইচ্ছে হয়, আমিই সহায়ের আত্মা হয়ে যাই।'

ভাষান্তর : রবিশংকর বল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাম খিলবান

আমি সদ্য একটা ছারপোকা মেরেছি। ট্রাঙ্কের পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎই সঈদ ভাইজানের একটা ছবি খুঁজে পেলাম। টেবিলের ওপর রাখা খালি ফ্রেমে ছবিটা রেখে আমি ধোপার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

প্রতি রোববারই আমাকে এভাবে অপেক্ষা করতে হয়। কারণ সপ্তাহান্তে আমার পরিষ্কার জামা-কাপড়ের যোগান কমে আসে। একে অবশ্য যোগান বলা যায় না, কেননা সেই চরম অভাবের দিনগুলিতে সপ্তাহে হয়তো পাঁচদিন পরিষ্কার পোশাক পরার ক্ষমতা আমার ছিল। ইতিমধ্যে আমার বিয়ের কথাবার্তাও চলছিল, সেই সুবাদে গত দুতিনটে রোববার আমাকে মাহিমে যেতে হয়েছে।

আমার ধোপাটি খুবই ভালমানুষ। ওকে নিয়মিত টাকাপয়সা না দিতে পারলেও ও আমাকে প্রতি রোববার সকাল দশটার মধ্যে জামাকাপড় দিয়ে যেত। আমার তো মাঝে মধ্যেই চিন্তা হয় যে ঠিকমত টাকা না দেবার জন্য ও না আবার আমার জামাকাপড় খোলা বাজারে বিক্রি করে দেয়। তবে তো নিজের বিয়ের আলাপ আলোচনার যেতে হলে আমায় কোনও ধোপদুরস্ত জামা কাপড়ই থাকবে না। তেমন কিছু ঘটলে চরম অপমানকর পরিস্থিতিতে পড়তে হবে।

মরা ছারপোকার নোংরা গন্ধে আমার ঘর ভরে গেছে। ধোপা এলে এ-থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, ভাবছিলাম। তক্ষুনি 'সালাম সাব' বলে বিশাল বোচকা নিয়ে সে হাজির, বোচকা খুলে আমার ইস্ত্রি করা জামাগুলি টেবিলে রাখল। এই কাজটা করার সময় টেবিলের উপর রাখা সঈদ ভাইজানের ফটোর দিকে ওর চোখ গেল। বেশ কিছুক্ষণ ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ও বলে উঠল, 'হ্যাঁ। ইনি, ইনি, ইনিই তো।'

'কী হয়েছে?' আমি জিগ্যেস করলাম।

তার চোখ ছবিতে আটকে গেছে, 'কিন্তু ইনি, ইনি তো ব্যারিস্টার সঈদ সেলিম।'

'তুমি ওঁকে চেনো নাকি?'

সে জোরে মাথা নাড়িয়ে বলল, 'বিলকুল দুভাই। কোলাবাতে থাকতেন সঈদ সেলিম, ব্যারিস্টার। আমি ওঁর জামাকাপড় কাচতাম।'

~ www.amarboi.com ~

সঈদ হাসান ভাইজান আর মাহমুদ হাসান ভাইজান ফিজি যাওয়ার আগে একবছর বম্বেতে প্র্যাকটিশ করেছিলেন, তবে তা বেশ কয়েক বছর আগে।

'তুমি কি বছর কয়েক আগের কথা বলছ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

সে জোরে মাথা নাচিয়ে বলল, 'সঈদ সালিম সাব চলে যাবার সময় আমাকে নতুন পাগড়ি, ধুতি ও কুর্তা দিয়েছিলেন। চমৎকার লোক ছিলেন। একজনের লম্বা দাড়ি ছিল।' এই বলে সে হাত দিয়ে দাড়ির দৈর্ঘ্য দেখাল। তারপর সঈদ ভাইজানের ছবির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইনি হচ্ছেন ছোট ভাই। ওঁর তিনটে ছোট বাচ্চা ছিল, দুই ছেলে, এক মেয়ে, ওরা আমার সঙ্গে খেলতে খুব ভালবাসত। কোলাবাতে ওদের বিশাল বাড়ি ছিল।'

আমি ধোপাকে বললাম, 'ওরা আমার ভাই।'

ধোপা অবাক হয়ে বলল, 'ইনি, ইনি, এঁরা?' আবার বলে উঠল 'সঈদ সেলিম ব্যারিস্টার?'

ওর কৌতূহল কমাবার জন্য আমি বললাম, 'এটা সৈয়দ হাসানের ছবি আর যাঁর দাড়ি আছে তিনি হচ্ছেন বড় ভাই মাহমুদ হাসান।'

ধোপার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল, তারপর বড় বড় চোখে আমার ঘরের মালিন্য দেখছিল। ছোট্ট একটা ঘর, সেখানে বিদ্যুতের আলো পর্যন্ত নেই। ঘরে একটা টেবিল চেয়ার আর অসংখ্য মৃত ছারপোকার দাগে ভর্তি চাদর দিয়ে ঢাকা একটা খাট। আমি যে সত্যিই ব্যারিস্টার সৈয়দ সেলিমের ভাই তা বিশ্বাস করতে পারছিল না, কিন্তু আমি যখন ওকে দাদার সম্পর্কে নানা গল্প করলাম তখন সে অবিশ্বাসীর মতো মাথা নাড়িয়ে বলল, 'ব্যারিস্টার সৈয়দ সেলিম কোলাবাতে থাকতেন আর আপনি এখানে? এটা কী করে সম্ভব?'

আমিও দার্শনিকের মতো উত্তর দিলাম, 'কী বলব ভাই, এই বিশ্বের নানা রূপ, নানা রং। সূর্যের কিরণ কি সব জায়গায় পৌঁছায়, অনেকে আঁধারেই থাকে। মানুষের পাঁচটা আঙুল কি সমান হয়?'

'যা বলেছেন স্যার, এটাই সত্যি।'

বলে সে তার বোচকা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ও আমার কাছে কত টাকা পাবে সেটা আমি মনে মনে হিসেব করছিলাম। যদিও আমার পকেটে তখন মাত্র আট আনা পয়সা রয়েছে, সেটা দিয়ে কোনওরকমে মাহিমে যাওয়া ও ফেরা হবে। শুধু একমাত্র ভরসা যে ও জানে আমি সম্পূর্ণ আদর্শহীন নই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ধোবি তুমি নিশ্চয় হিসেবটা ঠিকঠাক রেখেছ। ঈশ্বরই জানেন তোমার কাছে আমার কত বাকি হয়ে গেছে।'

ধোপা তার ধুতির কোচা টান করে বলল, 'বাবু আমি কোনও হিসেব রাখি না। আমি এক বছর ব্যারিস্টার সঈদ সেলিমের কাপড় ধুয়েছি। উনি আমাকে যা দিতেন আমি নিয়ে নিতাম, কী করে হিসেব রাখতে হয় আমি সেসব জানি না।'

সে চলে যাবার পর আমি মাহিমে যাবার জন্য তৈরি হলাম।

দুপক্ষের আলাপ আলোচনার পর বিয়ে স্থির হয়ে গেল। বিয়ের পর আমার আর্থিক

~ www.amarboi.com ~

অবস্থাও ভাল হল। আমি বম্বেতে পিরখান এলাকার মাসিক নয় টাকার এক কামরার ঘর ছেড়ে ক্লেয়ার রোডে মাসিক ৩৫ টাকা ভাড়ার ফ্ল্যাটে উঠে এলাম। আমার ধোপাও নিয়মিত তার টাকা পেয়ে যাচ্ছিল।

আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় ও খুবই খুশি হয়েছিল। সে একদিন আমার স্ত্রীকে বলল, 'বেগমসাহেবা, সাহেবের ভাই ব্যারিস্টার সঈদ সেলিম খুব বড়লোক ছিলেন। উনি কোলাবাতে থাকতেন। উনি দেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় আমাকে একটা ধুতি, পাগড়ি ও কুর্তা দিয়েছিলেন। আপনার মিয়াও একদিন ধনী হবেন।'

আমি আমার বেগমকে আমার সেই চরম দারিদ্র্যের দিনে ধোপার বদান্যতা ও পুরনো ছবি খুঁজে পাবার গল্প বলেছি। আমি যখন পেরেছি ওকে টাকা দিয়েছি।

কিছুদিন পর বউ আমাকে জানাল, ধোপা নাকি কোনও হিসেবই রাখে না।

আমি বললাম, 'ও আমার কাছে গত চার বছর ধরে কাজ করছে। কোনও দিনই ও হিসেব রাখেনি।'

বউ বলল, 'হিসেব রাখতে যাবে কেন? এভাবে দু থেকে চারগুণ টাকা নেওয়া যায়।'

'কী করে?'

'তোমার কোনও ধারণা নেই, আইবুড়ো মালিকের সংসারে এরা তাদের বোকা বানাতে ওস্তাদ।'

ধোপার হিসেব না রাখার জন্যে প্রতি মাসেই আমার বউ ও ধোপার মধ্যে মতবিরোধ হত। বেচারা ধোপা সরল মানুষের মতো কথার উত্তর দিত। সে একদিন বলল, 'বেগম সাহেবা, আমি হিসেবনিকেশ জানি না, কিন্তু এটা জানি যে আপনি মিথ্যে বলবেন না। সাহেবের ভাই ব্যারিস্টার সঈদ সেলিমের বাড়িতে আমি এক বছর কাজ করেছি। তাঁর বেগম আমায় বলতেন 'এই যে তোমার পাওনা টাকা।' আমি বলতাম 'ঠিক আছে।'

একবার একমাসে দেড়শটা কাপড় ধুতে দেওয়া হয়েছিল। ধোপাকে পরীক্ষা করার জন্য আমার স্ত্রী ওকে বলল, 'দ্যাখো এই মাসে ষাটখানা কাপড় ধোয়া হয়েছে।'

'ঠিক আছে বেগম সাহেবা, আপনি তো ভুল বলবেন না।' যখন ধোপাকে আমার বেগম ষাটখানা কাপড়ের টাকা দিলেন, তখন সে টাকাটা কপালে ঠেকিয়ে চলে যাবার জন্য তৈরি হল।

বেগম সাহেবা ওকে ডেকে বললেন, 'দাঁড়াও আমি তোমাকে ষাটখানা নয় মোট দেড়শোটা কাপড় দিয়েছিলাম, এই নাও তোমার বাকি টাকা, আমি তোমার সঙ্গে মজা করছিলাম।'

'বেগম সাহেবা আপনি তো মিথ্যে বলবেন না,' এই বলে সে টাকাটা কপালে ঠেকিয়ে সেলাম করে চলে গেল।

আমার বিয়ের দু বছর পর আমরা দিল্লি চলে গেলাম। দিল্লিতে দেড় বছর থেকে আবার বম্বেতে ফিরে মাহিম এলাকায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিলাম। তিন মাসের মধ্যে আমরা চারবার ধোপা বদলেছি। এরা প্রত্যেকেই প্রচণ্ড উদ্ধত ও চালাক। প্রতি সপ্তাহে কাপড় ধুয়ে

~ www.amarboi.com ~

ইস্ত্রি করে আনার পর একটা না একটা ঘটনা ঘটত। কখনও ভালভাবে কাপড় ধোয়াই হত না, কখনও সব কাপড় একসঙ্গে ফেরত দিত না। আমাদের পুরনো ধোপার কথা খুব মনে পড়ত। ইতিমধ্যে আমরা যখন প্রায় সব ধোপাকেই চিনে নিয়েছি, সে সময় একদিন হঠাৎ সেই পুরনো ধোপার আবির্ভাব। সে এসে বলল, 'আমি একদিন সাহেবকে বাসে দেখেছি। ভাবলাম এটা কী করে সম্ভব, আমি বাইকুল্লাতে খোঁজ করলাম। আমাকে মাহিমে খোঁজ করতে বলা হল। পাশের ফ্ল্যাটেই আমার সাহেবের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল, তাই চলে এলাম।' আমাদের খুব আনন্দ হল। যাক বাবা, শেষমেষ কাপড় ধোয়ার সমস্যা মিটল।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস করকার ক্ষমতায় এসে মদ্যপানে নিষেধাজ্ঞা জারি করল। যদিও বিদেশি মদ তখনও পাওয়া যেত, কিন্তু দেশি মদ তৈরি ও বিক্রি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। তখন প্রায় ৯০ শতাংশ ধোপাই মদ খেত। সারাদিন সাবান ও জলের মধ্যে কাটিয়ে সন্ধেবেলা মদ্যপান ওদের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। আমাদের ধোপা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তখন তার সঙ্গীরা ওকে গোপনে বিক্রি হওয়া চোলাই মদ খাইয়ে সুস্থ করার চেষ্টা করছিল। ফলে হিতে বিপরীত হল। ও মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্রায় মারা যাবার মতো পরিস্থিতি দেখা দিল।

সে সময় আমিও কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, রোজ সকাল ছটায় বেরিয়ে ফিরতাম প্রায় রাত দশটা সাড়ে দশটায়। কিন্তু আমার স্ত্রী যখন শুনল যে ধোপা প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছে তখনই সে ধোপার বাড়ি গিয়ে ওকে একজন চাকর ও ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাহায্যে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়, ডাক্তার ধোপার অবস্থা দেখে তার চিকিৎসার জন্য কোনও টাকা নিতে রাজি হচ্ছিলেন না। 'ডাক্তারসাহেব আপনি এই সুকর্মের কৃতিত্বটা একা নিতে পারবেন না।' আমার স্ত্রী এই কথা বলায় ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, 'ঠিক আছে আমি ওর চিকিৎসার অর্ধেক খরচ দেব।'

সময় মতো ধোপা সুস্থ হয়ে উঠল, কয়েকটা ইঞ্জেকশনে ওর পেটের সংক্রমন কমে গেল, কড়া ওষুধে দুর্বলতাও আস্তে আস্তে কেটে গেল। কয়েক মাসের মধ্যে ও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল আর আমাদের জন্য সবসময় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত, 'হে ভগবান, আমার সাহেবকে ব্যারিস্টার সঈদ সেলিমের মতো বড় লোক করে দাও। সাহেব যেন কোলাবাতে থাকতে পারে। হে ভগবান আমার সাহেবকে ছেলেমেয়ে দাও, প্রচুর অর্থ দাও। বেগমসাহেবা আমাকে গাড়ি করে ফোর্ট-এর কাছে বড় ডাক্তার দেখিয়ে সুস্থ করে তুলেছেন, ভগবান, তুমি বেগমসাহেবাকে সারা জীবন সুখে রেখো।'

এর মধ্যে কেটে গেল অনেক বছর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশেও নানা চাপানউতোর ঘটে গেল। ধোপা কিন্তু প্রতি রোববার আসত। ও তখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। ওর অসুস্থতার সময় আমাদের সাহায্য ও কখনই ভোলেনি, আমাদের মঙ্গল কামনায় সব সময় ও দোয়া করত। ও মদ্যপান সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিল। প্রথম দিকে একটু অসুবিধে ওর হত ঠিকই, কিন্তু পরে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। সারাদিন জল ঘাটার পরও ক্লান্তি কাটাতে ওর আর মদের প্রয়োজন হত না।

~ www.amarboi.com ~

এদিকে বিপদের দিন ঘনিয়ে এল। দেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রকাশ্যে ও রাত্রিতে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় মুসলমান ও মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে হিন্দু খুন হতে লাগল। আমার স্ত্রীও লাহোরে চলে গেল।

দেশের পরিস্থিতির অবনতি দেখে আমি একদিন ধোপাকে বললাম, 'তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি আর এখানে কাজ করো না। এটা সম্পূর্ণ মুসলমান এলাকা। তুমি নিশ্চয়ই খুন হতে চাও না।'

ধোপা মুচকি হেসে বলল, 'সাহেব আমাকে কেউ মারবে না।'

আমাদের অঞ্চলে প্রচুর সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছিল। কিন্তু ধোপা নিয়মিত আমার কাছে আসত।

এক রবিবার সকালে আমি বাড়িতে খবরের কাগজ পড়ছিলাম। খেলার পাতায় ক্রিকেটের স্কোর আর প্রথম পাতায় দাঙ্গায় হিন্দু মুসলমানের খুন হবার খবর। আমি যখন দুটো খবরের পরিসংখ্যান মিলিয়ে দেখছিলাম ঠিক সেই সময় ধোপা এসে হাজির। আমি খাতা খুলে কাপড়ের হিসেব মেলাতে লাগলাম। ধোপাও হাসতে হাসতে আড্ডা শুরু করল, 'ব্যারিস্টার সঈদ সেলিম চমৎকার মানুষ ছিলেন। উনি চলে যাবার সময় আমাকে একটা পাগড়ি, ধুতি ও কুর্তা দিয়েছিলেন। আপনার বেগমসাহেবাও একেবারে খাঁটি রত্ন। উনি তো ওঁর দেশে চলে গেছেন, তাই না? আপনি যদি ওনাকে চিঠি দেন তবে আমার 'সেলাম' জানাবেন। উনি গাড়ি নিয়ে আমার বাড়িতে এসেছিলেন। বাপরে বাপ কি সাংঘাতিক পেটের অসুখ হয়েছিল আমার। ডাক্তার আমাকে একটা ইঞ্জেকশন দিয়েছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে গেছিলাম। আপনি চিঠিতে ওঁকে আমার 'সেলাম' জানাবেন। ওনাকে বলবেন রাম খিলবানকে একটা চিঠি দিতে।'

আমি ওকে থামিয়ে বললাম, 'তুমি কি আবার মদ খাওয়া শুরু করেছ?'

সে হেসে বলল, 'মদ? মদ কোথায় পাব?'

আমার মনে হল আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ধোপাও ময়লা কাপড়ের বোচকা নিয়ে চলে গেল।

কিছুদিনের মধ্যে পরিস্থিতি আরও খারাপ হল। লাহোর থেকে একটার পর একটা তারবার্তা আসছিল : 'সব কিছু ছেড়ে এখুনি চলে এস।' সপ্তাহের শুরুতে আমি ঠিক করেছিলাম যে রবিবার চলে যাব, কিন্তু এমনই অবস্থা দাঁড়াল যে পরের দিন সকালে যাবার জন্য তৈরি হতে হল।

কিন্তু জামাকাপড় তো ধোপার কাছেই ছিল। আমি ঠিক করলাম কারফিউ শুরু হবার আগেই ওর কাছ থেকে সব নিয়ে আসব। বিকেলে ভিক্টোরিয়ায় চেপে আমি মহালক্ষ্মীতে গেলাম।

কারফিউ শুরু হবার আরও এক ঘন্টা বাকি ছিল, রাস্তায় যথেষ্ট গাড়িঘোড়া ও ট্রাম চলছিল, আমার ভিক্টোরিয়া যখন ব্রিজের কাছে পৌঁছল তখনই হঠাৎ চারধারে গণ্ডগোল শুরু হল। চারদিকে পাগলের মত লোক ছুটে চলেছে। মনে হচ্ছে যেন ষাঁড়ের লড়াই শুরু

~ www.amarboi.com ~

হয়েছে। ভিড়টা একটু হালকা হতেই আমি দূর থেকে দেখলাম লাঠি হাতে নিয়ে প্রচুর ধোপা নেচে চলেছে। অদ্ভুত ব্যাপার, ওদের গলা দিয়ে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেরুচ্ছে। আমি চালককে এগোতে বললাম, কিন্তু সে রাজি হল না। আমি ভাড়া মিটিয়ে হেঁটে রওনা দিলাম। ধোপাদের কাছে যাওয়া মাত্রই ওরা আমাকে দেখে চুপ করে গেল।

আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'রাম খিলবানের বাড়ি কোথায়?' তখন অন্য এক ধোপা লাঠি হাতে দৌড়ে এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'উনি কী জিজ্ঞেস করছেন?'

'উনি জানতে চাইছেন রাম খিলবান কোথায় থাকে?'

মদ খেয়ে চুর হওয়া সেই ধোপা আমার কাছে এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'তুই কে রে?'

'আমি? রাম খিলবান আমার ধোপা।'

'রাম খিলবান তোর ধোপা? তবে কোন ধোপার বাচ্চা তুই?

একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'হিন্দু ধোপা না মুসলমান ধোপা?'

মাতাল ধোপার দল লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে আমার চারধারে ঘিরে ধরল। আমাকে ওদের একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে : 'আমি মুসলমান না হিন্দু?' আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। ওরা চারপাশে আমাকে এমনভাবে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল যে দৌড়ে পালাবার পথও ছিল না। কাছাকাছি কোন পুলিশও ছিল না যে আমি সাহায্যের জন্য চিৎকার করব। ভয়ে আঁতকে আমি ভাঙা ভাঙা কথায় বলতে শুরু করলাম, 'রাম খিলবান হিন্দু...আমি জানতে চাইছি ও কোথায় থাকে...ওর ঘর কোনটা...গত দশ বছর ধরে ও আমার কাজ করত...ও খুবই অসুস্থ ছিল...আমি ওর চিকিৎসা করিয়েছি...আমার বেগম...আমার মেমসাহেব গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন...' এই পর্যন্ত বলার পর আমার নিজের উপরই সাংঘাতিক করুণা হচ্ছিল। আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম, আমার নিজের উপর করুণা হচ্ছিল। এই দুরবস্থা আমাকে অসহায় করে তুলেছিল। 'আমি একজন মুসলমান।'

ধোপার দল চারপাশ থেকে চিৎকার করে উঠল, 'মার, মার, মেরে ফেল।'

হঠাৎ এক ধোপা চোখ গোল করে চেঁচিয়ে বলে উঠল 'দাঁড়াও, রাম খিলবানই ওকে মারবে'।

আমি ঘুরে তাকিয়ে দেখলাম, একটা ভারী কুড়ুল হাতে নিয়ে রাম খিলবান দাঁড়িয়ে আছে। সে আমার দিকে তাকিয়ে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ওর ভাষায় অকথ্য গালিগালাজ করে চলল। কোদালটাকে মাথার উপরে তুলে সে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল।

'রাম খিলবান!' আমি হুকুমের স্বরে ডাকলাম।

'চোপ, মুখ বন্ধ কর।' ও চিৎকার করে উঠল রাম খিলবান।

আমার শেষ আশাটাও নিভে গেল, যখন ও আমার কাছে এল, আমি নম্রস্বরে বললাম, 'তুমি কি আমায় চিনতে পারছ না, রাম খিলবান?'

রাম খিলবান মারার জন্য কুড়লটা ওঠাল। কিন্তু হঠাৎ আমাকে দেখে ও চোখ ছোট

~ www.amarboi.com ~

করে তাকাল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ওর হাত থেকে কুড়ুলটা পড়ে গেল। সে কাছে এগিয়ে এসে আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে কেঁদে বলে উঠল, 'সাহেব'।

ও তার সঙ্গীদের দিকে ঘুরে বলল, 'উনি মুসলমান নন। ইনি আমার সাব, বেগম সাহেবার সাব। আমার অসুস্থতার সময় বেগম সাহেবা আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

রাম খিলবান অন্য ধোপাদের প্রাণপনে বোঝাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু প্রত্যেকেই মাতাল ছিল বলে কিছুই শুনছিল না। ওরা রাম খিলবানকে চারপাশ দিয়ে ঘিরে ধরেছিল, ওদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়েছিল—এই ফাঁকে সুযোগ বুঝে আমি সরে পড়লাম।

পরের দিন সকাল নটা নাগাদ আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে তৈরি হয়ে টিকিটের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমার এক বন্ধু ব্ল্যাকে টিকিট কাটতে গেছে।

নিজেকে খুব অস্থির লাগছিল। তাড়াতাড়ি টিকিট এসে গেলেই বন্দরে পৌঁছে যাব। যদি কোনও কারণে দেরি হয়ে যায় তবে এই ফ্ল্যাটেই আমাকে বন্দি হয়ে থাকতে হবে।

দরজায় হঠাৎ টোকা পড়ল। আমি ভাবলাম বন্ধু নিশ্চয়ই টিকিট নিয়ে এসে গেছে। দরজা খুলেই দেখলাম ধোপা দাঁড়িয়ে আছে।

'সেলাম সাব।'

'সেলাম।'

'ভেতরে আসতে পারি?'

'এস।'

ও চুপচাপ ভেতরে এল। কাপড়ের বোচকা খুলে ধোয়া শার্টপ্যান্ট বিছানায় রাখল। ধুতির খুঁট দিয়ে চোখ মুছে বলল, 'আপনি চলে যাচ্ছেন সাহেব?'

'হ্যাঁ।'

ও কাঁদতে লাগল, 'সাহেব আমায় ক্ষমা করে দিন, এসব ঘটেছে শুধু মদ খাওয়ার জন্য...আর...এখন তো সব এমনিই পাওয়া যাচ্ছে। ব্যবসায়ীরা মদ বিলাচ্ছে আর বলছে, মদ খাও আর মুসলমানদের খুন করো। বিনে পয়সায় মদ পেলে কেউ কি ছেড়ে দেয়? দয়া করে আমায় ক্ষমা করে দিন। আমি ইচ্ছে করে কিছু করিনি। মদ খেয়েছিলাম বলেই যত ঝামেলা হল। ব্যারিস্টার সঈদ সেলিম আমাকে একটা পাগড়ি, ধুতি ও কুর্তা দিয়েছিলেন, বেগম সাহেবা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, পেটের অসুখে আমি মারা পড়তাম। উনি গাড়ি নিয়ে এসে আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, আমার চিকিৎসার জন্য উনি প্রচুর টাকা খরচ করেছিলেন, আপনি একটা নতুন দেশে যাচ্ছেন দয়া করে আপনি বেগম সাহেবাকে বলবেন না যে রাম খিলবান...'

ওর গলা কান্নায় বুজে এল। বোচকাটা কাঁধে নিয়ে ও দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আমি ওকে বললাম 'রাম খিলবান শোনো...।' কিন্তু ও ধুতির কোচা ঠিক করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ভাষান্তর : কৃষ্ণা চক্রবর্তী

~ www.amarboi.com ~

তু-তু

আমি ভাবছিলাম যখন পৃথিবীর প্রথম নারী সন্তানের জন্ম দিয়েছিল তখন তার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। হয়ত তার স্বামী উজ্জ্বল দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ আমি একজন বাবা!'

হঠাৎ, টেলিফোনটা বেজে উঠতে আমার চিন্তার ব্যাঘাত ঘটল। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে বারান্দা থেকে আমার ঘরে আসতে হল। অবাধ্য শিশুর মতো ফোনটা বেজেই চলল।

টেলিফোন বাড়ির একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু এই হঠাৎ করে বেজে ওঠাটা আমার একেবারেই পছন্দ নয়।

আমি ফোনটা তুলে বললাম ৪৪৫৬ বলছি। অন্য দিক থেকে শুধু হ্যালো শোনা যাচ্ছিল।

আমি রেগে চিৎকার করে বললাম, 'কে বলছেন?'

'তাহিরা বলছি।'

'আপনি কাকে চান?'

'মেমসাহেব কি আছেন?'

'হ্যাঁ, ধরুন।'

আমি ফোনটা নামিয়ে মেমসাহেবকে ডাকলাম।

যতদূর মনে পড়ছে, আমার স্ত্রী তখন ঘুমোচ্ছিল। আমার গলার স্বর শুনে সে হাই তুলতে তুলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল : 'মেমসাহেবকে আবার কী দরকার হল?'

আমি হেসে বললাম 'তোমার একটা ফোন এসেছে।'

'কে ফোন করেছে?'

'তুমি নিজেই দেখে নাও।'

আমি আবার বারন্দায় ফিরে গেলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার স্ত্রী ফোনটা তুলে হ্যালো বলল। যখন মহিলারা ফোনে গল্প করে তাদের গল্প আর শেষ হতেই চায় না। আমার মনে হয়, এই কারণেই মিনিট পনেরো যাবত শুধু হ্যালো হ্যালোই শুনলাম।

কেন লোকজন প্রত্যেকটা কথার পর হ্যালো হ্যালো বলে? আমার মনে হয় তারা তাদের অযৌক্তিকতাকে আড়াল করার জন্যই কথাবার্তা চালিয়ে যায়। অথবা তারা ভাবে, যার সঙ্গে কথা বলছে সে হয়ত কথা শেষ হয়ে গেছে ভেবে লাইনটা কেটে দিতে পারে। হয়ত এটাই এদের বদ অভ্যাস।

হঠাৎ আমার স্ত্রী বারান্দায় এসে আমাকে বলল, 'সদত, ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছে!'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন ব্যাপারটা?'

'তাহিরা আর ইয়াজদানির ঝগড়া। ওরা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে যেখান থেকে ফেরা প্রায় অসম্ভব। ইয়াজদানি চায় এক্ষুনি তুমি ওদের বাড়ি যাও।'

ইয়াজদানির বাড়িতে যাওয়ার পথে আমাদের মাথায় এলোপাথাড়ি চিন্তা ঘুরছিল। বাড়িতে পৌঁছে প্রচণ্ড গোলমাল কানে এল। দুজন দুজনকে তারস্বরে অতি নোংরা ভাষায় অভিশাপ দিচ্ছে।

অবশেষে যখন দুজনের মাথা ঠাণ্ডা হল, তখন আমরা মূল সমস্যাটা বুঝতে পারলাম। তাহিরা অভিযোগ করল যে ইয়াজদানির একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক চলছে, ওদের দুজনকে ট্যাক্সিতে একসাথে ঘুরতে দেখা গেছে। ইয়াজদানি জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করল। তাহিরা এবার হলপ করে বলল। ইয়াজদানি আবারও প্রতিবাদ করল। তাহিরা বলল : 'একেবারে সাধুপুরুষ! আয়ষাকে তুমি একদিন চুমু খেতে যাওনি? আল্লার অনেক মেহেরবানি সেই সময় আমি না পৌঁছলে কী যে হত...'

'তোমার এসব নোংরা কথা অনেক হয়েছে।' ইয়াজদানি তাহিরাকে থামিয়ে দিল।

আবার নতুন করে ঝগড়া শুরু হল।

আমি এবং আমার স্ত্রী বহু চেষ্টা করেও ওদের থামাতে পারলাম না। ইয়াজদানি রাগত ভাবে আমার দিকে ফিরে বলল : 'এই মহিলার মুখে দুনিয়ার নোংরা কথার স্রোত বয়ে যায়! মন্টো সাহেব, আপনি প্লেব্যাক সিঙ্গার এনায়েতকে চেনেন?'

'হ্যাঁ, চিনি।'

'এক নম্বরের বদমাইশ! আর আমার স্ত্রী তাকে আমাদের বাড়িতে ডাকে...।'

'তাতে কী?' তাহিরা শাসিয়ে উঠল, 'তোমার যা মনে হয় তুমি সরাসরি বলছ না কেন?'

'কিছু না', ইয়াজদানি চাপা গলায় বিড় বিড় করে বলল।

'আমি জানি তুমি কী বলতে চাইছ।' চিৎকার করে উঠল তাহিরা, আর তার সুন্দর চুলগুলো এক ঝটকায় সামনে নিয়ে এল। 'তুমি বলতে চাও এনায়েত আমাকে ভালবাসে, তাই না?'

এর উত্তরে ইয়াজদানির মুখ থেকে গালাগালির বন্যা বয়ে গেল। আমাদের সামনেই

~ www.amarboi.com ~

ওরা আবার পুরনো ঝগড়ায় ফিরে গেল। আমাদের সব পরিশ্রম ব্যর্থ হল। পরিস্থিতি আরও গরম হয়ে উঠল।

ওরা আসলে কী চায় তা আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েও বুঝতে পারলাম না। আমি কিছুক্ষণ পর বিরক্ত হয়ে বললাম, 'শোনো তোমরা এই ঝগড়াঝাটি না করে বরং দুজনে আলাদা থাকার ব্যবস্থা কর।'

তাহিরা চুপ করে থাকল। কিন্তু ইয়াজদানি একটু চিন্তা করে বলল, 'ঠিক একদম ঠিক, একটাই রাস্তা খোলা আছে—তালাক দেওয়া।'

'তালাক! তালাক!' তাহিরা চিৎকার করে উঠল। 'কেন তুমি ব্যবস্থা করছ না? কে তোমাকে বাধা দিচ্ছে? আমি তো নয়ই!'

ইয়াজদানি দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, আমি তোমাকে খুব শিগগিরি তালাক দিচ্ছি।'

তাহিরা আবার তার চুলগুলিকে সামনের থেকে পিছনে নিয়ে ব্যঙ্গ করে বলল, 'আজই নয় কেন?'

ইয়াজদানি ঝড়ের বেগে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল। বলল, 'আজ না, এখুনি। আমি কাজিকে ফোন করছি।'

ব্যাপারটা আরও খারাপের দিকে গড়াতে লাগল। ইয়াজদানিকে আমি থামাবার চেষ্টা করলাম, 'কী বোকামো করছ? শান্ত হও!'

তাহিরা বলল, 'হ্যাঁ, আমি জানি কেন ও আমাকে তালাক দেবে। আসলে ও ওই অভিনেত্রীকে বিয়ে করবে।'

এরপর, ইয়াজদানি রাগে লাল হয়ে ঘুরে বলল, 'এর বেশি আমি সহ্য করব না!' সে চিৎকার করে উঠল, 'তাহিরা সীমার বাইরে চলে যাচ্ছ! মন্টো সাহেব, আমাকে আর আটকাবেন না!'

ইয়াজদানি টেলিফোন ডিরেকটরি থেকে কাজির ফোন নম্বর খুঁজতে লাগল। কিন্তু কাজিকে দু-দুবার ফোন করা সত্ত্বেও যোগাযোগ করতে পারল না। এই ফাঁকে আমি আবার কথা বলার সুযোগ পেলাম।

আমার স্ত্রী ইয়াজদানির দিকে এগিয়ে গিয়ে কাজিকে ফোন করতে বারণ করল। কিন্তু তাহিরা বাধা দিল। বলল, 'সফিয়া, ওকে করতে দাও। ওর মন বলে কিছু নেই! ও একটা পাথর! বিয়ের আগে ও আমাকে যে চিঠিগুলো লিখেছিল সেগুলো তোমায় দেখাব। সেই সময় আমি ওর অস্থির মনের আশ্রয় ছিলাম, আমার একটা চাউনিই ওর মন তোলপাড় করত! কিন্তু আজ...।'

ইয়াজদানি রাগের সঙ্গে ফোন ডায়াল করতে লাগল।

তাহিরা আমার দিকে ফিরে বলল : 'ভাইসাব, এই মানুষটা আপনাকে ভাই বলে মানে। কিন্তু কী করছে দেখুন! আপনি কাজিকে ফোন করতে বারণ করা সত্ত্বেও কেমন উদ্ধত হয়ে উঠছে!' সে খুব ভাঙা সুরে বলল।

আমি ইয়াজদানির কাছে গিয়ে রিসিভারটা ওর হাত থেকে নিয়ে নামিয়ে রেখে বললাম, 'যথেষ্ট হয়েছে, ইয়াজদানি! তোমার ব্যাপারটা কী?'

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'কিছু না', বলে সে আমার হাত থেকে ফোন কেড়ে নিতে চেষ্টা করল।

তাহিরা বলল, 'ওকে ফোনটা দিয়ে দিন ভাইসাব! ও কোনও কথাই শুনবে না! আমার কথা বাদ দিন, ওকে ফোনটা দিয়ে দিন; যদি একবারও ও তু-তু-র কথা ভাবত...'

ইয়াজদানি, একবার ফিরে তাকিয়ে বলল, 'তু-তু-এর কথা তুমি মুখেই আনবে না।'

'কেন?' তাহিরা রেগে গিয়ে বলল।

'তু-তু আমার।'

তাহিরা উঠে দাঁড়াল। 'যদি আমি তোমার কেউ না হই, তবে তু-তু কী করে তোমার হবে?'

ইয়াজদানি চিন্তিতভাবে মুহূর্তের জন্য ফিরে বলল, 'ও আমি বুঝে নেব।'

'মানে, তুমি তু-তু-কে আমার থেকে সরিয়ে নেবে?' তাহিরা ভয়ে ভয়ে বলল।

'হ্যাঁ', ইয়াজদানি জেদ করে বলল।

'তুমি একটা নিষ্ঠুর দৈত্য!' তাহিরা একথা বলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

ইয়াজদানি কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। সে হতভম্ব হয়ে গেল। তাহিরাকে সব রকম ভাবে সুস্থ করার জন্য দৌড়োদৌড়ি শুরু করল। অবশেষে ডাক্তারকে ফোন করতে দৌড়ল।

যখন তাহিরার জ্ঞান ফিরল ইয়াজদানি তার হাত ধরে আবেগে ভাঙা ভাঙা স্বরে বলল, 'তাহিরা তু-তু তোমারই!'

'না, না, তু-তু আমার নয়।' তাহিরা বলল, 'সে তোমারই!'

ইয়াজদানি তার জলভেজা চোখে চুম্বন করল এবং আর কোনও কথা বলতে দিল না। ইয়াজদানি বলল, 'আমিও তোমারই, তাহিরা...আর তু-তু আমাদেরই!'

আমি আমার স্ত্রী দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম, তারপর আমরা রওনা হলাম। 'তু-তু কে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ওদের সন্তান,' আমার স্ত্রী হাসল।

'ওদের সন্তান?' আমি আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

'হ্যাঁ, ওদের সন্তান!' সে হেসে আবার বলল।

'কিন্তু কখন ওদের সন্তান হল?' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'তার এখনও জন্ম হয়নি!' আমার স্ত্রী হাসতে হাসতে বলল। 'তবে সে আসছে!'

ভাষান্তর : রিঙ্কু বসু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাতটি জাদুফুল

যে-মুহূর্তে আমাদের দেখা হয়েছিল, আমরা বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম। আমি জানতাম যে তিনি একজন সৈয়দ এবং আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয়, যদিও তিনি একজন সৈয়দ এবং আমি একজন সাধারণ কাশ্মীরি হিসেবে এই আত্মীয়তার কোনও মানেই হয় না।

যাই হোক, এটার তেমন কোনও গুরুত্ব নেই। তিনি খুব বই পড়তে ভালবাসতেন। যখনই শুনলেন যে আমি গল্প লিখি তিনি আমার কাছে আমার লেখা কিছু বই ধার চাইলেন। পরে দেখলাম আমার বিখ্যাত গল্পগুলি তিনি শুধু পড়েছেন তা নয়, সেগুলির আবার প্রশংসাও করেছেন। এটা আমাকে খুব অবাক করেছিল। তিনি আমার প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁর পরিবার খুব বড় ছিল, কিন্তু ফ্ল্যাটটি খুব ছোট থাকায় ফ্ল্যাটের লাগোয়া গ্যারেজটিকে তিনি বৈঠকখানা ঘর হিসাবে ব্যবহার করতেন। ফ্ল্যাটটি মেয়েরাই ব্যবহার করত। শাহ সাহেব, যে নামে তিনি পরিচিত ছিলেন, গ্যারেজে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের ডেকে আমোদ-প্রমোদ করতেন।

একদিন শাহ সাহেব এবং আমি ছোটগল্প লেখা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'আমার জীবনের অনেক টুকরো টুকরো ঘটনা আছে যা নিয়ে ছোটগল্প লেখা যায়।' যেহেতু আমি সবসময়ই গল্পের বিষয় খুঁজি তাই আমি আগ্রহী হলাম। 'বেশ, আশা করি আপনার কাছ থেকে অনেক ভাল ভাল বিষয়বস্তু পাব।' আমি বললাম।

শাহ সাহেব বললেন, 'আমি লেখক নই, কিন্তু আমার জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে শুনলে আপনি উৎসাহিত হবেন। আমি জানি যে আপনি একজন গল্পলেখক তাই যে ঘটনাটা আমি বলব শুনে আপনি অবাক হবেন।'

'এতে অবাক হওয়ার কী আছে!' আমি বললাম। তার পরেই ভুল শুধরে নিয়ে বললাম, 'হতে পারে আপনার কাছে ঘটনাটা বিস্ময়কর।'

শাহ সাহেব বললেন, 'আমি কখনই দাবি করতে পারি না আমার বলা ঘটনা সকলের কাছেই আশ্চর্য লাগবে। আমি নিজের জন্যই বলছি, শোনার পরে আপনার মনে হবে যে বাস্তবে এর কোনও ব্যাখ্যাই চলে না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শাহ সাহেব নখ কাটতে কাটতে আমার সাথে কথা বলছিলেন। নখ কাটা শেষ হলে কাটারটা টেবিলে রেখে একটা সিগারেট ধরালেন এবং শুরু করলেন। 'আমি যখন কাবুলে থাকতাম সেখানে শহরের সবচেয়ে বড় জায়গায় আমার একটা খুব দামি দোকান ছিল। সেখানে মেয়েদের আনাগোনাই বেশি ছিল। একদিন দোকানে মেয়েদের থেকে ছেলেদের ভিড় বেশি হল, আশেপাশের পার্সি দোকানদাররা আমাকে ব্যঙ্গ করে বলল, 'আগা আজ কী হল? শহরের সব মেয়েরা কি মরে গেল? নাকি ভাগ্য আর তোমার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না?'

'আমি সবসময়ই এর জবাবে হাসতাম। আমি খুব ভাল কথা বলতাম, বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে। আমি ভাল দোকানদারও ছিলাম তাই আমার দোকানে মেয়েদের ভিড় বেশি হত। বুঝলেন মন্টো সাহেব, এই লাহোরে এমন কোনও দোকানদার নেই যে আমার দোকানদারিকে টপকে যেতে পারে। আমি শুধু কলেজেই পড়িনি, মনস্তত্ত্বের ছাত্রও ছিলাম, তাই মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে আমার অসুবিধা হত না। এটাই কাবুলে আমার সাফল্যের প্রধান চাবিকাঠি ছিল।'

'আপনার কথা শুনেই বুঝতে পারছি যে আপনি খুব ভাল কথা বলিয়ে।' আমি কথাটা একটু বাঁকা ভাবেই বললাম কারণ লোকটা নিজের ঢাক নিজেই পেটাচ্ছিল।

শাহ সাহেব হেসে বললেন, 'আমি একজন ভাল সেলস্‌ম্যানের মত করে গল্পটা বলতে পারব না।'

আমি বললাম, 'আপনি গল্পটা বলতে থাকুন।'

আমি দেখলাম এই ফাঁকে শাহ সাহেব গল্পটা নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন। তারপর তিনি বলতে শুরু করলেন, 'মন্টো সাহেব, দশ বছর আগের কথা, তখন আমার এখনকার থেকে বয়সও কম, শক্তিও বেশি। তখন আমি নিয়মিত শরীরচর্চা করতাম এবং সারাদিন দারুণ পরিশ্রম করতাম। সিগারেট বা মদ খেতাম না। শুধুমাত্র ভারতীয় খাবারের প্রতি আমার দুর্বলতা ছিল। অমৃতসর থেকে একজন কাশ্মীরি রাঁধুনিকে পেয়েছিলাম, সে যেন এক জাদুকর। সুন্দর জীবন চলছিল আর প্রচুর আয়ও ছিল। ব্যাঙ্কে আমার প্রচুর টাকা ছিল।'

শাহ সাহেব হঠাৎ করে চুপ করে গেলেন।

'আপনার এই নীরবতাই কি বলে দিচ্ছে না, সব থাকা সত্ত্বেও আপনি সত্যিই সুখী ছিলেন না?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'ঠিকই, সব থাকা সত্ত্বেও আমি সুখী ছিলাম না, কারণ আমি একা ছিলাম। যদি আমার দোকানে এত মহিলার সমাগম না হত তবে হয়ত এই একাকিত্ব আমাকে তাড়া করে ফিরত না। কাবুলে এমন কোনও ধনী পরিবার ছিল না যাদের বাড়ির মেয়েরা আমার দোকানে আসত না। তারা রাস্তা দিয়ে আসবার সময় বোরখা, ওড়না ও চাদর ব্যবহার করত। কিন্তু আমার দোকানে এসে স্বচ্ছন্দেই সেগুলি খুলে তারা বিদেশি পোশাকেই কেনাকাটা করত।'

শাহ সাহেব একটু থামলেন। তাঁকে আমি বললাম 'এত মেয়ের মধ্যে কেউ নিশ্চয় আপনার মন ছুঁয়ে যেত।'

~ www.amarboi.com ~

তিনি একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'একটি মেয়ে কখনই ওড়না সরাত না। হ্যাঁ, তাকেই আমার ভাল লাগত।'

'সে কে?'

'সে কাবুলের এক রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে এবং তার বাবা একজন দক্ষ আর্মি জেনারেল। তার মুখ আমি কখনও দেখিনি, শুধুমাত্র হাত দেখেই আমি তাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম।'

'কেন?'

'তা আমি বলতে পারব না এবং কখনও এর কারণ খোঁজারও চেষ্টা করিনি। আমি তাকে খুব সুন্দরী কল্পনা করতাম। সে আমার দোকানে খুব কম সময়ের জন্য আসত। জিনিস কিনত, চলে যেত।'

আমি বললাম 'এরকম কতদিন চলল?'

'মাস ছয়েক। আমি যে তাকে ভালবাসি সে কথা বলার সাহস আমার কোনদিনও হয়ে ওঠেনি। অন্যান্য মেয়েদের থেকে সে একটু আলাদাই ছিল। ওর ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করত। সে খুব রাশভারি ছিল। আমি তার থেকে চোখ ফেরাতে পারতাম না। আমি বুঝতাম এতে তার খুব অস্বস্তি হত। কিন্তু এ-ব্যাপারে আমি কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারতাম না। একদিন আমি দোকানে বসে তার কথা ভাবছি, হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। আমার কর্মচারী ফোনটা ধরে বলল একজন মহিলা ফোনে আছেন, তিনি আমার সাথে কথা বলতে চান। আমি ভাবলাম, কোনও কাস্টমার হয়ত দোকানে কোনও নতুন জিনিস এসেছে কিনা খোঁজ করছে। ফোনটা ধরে বললাম, 'ম্যাডাম আপনাকে আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি?' কিন্তু অবাক হলাম যখন দেখলাম যার কথা ভাবছিলাম তারই ফোন। তার স্বর আমার চেনা। 'আপনি কি সৈয়দ মুজফ্‌ফর আলি?' আমাকে জিজ্ঞাসা করল। আমি আমতা আমতা করে হ্যাঁ বললাম। মেয়েটি বলল, 'যখন আমি আপনার দোকানে যাই আপনি আমার দিকে অভদ্রের মত থাকিয়ে থাকেন। আমি আপনাকে বারণ করে দিচ্ছি।' আমি কিছু বলবার আগেই মেয়েটি ফোনটা কেটে দিল। ভাবলাম মেয়েটি আমাকে হুমকি দিল কেন?'

'সত্যিই কি হুমকি ছিল?' আমি বললাম।

'হুমকিই ছিল। ঘটনাটি ঘটার ঠিক চার দিন পর সে আমার দোকানে এল, আমি যথারীতি পলকহীনভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। মেয়েটি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে আমার কর্মচারীর সামনেই আমাকে বলল, 'আপনি বেহায়ার মত আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।' আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। তারপর সে কিছু জিনিসপত্র কিনে দাম দিয়ে গাড়ি করে চলে গেল।'

'ভারি অদ্ভুত মেয়ে তো! সে আপনাকে ঘৃণা করে অথচ নিয়মিত আপনার দোকানেও আসে,' আমি বললাম।

'মন্টো সাহেব, আমি বিশ্বাস করতে শুরু করলাম আমার চোখে যে ভালবাসা ছিল এটা তারই প্রতিক্রিয়া। একদিন মেয়েটি আমার সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করল যে আমি ঠিক

~ www.amarboi.com ~

করলাম তাকে আমি ভুলে যাব। কিন্তু আমি বহু চেষ্টা করেও পারলাম না। আমার মাথায় তার চিন্তা ঘোরাফেরা করতেই লাগল। নিজেকে খুব বোকা মনে হল, কোনদিন তার মুখও দেখিনি, তার কাছে থেকে ধিক্কার ছাড়া কিছুই পাইনি, তবুও তাকে আমি ভালবাসি। ভালবাসা একটা অদ্ভুত জিনিস। এই মোহ থেকে বেরিয়ে আসবার কোনও উপায় খুঁজে পেলাম না। আমি নিজেকে নিজে বোঝাতে লাগলাম, দেখ তোমার একটা চলতি ব্যবসা আছে এবং সারা শহরে তোমার খুব নামডাকও আছে, তবে কেন তুমি এমন বোকামো করছ? কিন্তু মন্টো সাহেব ভালবাসা একটা অদ্ভুত দৈত্য। আমার অনুভূতিকে কিছুতেই আমার হাতের মুঠোয় আনতে পারলাম না।'

'আপনার গল্প তো বেড়েই চলেছে, এবার শেষটা বলুন', আমি বললাম।

শাহ সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'বন্ধু এই গল্পগুলো সবসময় বড়ই হয়। ভালবাসা একটা অসুখ যা কিনা কুরে কুরে খায়। কিন্তু আমি আমার গল্পটা ছোট করার চেষ্টা করব। আমার ভালবাসা ক্রমে মোহে পরিণত হল। মেয়েটির কথা ছাড়া আর কোনও কিছুই আমি ভাবতে পারতাম না। আমি মাঝে মাঝেই হতাশায় ভুগতাম এবং কাঁদতাম। ঠিক সেই সময় সরদার বলবন্ত সিং মাজিথিয়ার সঙ্গে পরিচয় হল। আমার মতই তিনিও কাজের জন্যই অমৃতসর থেকে কাবুলে এসেছিলেন। তিনি কাবুলের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি করতেন। প্রায়শই তিনি আমার কাছে ছোটখাটো ধারের জন্য আসতেন। একদিন ঠিক একই কারণে তিনি আমার দোকানে এলেন। তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'বন্ধু মনে হচ্ছে আপনি কোন সমস্যায় পড়েছেন।' 'না, না ও কিছু নয়,' আমি বললাম। তিনি তাঁর লম্বা ঘন গোঁফের আড়াল থেকে হাসলেন। 'আপনি মিথ্যে বলছেন। আমাকে বলুন, আপনি কি কারোর প্রেমে পড়েছেন?' আমি চুপ করে থাকলাম। তিনি বললেন, 'আমি যা ভাবছি যদি তাই হয় তবে আপনাকে আমি সবরকমভাবে সাহায্য করতে রাজি আছি।' একথা শোনার পরে তাঁকে আমি আমার ঘটনাটা খুলে বললাম।

'উনি আপনাকে কী পরামর্শ দিলেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'তিনি আমাকে একটি মন্ত্র আওড়াতে বললেন।'

'মন্ত্র।'

'হ্যাঁ।'

'আপনি একজন সৈয়দ, এইসব বুজরুকিতে আপনি বিশ্বাস করেন?'

'ভালবাসায় আমি এতই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে এটা আমাদের ধর্মে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আমি চেষ্টা করেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন সাত রঙের সাতটা ফুল নিয়ে মন্ত্রটা আওড়াতে হবে এবং প্রত্যেকটা ফুলে একে একে ফুঁ দিতে হবে। কোনও এক মঙ্গলবার যে কোনও অছিলায় মেয়েটিকে দিয়ে ঐ সাতটি ফুলের গন্ধ শোঁকাতে হবে। আজও মন্ত্রটা স্পষ্ট মনে আছে।'

'মন্ত্রটা কী?'

'মন্ত্রটা হল : ফুল খিলায়ে, ফুল হসাঁয়ে, ফুল চুগায়ে নাহির সিং প্যায়ারে; যো কোই লে ফুলোঁ কি বাস; কভি না ছোড়ে হামারা সাথ; হামেঁ ছোড় কিসি আউর পর মরায়ে;

~ www.amarboi.com ~

আউর প্যায়ার মরায়ে; পয়ত ভসম হো মরায়ে; দোহাই সুলেমান পীর পয়গম্বর কি।' ফুল খেলে, ফুল হাসে, নাহির সিং ফুলগুলিকে তোলে; যে এই গন্ধ একবার শুঁকবে সে কখনই আমাকে ছেড়ে যাবে না। যদি সে আমাকে ছেড়ে অন্য কাউকে ভালবাসে, তবে আগুনে পুড়ে তার মৃত্যু হবে। সুলেমান পীর আমাদের রক্ষা করুন।'

আমার মনে পড়ল স্কুলে পড়ার সময় একটা ম্যাজিকের বই থেকে আমি কতগুলো মন্ত্র শিখেছিলাম। তার মধ্যে একটা মন্ত্র ছিল যা আওড়ালে পরীক্ষায় সাফল্য আসবেই। কিন্তু ক্লাশ নাইনে আমি ফেল করলাম। শাহ সাহেবকে এই গল্পটা আমি চেপে গেলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি মন্ত্রটা বলে ফুলগুলিতে ফুঁ দিলেন?'

'হ্যাঁ, একটা সোমবার, আমি মেয়েটিকে খবর পাঠালাম যে চেকোস্লোভাকিয়া থেকে আমি কিছু জিনিস আনিয়েছি, যদি সে মঙ্গলবার আসে তবে দেখতে পারে।'

'মেয়েটি এসেছিল?'

'হ্যাঁ, ঠিক বিকেল পাঁচটায় পাঁচ মিনিটের জন্য এল ও, বিদেশি জিনিসগুলির খোঁজ করল। আমি বললাম জিনিসগুলো বিদেশ থেকে আসার ছাড়পত্র পায়নি। তাতে সে একটু অসন্তুষ্ট হল। তারপর আমার টেবিলের ফুলদানিতে রাখা ফুলগুলির দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, ফুল? আমি বললাম, ফুলগুলি আমি কাস্টমারের জন্য এনেছি। যদি তাদের পছন্দ হয় মানে গন্ধ ভাল লাগে। আমার মনে হয় সবার পছন্দ হবে। মেয়েটি ফুলগুলি হাতে নিয়ে গন্ধ শুঁকলো।'

আমি বললাম, 'মেয়েটির কী প্রতিক্রিয়া হল?'

'সে মুখ তুলল এবং বলল, আপনি এই ফুলগুলির কথা বলছেন! এর তো কোন গন্ধই নেই। তারপর সে টুকটাক কেনাকাটা করল এবং চলে গেল। এরপর সর্দার বলবন্ত সিং মাজিথিয়া আমার দোকানে এলেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি তাঁর কথামতো সব কাজ ঠিকঠাক করেছি কিনা। আমি বললাম, করেছি কিন্তু আমার মনে হয় না এতে কোনও পরিবর্তন হবে। তিনি হেসে বললেন, বন্ধু, মনে করুন হয়েই গেছে।'

'আমার সন্দেহ ছিল, কিন্তু মন্টো সাহেব বিশ্বাস করুন, পরদিন সকালে মেয়েটি আমাকে ফোন করে বলল যে সে দোকানে আসছে। রাস্তায় আছে। সে দোকানে এল কিন্তু কোনও জিনিস কেনার ইচ্ছা আছে বলে মনে হল না। সে অনেকক্ষণ ধরে দোকানের মধ্যে ঘোরাফেরা করল, তারপর আমার কাছে এসে বলল, আপনাকে কতবার বলেছি যে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবেন না। কী উদ্দেশ্যে আপনি আমাকে ঐ ফুলগুলির গন্ধ শুঁকিয়েছিলেন?'

'আমি আমতা আমতা করে বললাম, ঐ ফুলগুলো... আমি...আমি...ওগুলো আপনাদের জন্য আনিয়েছি কারণ আমার কর্মচারীরা চেকোস্লোভাকিয়ার জিনিসগুলো আনার ছাড়পত্র পায়নি। সে ওড়নার আড়াল থেকে অস্থিরভাবে জিজ্ঞেস করল, কেন আপনি আমাকে ফুলগুলির গন্ধ শোঁকালেন? তাতে আপনার কোন অসুবিধা হয়েছে কী? আমি উল্টে তাকে প্রশ্ন করলাম। হ্যাঁ, কাল সারা রাত কেবল ঐ সাতটি ফুলের স্বপ্ন দেখেছি। আমি ফুলগুলি

~ www.amarboi.com ~

দেখছি কিন্তু যেই তাদের আঁকড়ে ধরতে যাচ্ছি ওগুলো আমার হাত ফস্‌কে চলে যাচ্ছে। কোথা থেকে আপনি ফুলগুলো এনেছেন? মেয়েটি জিজ্ঞেস করল। ওগুলো আমার দেশের ফুল, যে কারণে ফুলগুলো আপনাকে আমি দিতে চেয়েছিলাম। আমার অবাক লাগছে আপনি সারারাত ফুলগুলোর স্বপ্ন দেখেছেন, আমি জবাব দিলাম।'

আমি শাহ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ফুলগুলো আপনি কোথা থেকে এনেছিলেন?'

'কেন কাবুলেরই ফুল, দেখতে যে খুব সুন্দর তাও নয়। আর ফুলগুলোতে কোন গন্ধও ছিল না।' শাহ সাহেব বললেন।

তারপর শাহ সাহেব গল্পটা বলতে থাকলেন। 'একদিন সন্ধ্যায়, বলবন্ত সিং আরও টাকা ধার করতে এলেন এবং পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়েছে কিনা জানতে চাইলেন। আমি তাঁকে ব্যাপারটা খুলে বললাম। তিনি টাকার কথা ভুলে গিয়ে তাঁর রোমশ হাত দিয়ে আমার পিঠ চাপড়ালেন। বললেন, এমনটাই হওয়ার কথা শাহ সাহেব। তিনি আমাকে বললেন, এক বোতল হুইস্কি আনুন, দিনটিকে সেলিব্রেট করি। আমি এক বোতল হুইস্কি এবং এক টিন সিগারেট আনালাম। বলবন্ত সিং একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে গেলেন, তাঁর মতো এমন সিগারেটখোর আমি কখনও দেখিনি এবং যাবার আগে আমাকে কিছু উপদেশ দিলেন, বললেন, আমার মনে হয় ব্যাপারটা আর একটু নাড়া দেওয়া দরকার। আপনি পরের মঙ্গলবার আরেকবার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করুন। আমি বললাম, কী করে করব জানি না, কারণ প্রথমবারই যেমন রেগে গিয়েছিল। কিন্তু ওকে পাবার জন্য আমি যে কোনও কিছু করতে পারি। এবার আমি পেশোয়ার থেকে খুব সুন্দর দেখতে সাতটি ফুল আনালাম। যথারীতি মন্ত্রটা আওড়ালাম এবং একটার পর একটা ফুলে ফুঁ দিয়ে টেবিলের উপর একটা ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখলাম। সোমবার মেয়েটিকে আমি ফোন করে জানালাম, আমার দোকানে চেকোশ্লোভাকিয়ার জিনিসগুলো চলে এসেছে আপনি কি কাল আসবেন? পরদিন সে এসে দেখল জিনিসগুলো নেই। আমি তখন আমার কর্মচারীদের অলস ও দায়িত্বহীন বলে বকাবকি করতে লাগলাম। এবার মেয়েটি তার মাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। তার মায়ের প্রসাধন সামগ্রীর প্রতি বেশি আগ্রহ ছিল। মেয়েটি ফুলগুলিকে নজর করল, সে যেমন বিস্মিত হল তেমনই অস্বস্তিতে পড়ল। তারপর টেবিলের কাছে এসে নিচু হয়ে গন্ধ শুঁকলো। এই ফুলগুলো আফগানিস্তানের নয়, মেয়েটি বলল। একদম ঠিক, এগুলি আমি শুধু আপনার জন্যই আনিয়েছি। এই প্রথম আমি এমনভাবে কথা বললাম যে তাতে বোঝা গেল তাকে আমি ভালবাসি। সে খুব বিরক্তিতে আমার দিকে তাকাল এবং তার মায়ের সঙ্গে চলে গেল।

'সন্ধ্যায় আবার বলবন্ত সিং এলেন। আমি তাঁকে এদিনের ঘটনাটা বললাম এবং দশটা টাকা দিলাম। তিনি টাকাটা পকেটস্থ করলেন। তারপর আমার গায়ে তার রোমশ হাত রেখে বললেন, শাহ সাহেব ব্যাপারটা অনেকটাই এগিয়েছে। এক বোতল হুইস্কি আনান। আমি এক বোতল হুইস্কি আনালাম, অর্ধেকটা খেলেন আর বাকিটা নিয়ে চলে গেলেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর কী হল?'

~ www.amarboi.com ~

'পরদিন সে এল এবং আমাকে বলল যে সে খুব দিশেহারা এবং অস্থির হয়ে পড়েছে। সে যে কেবল রাতেই ফুলগুলোকে দেখছে তাই নয়, দিনের বেলাতেও দেখছে। তারপর যা কোনদিনও করেনি সে মুখের ওড়না সরিয়ে ফেলে বলল, আপনি আমাকে বশ করেছেন। মন্টো সাহেব, আমি জীবনে কখনও এমন সুন্দরী দেখিনি। মনে হচ্ছিল আমার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। আমি তার দিকে তাকিয়েই রইলাম। কেন আপনি আমাকে ওই ফুলগুলোর গন্ধ শোঁকালেন? মেয়েটি খুব রেগে গিয়ে বলল। আমি আমার মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি; ফুলগুলো দিন রাত আমার চোখের সামনে নেচে বেড়ায়। আমি জানি আপনি আমাকে ভালবাসেন কিন্তু আমি তো অন্যের বাগদত্তা। আপনি আমাকে কী করলেন? তারপর মেয়েটি টেবিলের উপর থেকে ফুলদানিটা টেনে নিয়ে ফুলগুলি বার করে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল। সে আমার দিকে খুব রাগান্বিত হয়ে তাকাচ্ছিল। আমি কিন্তু বুঝতে পারছিলাম মেয়েটি যা করছে সেটা সত্যি নয় বরং সে চাইছে আমার কাছে থাকতে, আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। আমি বুঝতে পারলাম না আমার কী করণীয়। কিছুক্ষণ আমি চুপ করে থাকলাম, সে ওড়নাটা নামিয়ে দিল এবং ঝড়ের বেগে দোকান থেকে বেরিয়ে চলে গেল।'

'সরদার বলবন্দ সিং মিজাথিয়ার শেখানো মন্ত্রে শেষ পর্যন্ত কি কাজ হল?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'হ্যাঁ, হল...সে সব সময়ই ফুল দেখত। আমার যুক্তিবাদী মনে সন্দেহ থাকলেও আমি অন্তরের অন্তঃস্থলে বুঝতে পারছিলাম মন্ত্রটার জোর আছে। অদ্ভুত নয়? পরের বার যখন মেয়েটি আবার আমার দোকানে এল তখন সে তার মুখের ওড়নাটা সরিয়ে আমাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। আমি তাকে একের পর এক চুম্বন করে যেতে থাকলাম। এতে সে কোনও আপত্তি করল না। তারপর সে ফুলদানি থেকে ফুলগুলো ছিনিয়ে নিয়ে মেঝেতে ফেলে দু'পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে গেল।'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হল? আপনি কি তাকে পেলেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না, তার দেখেশুনেই বিয়ে হল, বিয়ের দিন রাতে যখন সে বাসর ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে তখন হঠাৎই অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে গিয়ে মারা গেল। মৃত্যু-মুহূর্তে তার হাতে সাত রঙের সাতটি ফুল ছিল।'

ওই সময় আমি লক্ষ করলাম যে শাহ সাহেব যে চেয়ারে বসে আছেন ঠিক তার পাশের টেবিলে একটি ফুলদানিতে সাতটি বিভিন্ন রঙের ফুল সাজানো রয়েছে।

ভাষান্তর : রিঙ্কু বসু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মোজেল

চারবছর পর এই প্রথম ত্রিলোচন রাত্রির শুনশান আকাশের দিকে তাকাল। তাকে ক্লান্ত আর দিশেহারা দেখাচ্ছিল। আদবানি চেম্বারস-এর বাইরে দাঁড়িয়ে সে খোলা হাওয়ায় একটু চিন্তার ফুরসত খুঁজছিল।

আকাশ ঝকঝকে, মেঘের ছিটেফোঁটাও ছিল না কোথাও। বম্বে শহরটার মাথার ওপর একটা অতিকায় ধুলিধূসর তাঁবুর মতো ছড়িয়ে ছিল আকাশ। যতদূর চোখ যায়, বিন্দু বিন্দু আলো দেখা যাচ্ছিল। ত্রিলোচনের মনে হল, যেন নিশুতি আকাশ থেকে একঝাঁক তারা ঝরে পড়েছে লম্বা লম্বা বাড়িগুলোর মাথায় আর থিতু হয়েছে সেখানে। অন্ধকারের বুকে বাড়িগুলোকে দৈত্যাকার গাছের মতো দেখাচ্ছিল। আলোর বিন্দুগুলো কাঁপছিল জোনাকির মতো।

ত্রিলোচনের কাছে এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা, একটা নতুন অনুভূতি, রাতের এই ধু-ধু আকাশের নীচে এসে দাঁড়ানো। তার মনে হল গত চারবছর ধরে তাকে যেন ফ্ল্যাটে বন্দি করে রাখা হয়েছে, প্রকৃতির এই অসীম সৌন্দর্য আর আশীর্বাদ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে। এখন রাত প্রায় তিনটে বাজে। হাল্কা হাওয়া দিচ্ছে। ফ্যানের ওই ঘরঘর শব্দ তোলা ভারী বাতাসের চেয়ে অনেক বেশি আরামের। প্রতিদিন সকালবেলা ত্রিলোচন যখন ঘুম ভেঙে ওঠে, তার মনে হয় সারা রাত্রি ধরে যেন তাকে প্রচণ্ড প্রহার করা হয়েছে। এখন তার মনে হচ্ছে, প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ হাওয়া তার শরীর যেন প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে শুষে নিচ্ছে। যখন সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখন তার খুব অস্থির লাগছিল। একটা অদ্ভুত তোলপাড় ছিল ভেতরে ভেতরে। কিন্তু এখন এই আধঘণ্টা বাইরে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর মন যেন অনেক শান্ত হয়ে এল। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারল সে।

প্রথমেই তার কৃপাল কাউরের মুখ মনে এল। কৃপাল আর তার পরিবার এমন একটা মহল্লায় থাকে যেখানকার বেশিরভাগ লোকই মুসলমান। সেখানে ইতিমধ্যেই বহু বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। ত্রিলোচন চেষ্টা করছিল কৃপালের পরিবারকে ওখান থেকে দ্রুত সরিয়ে নিতে, কিন্তু দুর্ভাগ্য ওখানে আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্য

~ www.amarboi.com ~

কারফিউ জারি করা হয়েছে। ত্রিলোচনের নিজেকে খুব অসহায় লাগল। গোটা মহল্লায় মুসলমান গিজ গিজ করছে। তার ওপর আবার পঞ্জাব থেকে নিয়মিত মুসলমান নিধনের খবর আসছে। শিখরা করছে এইসব। যে কোনও হাত, যে কোনও একটা মুসলমান হাত কৃপাল কাউরের তুলতুলে পেলব কোমর জাপ্টে ধরে তাকে মৃত্যুর কুয়োয় ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে, যে কোনও মুহূর্তে—এ দৃশ্য ভেবে শিউরে উঠল ত্রিলোচন।

কৃপালের মা অন্ধ, বাবা জবুথবু, অথর্ব। ওর ভাই থাকে দেওলালিতে, সেখানে সে একটা ব্যবসার কন্ট্র্যাক্ট পেয়েছে।

ত্রিলোচনের খুব রাগ হল কৃপালের ভাই নিরঞ্জনের ওপর। সেও তো এই দাঙ্গার খবর রোজই পড়ছে খবরের কাগজে। সপ্তাহখানেক আগেও তাকে ত্রিলোচন সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, 'এখন ব্যবসার কথা ভুলে যাও। দিনকাল খুব ভয়ঙ্কর। হয় দেওলালি ছেড়ে পরিবারের কাছে ফিরে যাও, আর নয়তো আমার ফ্ল্যাটে সবাইকে নিয়ে চলে এস। ফ্ল্যাটটা ছোট, কিন্তু কোনওক্রমে ম্যানেজ হয়ে যাবে।'

কালো গোঁফের আড়াল থেকে নিরঞ্জন হেসেছে, 'ইয়ার, ফালতু চিন্তা করছ। এমন অনেক দাঙ্গা আমি দেখেছি। এটা অমৃতসর বা লাহোর নয়। বম্বে। তুমি এখানে চার বছর আছো। আর আমি বারো বছর। পুরো বারো বছর, বুঝলে।'

ভগবান জানে নিরঞ্জন বম্বে শহরটাকে কী চোখে দেখে। যে কোনও ক্ষত থেকে, মৃত্যু থেকে, ধ্বংসস্তূপ থেকে এ-শহর কি নিজে নিজেই উঠে ঘুরে দাঁড়াতে জানে? ম্যাজিক জানে নাকি নিরঞ্জন? ত্রিলোচন হাড়ে হাড়ে জানে যে ওই মহল্লাটা ভাল নয়। সে এমনকী মনে মনে প্রস্তুতও হয়ে আছে, কোনও একদিনের ভোরের কাগজে কৃপাল আর তার মা-বাবার নৃশংস হত্যা-সংবাদ পড়ার জন্য।

দুশ্চিন্তাটা কৃপালের অন্ধ মা বা বিকলাঙ্গ বাবাকে নিয়ে নয়। যদি তাঁদের খুন করা হয় আর কৃপাল বেঁচে থাকে তাহলে এক দিক দিয়ে ভালই হয়। আরও ভাল হয় যদি নিরঞ্জন খুন হয়ে যায় দেওলালিতে। সেই তো পথের কাঁটা। কাঁটা শুধু নয়, ত্রিলোচনের পথ অবরোধ করে থাকা ভারী পাথর। যখন কৃপালের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে নিরঞ্জনের নাম ওঠে, ত্রিলোচন তাকে ডাকে 'খঙ্গর সিং' নামে। 'খঙ্গর' শব্দটার পঞ্জাবি ভাষায় অর্থ 'পাথর'।

ঠাণ্ডা হাওয়া ত্রিলোচনের লম্বা চুলের ভিতর দিয়ে খেলা করে গেল। কিন্তু তার মন ছিল আশঙ্কায় ভরা। কৃপাল কাউর তার জীবনের নতুন অতিথি। যদিও সে ওই রুক্ষ কর্কশ 'খঙ্গর সিং'-এর বোন, কিন্তু তার মতো নয়। গ্রামের মেয়েদের মতো, যারা গ্রামের রোদ-ঝড়-জলের মধ্যে বেড়ে উঠেছে, বিশেষত শিখ মেয়েরা, কায়িক শ্রমের মধ্য দিয়ে যাদের দিন যায়, সে মোটেই শক্তপোক্ত পুরুষালি নয়। বরং সে ফুলের মতো পেলব, উইলো গাছের মতো কোমল। সে আধফোটা পাপড়ির মতো। সাধারণ শিখ মেয়েদের থেকে বেশি ফরসা, আনকোরা তুলোর মতো তার গায়ের রং। আপা লিনেনের মতো মসৃণ। কৃপাল কাউর খুব লাজুক।

ত্রিলোচন ওই একই গ্রামের ছেলে। কিন্তু সে বেশিদিন ওখানে থাকেনি। প্রাথমিক স্কুলের পাঠ শেষ করে সে শহরে চলে গিয়েছিল। আর কোনওদিন গ্রামে ফিরে আসেনি।

~ www.amarboi.com ~

স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে সে কলেজে ঢুকেছে, শহরেই। মাঝেমধ্যে গ্রামে বেড়াতে গেছে বটে কিন্তু এত তাড়াহুড়োর মধ্যে যে কৃপাল কাউরের সঙ্গে কোনওদিন দেখাই হয়নি।

সে এখন যে বাড়িটাতে থাকে তার নাম 'আদবানি চেম্বারস'। তারই প্রশস্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভোররাত্তিরের আকাশের দিকে চেয়ে তার মোজেলের কথা হঠাৎ মনে পড়ল। মোজেল, সেই ইহুদি মেয়ে, এই বাড়িটারই কোনও একটি ফ্ল্যাটে থাকে। একটা সময় ছিল যখন মোজেলের প্রেমে হাঁটু পর্যন্ত মজে ছিল সে। তার পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে অন্য আর কোনও মহিলার প্রতি তার এমন উন্মাদনা জন্মায়নি।

কিন্তু কলেজের দিনগুলো এখন নেহাতই অতীত। কলেজ ক্যাম্পাস আর আদবানি চেম্বারস-এর এই লম্বা বারান্দার মধ্যে শুয়ে আছে দশ দশটা বছর। ইতিমধ্যে আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটে গিয়েছে ত্রিলোচনের জীবনে—বর্মা, সিঙ্গাপুর, হংকং এবং শেষ পর্যন্ত বম্বে, যেখানে চার বছর ধরে সে আছে। আর চার বছরে এই প্রথম খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ানো তার—হাজার হাজার প্রদীপ-জ্বলা ধূসর শামিয়ানার নীচে এই গভীর হাওয়ার রাতে।

কৃপাল কাউরের কথা ভাবতে ভাবতে তার মোজেলের মুখ মনে এল, আদবানি চেম্বারস-এর সেই ইহুদি মেয়ে মোজেল, যার সঙ্গে প্রাণপণ ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়েছিল সে একদিন। আদবানি চেম্বারস-এর দোতলার ফ্ল্যাটটা ভাড়া নেওয়ার দিন থেকেই সে মোজেলের প্রেমে পড়েছিল। ত্রিলোচনের এক খ্রিস্টান বন্ধু তাকে এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া পেতে সাহায্য করেছিল। প্রথম দর্শনেই মোজেলকে তার মনে হয়েছিল বদ্ধ উন্মাদ একটা মেয়ে। ঘন বাদামি চুল, ছোট করে ছাঁটা আর এলোমেলো। ঠোঁটে গাঢ় করে লাগানো লিপস্টিক, কোথাও হাল্কা কোথাও পুরু, শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগের মতো। মোজেল একটা ঢলঢলে শাদা জামা পরেছিল, যার ফাঁক দিয়ে তার বুকের এক তৃতীয়াংশ দেখা যাচ্ছিল তাদের রোগা নীল শিরা সমেত। মনে হচ্ছিল, সে যেন সবে চুল কেটে পার্লার থেকে বেরিয়েছে। গাঢ় করে লাগানো লিপস্টিকের কারণে তার ঠোঁটগুলোকে টকটকে লাল ফোলা ফোলা কাঠি কাবাবের মতো দেখাচ্ছিল।

ত্রিলোচনের ফ্ল্যাটটা ছিল মোজেলের ফ্ল্যাটের ঠিক মুখোমুখি, মধ্যিখানে একটা সরু প্যাসেজ। ত্রিলোচন যখন ফ্ল্যাটে ঢুকতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তেই মোজেল তার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল, এলোমেলো চুল, অবিন্যস্ত পোশাক, পায়ে কাঠের স্যান্ডেল। শব্দ শুনে ত্রিলোচন ফিরে তাকাল। বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে মোজেল হাসল। ত্রিলোচন একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে চাবিটা পকেট থেকে বার করে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। হঠাৎ মোজেলের পা থেকে একটা স্যান্ডেল পিছলে গিয়ে উড়ে এল তার দিকে। নিজেকে সামলাতে গিয়ে সে মাটিতে পড়ে গেল আর নিমেষের মধ্যে মোজেল চেপে বসল তার শরীরের ওপর। তার পোশাক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা কঠিন দুটো পা দিয়ে সে কাঁচির মতো চেপে ধরল ত্রিলোচনের শরীর, উঠতে গিয়ে ত্রিলোচনের শরীর সাবানের মতো ছুঁয়ে গেল মোজেলকে। ত্রিলোচন খুব বিনীতভাবে ক্ষমা চেয়ে নিল। মোজেল উঠে দাঁড়িয়ে পোশাক ঠিক করতে করতে বলল, 'এই কাঠের স্যান্ডেলগুলো একদম কাজের নয়।' তারপর স্যান্ডেলে পা গলিয়ে করিডোর ছেড়ে চলে গেল।

~ www.amarboi.com ~

ত্রিলোচন একটু ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবল মেয়েটির সঙ্গে বন্ধুত্ব করা খুব একটা সহজ কাজ হবে না। কিন্তু মোজেল নিজেই এসে ধরা দিল একদিন। ত্রিলোচন তাকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় গেল, মোজেল আপত্তি করল না। তারা একসঙ্গে সিনেমায় গেল, জুহু সৈকতে সারাদিন কাটাল কিন্তু ভালবাসা বলতে ওই হাত আর ঠোঁট অবধি। ত্রিলোচনের ঠোঁট মোজেলর ঠোঁট অতিক্রম করতে চাইলেই মোজেল তাকে থামিয়ে দিল। মোজেলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার সমস্ত পুরুষালি প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্ত জল হয়ে যেতে লাগল।

ত্রিলোচন এর আগে কখনও প্রেমে পড়েনি। লাহোর, বর্মা বা সিঙ্গাপুরে সে পয়সার বিনিময়ে নারীশরীর পেয়েছে। সে কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে বম্বের একটা বন্য ইহুদি মেয়ের প্রেমে সে এভাবে জড়িয়ে পড়বে।

মোজেলের মধ্যে একটা অদ্ভুত নির্লিপ্তি কাজ করত। ত্রিলোচন যখনই ডাকত, সে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে রাজি হয়ে যেত। কিন্তু সিনেমা হলে গিয়ে নির্দিষ্ট সিটে বসার সঙ্গে সঙ্গেই যদি তার কোনও চেনা লোক নজরে পড়তে সে নিমেষের মধ্যে উঠে গিয়ে তার পাশে বসত। রেস্তোরাঁতে খেতে গিয়েও একই কাণ্ড। ত্রিলোচন হয়তো এলাহি ভোজের অর্ডার দিয়েছে। মোজেল বসে আছে তার পাশে। হঠাৎ মোজেল উঠে গিয়ে বসল দূরে বসা তার এক পুরনো বন্ধুর পাশে।

ত্রিলোচনের মনে মনে খুব হিংসা হত। কিন্তু এর প্রতিবাদ করার কোনও রাস্তা ছিল না। প্রতিবাদ করলেই মোজেল তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করে দিত পেটব্যথা বা মাথাধরার অজুহাতে, অথবা বলত 'তুমি একজন শিখ। তুমি সম্পর্কের সূক্ষ্মতা বোঝো না।'

'যেমন বুঝি না তোমার এই অন্যান্য প্রেমিকদের তাই না?' খোঁচা দিয়ে প্রশ্ন করত ত্রিলোচন।

এর উত্তরে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াত মোজেল, দুপা ছড়ানো, বলত, 'হ্যাঁ আমার প্রেমিকদের। এতে তোমার জ্বলবার কী আছে?'

'এভাবে চলতে পারে না মোজেল।'

মোজেল হাসত। বলত, 'তুমি শুধু শিখই নও ত্রিলোচন, তুমি একটা আস্ত গাধা। কে তোমাকে দিব্যি দিয়েছে আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে। যাও না পঞ্জাবে ফিরে গিয়ে কোনও শিখ মেয়েকে বিয়ে করো।' শেষ পর্যন্ত ত্রিলোচন হেরে যেত, কারণ মোজেল ছিল সত্যিই তার মনের দুর্বলতম স্থান। মাঝে মধ্যে মোজেল ত্রিলোচনকে সদ্য চেনা কিছু খ্রিস্টান ছেলেমেয়েদের সামনেও অপদস্থ করত। ত্রিলোচন রেগে যেত, কিন্তু খুব বেশিক্ষণের জন্য নয়।

এই বেড়াল-ইঁদুর খেলা চলেছিল প্রায় দু'বছর ধরে। একদিন যখন মোজেল বেশ খোশমেজাজে আছে, ত্রিলোচন তার দুটো হাত নিজের করতলের মধ্যে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মোজেল তুমি আমাকে ভালবাসো না? সত্যি করে বলবে?'

মোজেল হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চেয়ারের উপর গিয়ে বসল, নিজের পোশাকের দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। তারপর তার বড় বড় ইহুদি চোখ তুলে বলল, 'আমি একজন শিখকে ভালবাসতে পারি না।'

'তুমি সবসময় আমাকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি করো। আমার ধর্মকে ব্যঙ্গ করো।' ত্রিলোচন রাগত স্বরে বলল।

বাংলার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মোজেল উঠে দাঁড়াল। তার ঝাঁকড়া বাদামি চুলে ভরা মাথাটা দুদিকে দোলাতে দোলাতে বলল, 'তুমি যদি দাড়ি কামিয়ে ফেলো আর মাথার চুল ছোট করে কাটো, তবে হলফ করে বলতে পারি, কিছু লোক তোমার দিকে ফিরে তাকাবে। কেননা এমনিতে তুমি খুবই নোংরা।' ত্রিলোচনের মনে হল, যেন তার চুলেই আগুন ধরে গেছে। সে মোজেলকে কাছে টেনে এনে তার শরীরটাকে দু'হাতের মধ্যে আঁকড়ে ধরে তার ঠোঁটে তার মোটা গোঁফের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ঠোঁটটা চেপে ধরল।

মোজেল তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল, 'ফুঃ, আমি এই সবে সকালে ভাল করে দাঁত মাজলাম।'

'মোজেল', ত্রিলোচন চিৎকার করে উঠল।

মোজেল তাতে কোনওরকম রেয়াত না করেই তার ব্যাগ থেকে লিপস্টিক বার করে, ত্রিলোচনের দাড়ি ও গোঁফের আঘাতে ঘষে যাওয়া ঠোঁটের রং মেরামত করতে লাগল। তারপর সে শান্ত গলায় ত্রিলোচনকে বলল, 'শোনো একটা কথা বলি। তুমি জানোই না তোমার ওই দাড়িকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয়। সবচেয়ে ভাল হয় ওটাকে যদি আমার স্কার্টের ধুলো ঝাড়বার কাজে লাগাও।'

মোজেল এবার ত্রিলোচনের পাশে এসে বসল এবং তার দাড়ির পিনগুলি এক এক করে খুলতে শুরু করল। ত্রিলোচন অবশ্যই সুদর্শন পুরুষ। কিন্তু ধর্মের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে সে কোনওদিনই দাড়ি বা গোঁফ কামায়নি, এমনকী মাথার চুলও নয়। সে তার ধর্মকে শ্রদ্ধা করে। তার সমস্ত অনুশাসন তাই সে মেনে চলত।

'কী, করছটা কী তুমি?' সে মোজেলের কাছে জানতে চাইল। ততক্ষণে তার দাড়ি পিনমুক্ত হয়ে তার বুকের ওপর ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়েছে।

মোজেল দুষ্টু হাসি হেসে বলল, 'তোমার দাড়ি এমন রেশমের মতো, স্কার্ট ঝাড়া নয়, আমি এটা দিয়ে একটা ফ্যান্সি হাতব্যাগ বানাব।'

'তোমার ধর্মকে নিয়ে তো আমি কখনো মস্করা করি না মোজেল। কিন্তু তুমি সব সময় শিখদের নিয়ে ঠাট্টা করো। আমি মুখ বুজে সব অপমান সহ্য করি। সে কেবল তোমাকে ভালবাসি বলে। তুমি জানো আমি তোমাকে কতখানি ভালবাসি।'

'জানি।' মোজেল বলল।

'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই'। দাড়ির পিন আটকাতে আটকাতে ত্রিলোচন বলল। মোজেল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'তাও জানি। সত্যি কথা বলতে কি আমি তো একরকম বিয়ে করতে প্রস্তুত।'

'মাইরি বলছ?' ত্রিলোচন লাফিয়ে উঠল।

'বলছি।'

ত্রিলোচন তার দুবাহুর মধ্যে মোজেলকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কব...বলো কবে?'

'কবে বিয়ে করব? যেদিন তুমি এই লম্বা দাড়ি গোঁফ আর চুল কেটে ফেলবে সেদিন।'

ত্রিলোচন কিছু না ভেবেই বলে উঠল, 'কালই কেটে ফেলব।'

মোজেল ঘরময় নেচে নেচে ঘুরতে ঘুরতে বলল, 'বাজে কথা বলছ। তোমার সে হিম্মতই নেই।'

~ www.amarboi.com ~

'তুমি দেখে নিও।' ত্রিলোচন বলল। মোজেল ত্রিলোচনের ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকিয়ে বলল, 'আচ্ছা দেখা যাক। ফুঃ।'

সারারাত ত্রিলোচনের ঘুম এল না। সিদ্ধান্তটা নেহাতই মামুলি ব্যাপার নয়। পরদিন সকালে সে দুর্গ এলাকায় একটা সেলুনে গিয়ে তার চুল কেটে ফেলল, দাড়ি কামিয়ে ফেলল। চুল কাটার সময় সে দু'চোখ রাখল বন্ধ করে। কাটা হয়ে গেলে তাকাল। আয়নায় সে নিজেকে নতুনভাবে দেখল। বেশ ঝকঝকে লাগছে তাকে। বম্বের যে কোনও মেয়ে তার দিকে অন্তত দু'বার চেয়ে দেখবে।

প্রথম দিনটা সে ফ্ল্যাট ছেড়ে কোথাও বেরলো না। মোজেলকে জানিয়ে দিল যে তার শরীর ভাল নেই। অন্তত কয়েক মিনিটের জন্যে তাকে আসতে অনুরোধ করল। ঘরে ঢুকে বুরবাক বনে গেল মোজেল। 'ও ত্রিলোচন', বলে সে আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল ত্রিলোচনের ওপর। তার মসৃণ চিবুকে সে হাত বোলাতে লাগল। তার ছোট ছোট করে কাটা চুলে বিলি কেটে দিতে লাগল। হাসতে হাসতে তার নাক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সঙ্গে রুমাল না থাকায় সে স্কার্ট দিয়ে নাক মুছতে গেল। তাই দেখে লজ্জায় লাল হয়ে ত্রিলোচন জিজ্ঞেস করল 'নীচে কিছু পরোনি?' 'নাঃ। না পরলেই মজা বেশি।' 'চলো কালই আমরা বিয়ে করে ফেলি', ত্রিলোচন বলল। 'চলো কালই', মোজেল মাথা ঝাঁকাল। তারা ঠিক করল বিয়েটা হবে পুণেতে, সেখানে ত্রিলোচনের অনেক বন্ধুবান্ধব আছে।

মোজেল দুর্গ এলাকার একটা বড় দোকানে সেলসগার্লের কাজ করত। সে ত্রিলোচনকে বলল পরের দিন দোকানের সামনে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে তার জন্যে অপেক্ষা করতে। ত্রিলোচন যথাসময় যথাস্থানে পৌঁছে গেল। কিন্তু মোজেল এল না। পরে ত্রিলোচন জানতে পারল মোজেল তার এক পুরনো প্রেমিকের সঙ্গে দেওলালি চলে গেছে। এই লোকটি সদ্য একটা নতুন গাড়ি কিনেছে। খুব শিগগিরি তাদের বম্বে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। ত্রিলোচনের তাসের ঘর নিমেষের মধ্যে চুরমার হয়ে গেল।

কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সে আবার ঘুরে দাঁড়াল। ঠিক এই সময়েই, জীবনের ঠিক এই বাঁকের মুখেই কৃপাল কাউরের সঙ্গে তার দেখা। এবং প্রেমে পড়া।

কৃপালের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পর সে বুঝতে পারল কতখানি অভদ্র জংলি মেয়ে ছিল মোজেল। মোজেলের সঙ্গে বিয়ে না হওয়ায় সে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাল মনে মনে।

কিন্তু এক একটা দিন আসত যখন মোজেলের কথা ভয়ঙ্করভাবে মনে পড়ত ত্রিলোচনের। তার মনে পড়ত একদিন সে সোনার কানের দুল কেনবার জন্যে মোজেলকে নিয়ে নামী গয়নার দোকানে গিয়েছিল। কিন্তু মোজেল শেষ পর্যন্ত দেখেশুনে পছন্দ করে যা কিনেছিল তা হল একজোড়া শস্তা নকল গয়না। এমনই মেয়ে ছিল মোজেল।

সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ত্রিলোচনের সঙ্গে শুয়ে থাকত এক বিছানায়। ত্রিলোচন তাকে চুমু খেত, আদর করত নানাভাবে কিন্তু আসল কাজটির বেলায় না। মোজেল হেসে বলত, 'তুমি শিখ। আমি শিখদের ঘেন্না করি'।

অন্তর্বাস পরা নিয়ে তাদের মধ্যে বাদানুবাদ লেগে যেত প্রায়শই। মোজেল অন্তর্বাস পরত না। বলত, 'শিখধর্ম মেনে তুমি মজাদার সব শর্টস পরো প্যান্টের নীচে। এটা একটা কুৎসিত ব্যাপার যে ধর্মকে প্যান্টের তলায় ধরে রাখতে হয়।'

~ www.amarboi.com ~

আদবানি চেম্বারস-এর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ত্রিলোচন ধীরে ধীরে আলো হয়ে আসা আকাশের দিকে তাকাল। 'জাহান্নামে যাক মোজেল', সে চিৎকার করে বলে উঠল। তারপর ভাবতে শুরু করল কৃপাল কাউরের কথা আর যে ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে সে পড়েছে, তার কথা।

এর মধ্যেই অনেকগুলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটে গেছে এই মহল্লায়। জায়গাটা গোঁড়া মুসলমানে ভর্তি, কারফিউ থাক বা না থাক ওরা যে কোনও সময় হইহই করে বাড়িতে ঢুকে তুলকালাম করে দিতে পারে।

মোজেল চলে যাওয়ার পর ত্রিলোচন চুল-দাড়ি রাখতে শুরু করেছে। তবে এখন আর সে দাড়ি খুব বেশি বাড়তে দেয় না। মাঝে মাঝেই নিয়ম করে নাপিতকে দিয়ে ছেঁটে নেয়।

যদিও শহরে কারফিউ চলছিল, রাস্তায় যে কেউ হাঁটতেই পারত—খুব বেশি দূর না গেলেই হল। সে ঠিক করল একটু বাইরের রাস্তায় হেঁটে আসবে। রাস্তার ধারে একটা জলের কল ছিল। সে উবু হয়ে বসে তার মুখে-চোখে-চুলে জল দিতে লাগল।

হঠাৎ নুড়িপাথরের ওপর কাঠের স্যান্ডেলের শব্দ শোনা গেল। ওই বাড়িতে আরও অনেক ইহুদি মেয়ে থাকত। তারাও কাঠের স্যান্ডেল ব্যবহার করত। ত্রিলোচন ভাবল, হয়তো তাদের মধ্যেই কেউ একজন হবে।

কিন্তু সে তাকিয়ে দেখল, মোজেল। একটা ঢোলা গাউন পরে আছে সে। তেমনই অবিন্যস্ত চুল। তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে ত্রিলোচন বার কয়েক কাশল। মোজেল তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল। তার দাড়িতে হাত রেখে বলল, 'আরে শিখের দ্বিতীয় জন্ম নাকি? ওঃ, দাড়িটা দিয়ে তো এখনও আমার নীল স্কার্টের ধুলো ঝেড়ে নেওয়া যায়। শুধু স্কার্টটা দেওলালিতে ফেলে এসেছি এই যা।'

ত্রিলোচন কিছু বলল না। মোজেল তার হাতে চিমটি কেটে বলল, 'কিছু বলছ না কেন, সর্দার সাহেব?'

ত্রিলোচন মোজেলের দিকে তাকাল। কী রোগা হয়ে গেছে মোজেল। 'তুমি কি অসুস্থ?' ত্রিলোচন জিজ্ঞেস করল।

'না তো।'

'কিন্তু খুব রোগা দেখাচ্ছে তোমাকে?'

'ডায়েটিং করছি। তা যাই হোক, আবার তুমি শিখ হয়ে গেছ?' মাটির ওপরই বসে পড়ল মোজেল।

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা। তুমি কি আর কাউকে ভালবাসো এখন?'

'হ্যাঁ।'

'সে কি এ বাড়িতে থাকে?'

'না।'

'অদ্ভুত ব্যাপার তো!'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তারপর মোজেল আবার ত্রিলোচনের দাড়িতে একটা মৃদু টান দিয়ে বলল, 'এই দাড়ি কি তার কথামতোই রাখা?'

'না'।

'শোনো ত্রিলোচন। এবার কথা দিচ্ছি, যদি চুল-দাড়ি কেটে ফেলো তোমায় বিয়ে করব। একদম পাক্কা কথা।'

'মোজেল', ত্রিলোচন বলল, 'আমি আমার গ্রামেরই একটি সাদা-সরল মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছি। সে একজন সাচ্চা শিখ। সেই কারণেই আমি আবার চুল-দাড়ি রাখতে শুরু করেছি।'

একথা শুনে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মোজেল, 'যদি সে মেয়েটা একজন ভাল শিখই হয়, তবে সে তোমায় বিয়ে করবে কেন? তুমি একবার শিখ ধর্মের সব নিয়ম ভেঙেছিলে না? সে জানে এসব?'

'না, সে জানে না।' ত্রিলোচন বলল, 'তুমি যেদিন আমাকে ছেড়ে গেলে মোজেল, সেদিন থেকেই আমি চুল-দাড়ি আর কাটব না ঠিক করেছিলাম। অনেকটা তোমার ওপর বদলা নিতে। এর কিছুদিন পরে মেয়েটির সঙ্গে আমার দেখা হয়। কিন্তু আমি যেভাবে পাগড়ি পরি তাতে কেউ কোনওদিন কিছু ঘুণাক্ষরেও ধরতে পারবে না।

মোজেল তার স্কার্ট উঁচু করে থাই চুলকোতে লাগল, 'ওঃ যা মশা না এখানে। তা যাই হোক, কবে হচ্ছে তোমাদের বিয়ে?'

'জানি না।' ত্রিলোচন উত্তর দিল। তার কণ্ঠস্বরে চাপা উদ্বেগ।

'কী হয়েছে তোমার ত্রিলোচন? কী ভাবছ?'

মোজেল জিজ্ঞেস করল।

ত্রিলোচন তাকে সব কথা খুলে বলল।

মোজেল বলল, 'তুমি একটা এক নম্বরের বোকা, ত্রিলোচন। সমস্যাটা কোথায়? যাও, গিয়ে মেয়েটাকে তোমার ফ্ল্যাটে নিয়ে এসো।'

'মোজেল, তুমি এসব বুঝবে না। ব্যাপারটা অত সহজ নয়। তুমি তো কোনও বিষয়েই গুরুত্ব দাও না। সেই জন্যেই তো সম্পর্কটা ভেঙে গেল। যাকগে।'

'কী যাকগে?' ঝঙ্কার দিয়ে উঠল মোজেল। 'তুমি সত্যিই একটা ইডিয়েট। এখন তোমার মাথায় একটাই চিন্তা থাকা উচিত, তা হল মেয়েটাকে...কী যেন ওর নাম...কীভাবে আর কত তাড়াতাড়ি তোমার ফ্ল্যাটে এনে তোলা যায়। আর তা না করে তুমি আমাদের পুরনো সম্পর্কের কথা বসে বসে ভাবছ। তুমি বড্ড সাবধানী আর বুদ্ধিহীন মানুষ ত্রিলোচন। আমার পছন্দের পুরুষ হবে রাগী, বেপরোয়া। যাকগে, এখন চলো, তোমার ওই কী যেন কাউরকে ওখান থেকে নিয়ে আসি।'

ত্রিলোচন ভীতু চোখে মোজেলের দিকে তাকিয়ে বলল 'কিন্তু এখন তো কারফিউ চলছে।' উত্তরে মোজেল ত্রিলোচনকে একরকম হাত ধরে টানতে টানতে বলল, 'মোজেলের জন্যে কোনও কারফিউ নেই কোথাও।'

'কী হলটা কী তোমার?' ত্রিলোচন জিজ্ঞেস করল।

'তোমার দাড়িটা...অবশ্য এখনও তত লম্বা নয়। তুমি বরং পাগড়িটা খুলে এসো। তাহলে আর তোমাকে শিখ বলে মনে হবে না।'

~ www.amarboi.com ~

'না পাগড়ি আমি খুলব না।' ত্রিলোচন বলল।

'কেন নয়?'

'তুমি বুঝতে পারছ না। প্রকৃত ধর্মীয় পোশাক না পরে ওদের বাড়িতে যাওয়া আমার ঠিক হবে না। ও আমাকে কোনওদিন পাগড়ি ছাড়া দেখেনি। ও জানে আমি মনেপ্রাণে একজন শিখ। আমি ওর এই ধারণাটা ভাঙতে চাই না, মোজেল।'

মোজেল তার কাঠের স্যান্ডেল দিয়ে অস্থিরভাবে একটা অদ্ভুত আওয়াজ তুলল মাটিতে।

'ত্রিলোচন, তুমি শুধু বোকাই নও, তুমি একটা গর্দভ। প্রশ্নটা এখন জীবনমরণের, দরকারটা এখন ওকে বাঁচানোর, ওই যে কী যেন কাউর।'

ত্রিলোচন তবু নাছোড়বান্দা, 'মোজেল, তুমি বুঝতে পারছ না। একবার যদি ও আমাকে পাগড়ি ছাড়া দেখে, ও আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে।'

'সত্যিই ত্রিলোচন, সব শিখগুলোই বোধহয় এরকম ইডিয়ট। একদিকে তুমি তার প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছ, অন্যদিকে পাগড়িটাকে ছাড়বে না। ভাবো, যদি তুমি ওই পাগড়ি পরেই ওই মুসলমান মহল্লায় যাও, ওই মুসলমানদের পাড়ায়, আমি নিশ্চিত ওরা তোমাকে দেখামাত্র গলায় লম্বা ধারালো ছুরি চালিয়ে দেবে।'

'ছুরিকে আমি ভয় পাই না। আমি নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে পারি। কিন্তু ভালবাসাকে অপমান করতে পারি না।'

'বোকা কোথাকার। যদি তোমাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে আর ওই কাউরের কী দাম থাকবে তোমার জীবনে?'

'বাজে কথা বলো না'। ত্রিলোচন হঠাৎ ধমক দিয়ে উঠল। মোজেল হাসল। তারপর দু'হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরল ত্রিলোচনের।

'তবে তাই হোক। তোমার কথা মতোই হোক। যাও পাগড়িটা পরে এসো। আমি তোমার জন্যে রাস্তায় অপেক্ষা করছি।'

ত্রিলোচন রাস্তায় এসে দেখল ছেলেদের মতো দুপা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে মোজেল। কাছাকাছি আসার সঙ্গে-সঙ্গেই ও একরাশ সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরিয়ে দিল ত্রিলোচনের মুখ।

ত্রিলোচন বিরক্ত হল। 'অদ্ভুত স্বভাব তোমার মোজেল। তুমি জানো না শিখরা সিগারেট স্পর্শ করে না?'

'চলো, যাওয়া যাক।' মোজেল বলল।

বাজার এলাকাটা শুনশান। কারফিউ যেন ভোরের বাতাসকেও শাসন করছে। একটুও হাওয়া বইছে না। রাস্তার আলোগুলো টিমটিম করে জ্বলছে। সাধারণত এই সময় ট্রেন চলাচল শুরু হয় আর দোকানিরা ঝাঁপ খুলতে শুরু করে। কিন্তু আজ প্রাণের চিহ্ন নেই কোথাও।

মোজেল আগে আগে হাঁটছে। পিছনে ত্রিলোচন। এই তীব্র নৈঃশব্দের মধ্যে মোজেলের কাঠের স্যান্ডেল দুটো একটানা আওয়াজ তুলে চলেছে। ত্রিলোচন একবার ভাবল সে মোজেলকে বলে খালি পায়ে হাঁটতে। কিন্তু তার সাহসে কুলোল না।

~ www.amarboi.com ~

ত্রিলোচনের বেশ ভয় ভয় করছিল। কিন্তু মোজেল হেঁটে চলেছিল নির্ভয়ে মাথা উঁচু করে। সিগারেটের ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে। একটা মোড়ে একজন পুলিশ তাদের রাস্তা আটকাল হঠাৎ। 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?' ত্রিলোচন ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। কিন্তু মোজেল নির্দ্বিধায় এগিয়ে গেল পুলিশটির দিকে। বলল 'ও তুমি। এই তুমি আমাকে চেনো না? আমি তো মোজেল। আমি পাশের রাস্তায় আমার বোনের কাছে যাচ্ছি। ওর খুব অসুখ। আর ইনি হচ্ছেন ডাক্তারবাবু।'

পুলিশটি একটু ইতস্তত করতেই মোজেল তার সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল তার দিকে, 'প্লিজ একটা নাও।'

পুলিশটি একটা সিগারেট তুলে নিল। মোজেল তার নিজের লাইটার দিয়ে সিগারেট জ্বালিয়ে দিল। মোজেল তার বাঁ চোখ দিয়ে পুলিশটিকে ইশারা করল আর ডান চোখ দিয়ে ত্রিলোচনকে। তারপর তারা আবার হাঁটতে শুরু করল।

ত্রিলোচনের তখনও খুব ভয় ভয় করছিল। সে ঘন ঘন ডানদিক বাঁদিকে তাকাচ্ছিল। কখন কোনদিক দিয়ে চকিত আক্রমণ আসে এই আশঙ্কায়। হঠাৎ মোজেল দাঁড়িয়ে পড়ল। 'ত্রিলোচন শোনো, ভয় পেয়ো না। যখনই ভয় পাবে তখনই ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যাবে। এটাই আমার অভিজ্ঞতা।'

ত্রিলোচন কোনও জবাব দিল না।

তারা একটা চাররাস্তার মোড়ে এসে পৌঁছল যেখান থেকে কৃপাল কাউরের পাড়ায় যাওয়া যায়। ত্রিলোচনের হঠাৎ চোখে পড়ল একটা দোকানে লুঠতরাজ চলছে। ওদিকে দাঙ্গাবাজদের একজনের সঙ্গে হঠাৎ ত্রিলোচনের ধাক্কা লেগে গেল। লোকটা মাথার উপর কিছু একটা বয়ে আনছিল। সেটা আছাড় খেয়ে পড়ল মাটিতে। লোকটা ত্রিলোচনের দিকে চাওয়া মাত্রই বুঝতে পারল সে একজন শিখ। সে জামার ভিতর থেকে ছুরি বার করতে গেল।

নিখাদ মাতালের অভিনয় করে মোজেল টলতে টলতে এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'পাগল নাকি তুমি, নিজের ভাইকেই খুন করতে যাচ্ছ? জানো এ আমার হবু বর।" তারপর ত্রিলোচনের দিকে ফিরে বলল, 'করিম, ওটাকে মাটি থেকে তুলে ওর মাথার ওপর বসিয়ে দাও তো।'

লোকটা মোজেলের দিকে শয়তানের দৃষ্টিতে তাকিয়ে, কনুই দিয়ে ওর বুক দুটো ছুঁল। তারপর 'শালি, ভাল করে ফূর্তি কর' বলে চলে গেল।

তারা আবার হাঁটতে লাগল। একসময় তারা কৃপাল কাউরের মহল্লায় পৌঁছল। 'কোন গলিটা?' মোজেল জিজ্ঞেস করল।

'বাঁদিকে তিন নম্বর গলি। কোণের বাড়িটা।' ত্রিলোচন ফিসফিস করে বলল।

বাড়িটার কাছাকাছি আসার সঙ্গে সঙ্গেই তারা দেখল একটা লোক দৌড়ে বাড়িটার থেকে বেরিয়ে উলটো দিকের একটা বাড়িতে ঢুকে গেল। কয়েক মুহূর্ত বাদে সেই বাড়িটার থেকে তিনজন লোক দৌড়ে বেরিয়ে এসে কৃপাল কাউরদের বাড়িতে ঢুকে গেল।

মোজেল থমকে দাঁড়াল। 'ত্রিলোচন পাগড়িটা খুলে ফেলো। শিগগির।'

'কক্ষনো না।' ত্রিলোচনের সেই এক গোঁ।

~ www.amarboi.com ~

‘যা খুশি তাই করো। দেখছ তো কী চলছে চারদিকে।’

চারদিকে ভয়ঙ্কর সব ব্যাপার স্যাপারই চলছিল। ওই তিনটে লোক আবার বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল। হাতে ব্যাগ, ব্যাগে বন্দুক, তা থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। মোজেলের মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল হঠাৎ। ‘শোনো ত্রিলোচন, আমি দৌড়ে ওই বাড়িটাতে গিয়ে ঢুকব। তুমি আমার পিছন পিছন এমনভাবে ছুটবে যেন আমাকে তাড়া করছ। কিন্তু চিন্তাভাবনা করতে যেও না। সময় নেই। নাও দৌড়ও।’

ত্রিলোচনের জবাবের তোয়াক্কা না করে মোজেল দৌড়তে শুরু করল। এক দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে সে কৃপাল কাউরদের বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। হাঁফাতে হাঁফাতে ত্রিলোচন ছুটল তার পিছনে পিছনে। দেখল বাড়িটার উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে মোজেল।

‘কোন তলায়?’ মোজেল জিজ্ঞেস করল।

‘দোতলা।’

‘চলো, যাওয়া যাক।’ সিঁড়িতে কাঠের স্যান্ডেলের হিল্লোল তুলে মোজেল দোতলায় উঠতে শুরু করল। সিঁড়িতে রক্তের দাগ চোখে পড়ল ত্রিলোচনের।

দোতলায় পৌঁছে একটা সরু অন্ধকার করিডোর পেরিয়ে ত্রিলোচন একটা দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। খুব নিচু গলায় ডাকল ‘মহঙ্গা সিংজি, মহঙ্গা সিংজি।’

ভিতর থেকে মেয়েলি গলায় উত্তর এল, ‘কে?’

দরজাটা অল্প ফাঁক হল। ত্রিলোচন মোজেলকে বলল, ‘আমার পিছন পিছন এস।’ মোজেল দেখল দরজার পাশে একটি অল্পবয়সী ফুটফুটে মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি কাঁপছে। মোজেল তাকে বলল, ‘চিন্তার কিছু নেই। ত্রিলোচন তোমাকে নিতে এসেছে।’

ত্রিলোচন বলল, ‘সরদার সাহেবকে চটপট তৈরি হতে বলো।’

ঠিক এই সময় উপরতলার ফ্ল্যাট থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে এল। ‘ওরা ওকে ধরে ফেলেছে বোধহয়?’ ভয়ে উৎকণ্ঠায় থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে কৃপাল কাউর বলে উঠল। ‘কাকে?’ ত্রিলোচন জিজ্ঞেস করল।

কৃপাল কাউর কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল মোজেল তাকে ধাক্কা মেরে ঘরের এক কোণে সরিয়ে দিয়ে বলল, ‘ধরুক আর না ধরুক। তুমি জামাকাপড় খুলে ফেলো, শিগগিরি।’

কৃপাল কাউর হতভম্ব হয়ে গেল, কিন্তু মোজেল তাকে এক মুহূর্তও চিন্তার ফুরসত দিল না। নিমেষের মধ্যে সে তার শার্টটা খুলে নিল। লজ্জায় দিশেহারা হয়ে কৃপাল দু'হাত দিয়ে তার বুকদুটি আড়াল করার চেষ্টা করল। সে আচমকা ভয় পেয়ে গেল। ত্রিলোচন মুখ ঘুরিয়ে নিল। পরমুহূর্তেই মোজেল তার নিজের কাফতানটা খুলে কৃপালকে পরিয়ে দিল। তারপর তার চুলের বাঁধন খুলে দিল। কৃপালের ঘন কালো চুল সমুদ্রের মতো আছড়ে পড়ল তার কাঁধে। নিজে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় শীতে কাঁপতে কাঁপতে মোজেল চিৎকার করে বলল, ‘ত্রিলোচন ওকে নিয়ে পালিয়ে যাও।’

ত্রিলোচন কৃপালকে নিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্ত।

‘ওর বাবা-মার কী হবে?’

‘ওরা জাহান্নামে যাক। তুমি পালাও।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'আর তুমি?' হতভম্ব ত্রিলোচন জিজ্ঞেস করল।

'আমাকে নিয়ে ফালতু ভেবো না।' ঠিক সেই মুহূর্তে সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের দৌড়ে আসার আওয়াজ শোনা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘরের দরজায় প্রবল করাঘাত কাঁপিয়ে দিল কৃপালদের ছোট্ট ফ্ল্যাট। পাশের ঘরে আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠলেন কৃপালের বৃদ্ধ বাবা-মা।

মোজেল ফিস ফিস করে স্বগতোক্তির ঢঙে বলল 'একটাই রাস্তা খোলা আছে এখন। দরজাটা আমি খুলে দেব।' তারপর ত্রিলোচনকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'দরজাটা খুলেই আমি সিঁড়ি ধরে ওপরে দৌড়ব। তুমি আমার পিছন পিছন দৌড়বে। এই লোকগুলো এতটাই ঘোরের মধ্যে আছে যে ওরা সব কিছু ভুলে গিয়ে আমাদের তাড়া করবে।'

'তারপর?' ত্রিলোচন জিজ্ঞেস করল।

'তারপর, এই যে মেয়েটি, কী যেন কাউর ও সুযোগ বুঝে চম্পট লাগাবে। ওর শার্ট দেখে ওরা ওকে ইহুদি ভেবে ভুল করবে।'

এ-কথা বলেই মোজেল ঘরের দরজাটা হাট করে খুলে দিল। আর তারপর ছুটতে শুরু করল। লোকগুলো তাকে বাধা দেওয়ার কোনও সুযোগই পেল না। ত্রিলোচন তার পিছন পিছন দৌড়ল। কাঠের স্যান্ডেল পায়ে ঝড়ের মতো মোজেল সিঁড়ি বেয়ে ছুটে চলছিল। হঠাৎ সম্ভবত পা পিছলে গিয়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেতে। ত্রিলোচন থমকে দাঁড়াল। মোজেলের মাথায় সাঙঘাতিক চোট লেগেছিল। তার মুখ, নাক, কান দিয়ে দমকে দমকে বেরিয়ে আসছিল রক্ত। সেই লোকগুলো, যারা কৃপাল কাউরের ফ্ল্যাটে রাহাজানি করতে এসেছিল তারাও ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গিয়ে মোজেলকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়াল। তারা অবাক হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মোজেলের বিক্ষত বেআব্রু শরীরের দিকে।

ত্রিলোচন মাটির দিকে ঝুঁকে ডাকল 'মোজেল, মোজেল...।'

মোজেল চোখ মেলল। অল্প হাসল। ত্রিলোচন তার পাগড়িটা খুলে মোজেলের নগ্ন শরীরের উপর বিছিয়ে দিল।

মোজেল দাঙ্গাবাজ লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও আমাকে ভালবাসে। ও একটা মুসলমান, কিন্তু ও এত পাগল যে আমি ওকে শিখ বলে ডাকি।'

টাটকা রক্ত ঝলক দিয়ে বেরিয়ে এল মোজেলের মুখ থেকে। 'ধুত্তোর', সে বলল।

তারপর ত্রিলোচনের দিকে একবার তাকিয়ে সে পাগড়িটা ঠেলে সরিয়ে দিল তার গা থেকে।

'তোমার ধর্মের এই ন্যাকড়াটা নিয়ে নাও। আমার কোনও দরকার নেই।'

মোজেলের খোলা বুকের উপর তার দুটো অবসন্ন হাত ক্লান্তভাবে আছড়ে পড়ল। সে আর কোনও কথা বলতে পারল না।

ভাষান্তর : সুদীপ বসু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিসমিল্লা

সঈদ সিনেমা বানাবার জন্য জহিরের সঙ্গে দেখা করেছিল। এর আগে, বম্বের সেন্ট্রাল স্টুডিওতে বার-দুয়েক সে দেখেছিল জহিরকে, অল্পস্বল্প কথাবার্তাও হয়েছিল তাদের মধ্যে, তবে এবার, লাহোরে এসে তাদের সম্পর্ক বেশ গাঢ় হয়। জহিরকে খুব মনে ধরে যায় সঈদের।

অসংখ্য ফিল্ম কোম্পানি রয়েছে লাহোরে। সঈদ ভালমতই জানে ওপর ওপর কোম্পানিগুলোর নামের বোর্ড থাকলেও, তাদের অনেকেরই বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই। আক্রমের মাধ্যমে যখন জহিরের সঙ্গে নতুনভাবে সঈদের পরিচয় হল তখন তার মনে হয়েছিল, জহিরও সেইসব ফাঁপা প্রযোজকদের মত যারা দু-তিন লক্ষ টাকায় একটা ফিল্ম করবে বলে কথা দেয়। তারপর ঝকঝকে অফিস তৈরি করে, ভাড়া করা আসবাব দিয়ে। কিছুদিন পর ঠগবাজ প্রযোজকরা ব্যবসা গুটিয়ে সেখান থেকে চম্পট দেয়। আশেপাশের হোটেল রেস্তোরাঁর ধারদেনাগুলোও মিটিয়ে যায় না চলে যাবার সময়।

জহির সঈদকে বলে, খুব কম খরচে একটা সিনেমা সে তৈরি করতে চায়। সঈদও শুনেছিল, জহির এক সময় বম্বেতে পাঁচ বছরের মত সহ-পরিচালকের কাজ করেছে বাজারচলতি সিনেমাগুলোতে। জহির তাকে বলে, দেশভাগের জন্য বম্বে ছেড়ে তাকে পাকিস্তানে চলে আসতে হয়েছে। নয়তো এতদিনে এককভাবে পরিচালনার কাজ করতে পারত বম্বের হিন্দি ছবির জগতে। দু-আড়াই বছর ধরে সে কর্মহীন ছিল। তবে এই সময়ে এমন কয়েকজনের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, যারা তাকে টাকা দিতে প্রস্তুত। সে সঈদকে বলে, 'আমি জানি, আমার তেমন প্রতিভা নেই। কোনও বড় মাপের আর্ট ফিল্ম বানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চমকপ্রদ সাধারণ ছবি বানাবার কাজই করে এসেছি এতদিন। আমি নিশ্চিত, সেরকম সিনেমা ভালই বানাতে পারব। পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যেই হয়ে যাবে ছবিটা। আশা করছি একশো শতাংশ লাভ উঠে আসবে। আপনি কী মনে করছেন?'

জহিরকে সৎ লোক বলেই মনে হল সঈদের। বলতে কী, অনেকটাই প্রভাবিত হয়ে গেল সে জহিরের দ্বারা, কিছুটা সময় নিল ভাববার জন্য, তারপর বলল, 'হ্যাঁ, টাকা উঠে আসবে, লাভ হবে বলেই তো মনে হয়।'

~ www.amarboi.com ~

জহির বলল, 'যারা টাকা ঢালছে আমার সিনেমায়, তাদের বলেছি, আমার পক্ষে হিসাবপত্র রাখা সম্ভব না। আয় ব্যয়ের হিসাব ওরাই রাখুক। ছবি বানাবার অন্য দিকগুলো আমিই সামলে নেবো।'

সঈদ জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি?'

জহির বলে, 'আপনাকে সাহায্য করতে হবে। সিনেমাটার পরিবেশনার দিকটা আপনি দেখবেন। সিনেমা পরিবেশকদের সঙ্গে আপনার বেশ পরিচিতি আছে। এই সাহায্যটুকু পেলে আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।'

সঈদ এর উত্তরে বলে, 'ঠিক আছে। ওই দিকটার আমিই দায়িত্ব নিচ্ছি। আপনাকে এ বিষয়ে ভাবতে হবে না। আল্লার দয়ায় কাজটা শুরু হোক।'

'অনেক ধন্যবাদ।' জহির একথা বলে টেবিলে রাখা একটা চিঠি লেখার সাদা পাতার ওপর পেনসিল দিয়ে আঁকতে শুরু করল। একটা ফুল আঁকতে আঁকতে সে বলে উঠল, 'সঈদ সাব, আমি একশো শতাংশ নিশ্চিত, সিনেমাটা বাজারে সাফল্য পাবে। আমার বিবি এই সিনেমার হিরোইন হচ্ছে।'

অবাক হয়ে সঈদ জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার বিবি?'

'হ্যাঁ।'

'এর আগে কোনও ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন?'

'না।' ফুলে লতাপাতা ভরাতে ভরাতেই জহির বলে, 'লাহোরে আসার পর বিয়ে হয় আমাদের। আমি চাইনি ও সিনেমায় নামুক। কিন্তু ওর খুব ইচ্ছে। প্রতিটি দিন ও একটা করে সিনেমা দেখে। দাঁড়ান, ওর একটা ফোটোগ্রাফ আপনাকে দেখাই।' জহির ড্রয়ার খুলে একটা খাম বার করে। খামের ভিতর থেকে একটা ছবি তুলে সঈদের দিকে এগিয়ে দেয়।

সঈদ ফোটোগ্রাফটি ভাল করে দেখতে থাকে। খুব সাদামাটা দেখতে একটি যুবতী মেয়ের ছবি। ছোটো কপাল, পাতলা নাক, সামান্য পুরু ঠোঁট। চোখদুটি বড় বড়, বিষণ্ণ।

মেয়েটির মুখের ভিতর চোখদুটিই খুব সুন্দর। মনে রাখার মতো। আকর্ষণীয় চোখ দুটি ছাড়া আর সব খুব সাধারণ। সঈদের ইচ্ছে হচ্ছিল, দীর্ঘসময় ধরে চেয়ে থাকে তার চোখের দিকে, কিন্তু তা ভাল দেখাবে না মনে করে ফটোটা ফেরত দিয়ে দেয়। জহির জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি কী মনে করেন?'

জহিরের থেকে এরকম প্রশ্নের জন্য সঈদ ঠিক প্রস্তুত ছিল না। সে তখনও যেন সম্মোহিত হয়ে রয়েছে ওই বড় বড় বিষাদমাখা চোখদুটিতে। টেবিল থেকে আবার ছবিটা তুলে সে দেখে নিয়ে বলে, 'আপনিই ভাল জানেন।'

ফুল লতাপাতা আঁকা গাছে আরো একটি ফুল আঁকতে আঁকতে জহির সঈদকে বলে, 'এই ফোটোগ্রাফটা ভাল তোলা হয়নি। একটু আউট অফ ফোকাস।' ঠিক ওই সময়ে ঘরের পর্দা সরিয়ে জহিরের বিবি ভিতরে প্রবেশ করল। জহির তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

'ওর নামটা খুব অদ্ভুত,' জহির বলে ওঠে, 'বিসমিল্লা'। ওদের দুজনের সাথে আলাপ করিয়ে দেয় জহির। 'আমার বন্ধু সঈদ সাব।'

বিসমিল্লা বলে, 'আদাব।'

~ www.amarboi.com ~

সঈদ দাঁড়িয়ে বিনম্রভাবে বলে, 'বসুন।' সঈদের পাশে রাখা একটা চেয়ারের ওপর বিসমিল্লা বসে পড়ে। মেয়েটির বিষণ্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে বড় অসহায় বোধ করছিল সঈদ। তার ওপর মেয়েটির পরনে হাল্কা গোলাপি রঙের স্বচ্ছ ওড়নার পেছনে ভরাট স্তনদুটির খাঁজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল সঈদ। অন্য দিকে চোখ সরিয়ে নেয় সে।

জহির বিসমিল্লার ছবিটা খামের ভিতর ঢুকিয়ে রেখে বলে, 'আমি নিশ্চিত, বিসমিল্লা ওর প্রথম ছবিতেই সাফল্য পাবে। তবে এখনও ওর অন্য কোনও নাম ঠিক করে উঠতে পারিনি, আসলে একজন অভিনেত্রীর তো বিসমিল্লা নামটা মানায় না। আপনার কী মত?'

সঈদ বিসমিল্লার দিকে তাকাল। মিনিটখানেকের জন্য উদাস গভীর চোখদুটির গভীরে ডুবে গেল সে। এক ঝটকায় নজর সরিয়ে সে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন। অন্য নাম দিলে ভাল হয়।'

সাধারণ টুকিটাকি বিষয় নিয়ে তারা কথা চালিয়ে যাচ্ছিল। বিসমিল্লা চুপচাপ বসে আছে। কালো, ঘন, দীর্ঘ আঁখিপল্লবে তার চোখ দুটি আড়াল হয়ে গেছে। সঈদ, জহিরের সঙ্গে কথা চালিয়ে গেলেও দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারে না মেয়েটির থেকে। সঈদের চোরা চাউনি ঘোরা ফেরা করতে থাকে বিসমিল্লার স্তনের মধ্যবর্তী খাঁজের দিকে যা পাতলা ফিনফিনে ওড়নার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে।

মেয়েটির গায়ের রং খুব কালো। কালো রঙের ওপর কালো বড় বড় চোখ বলে আরো বেশি বিষণ্ণ দেখায় তাকে। ছবি দেখে মোটেই বোঝা যায়নি মেয়েটি এত কালো। সঈদ মনে মনে বোঝার চেষ্টা করে, কেন ওই চোখদুখানিতে এত বেদনা, এর কি কোনও গোপন কারণ আছে? না কি চোখের গড়নটাই এমন যা দেখে দুঃখী মনে হয়? বুঝতে পারে না সঈদ।

বম্বে থাকাকালীন একটা ঘটনার কথা জহির বলতে শুরু করলে বিসমিল্লা উঠে চলে যায়। মেয়েটির হাঁটার ধরনে কেমন যেন টলোমলো ভাব। নতুন হিল তোলা জুতো পরেছে বলে কী? তার পরনের ঘাঘরাও বেখাপ্পা, ঢিলাঢিলা, যা তার শরীরের সঙ্গে একদম মানায়নি। তাকে দেখে সঈদের মনে হল, মেয়েটি এখনও সামাজিক মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু কালো দুটি বড় চোখ বিষণ্ণতা সত্ত্বেও অনেক অজানা আবেগে ভরা।

টানা কয়েকদিন ধরে দেখা-সাক্ষাতের পর সঈদ ও জহিরের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি হল। জহির খুব প্রাণখোলা সহজ সরল মানুষ। মনের কথা সোজা সাপটা ভাবে প্রকাশ করে ফেলত সে। জহিরের জীবনযাপনও ছিল খুব সাধারণ। এতে মুগ্ধ হয়েছিল সঈদ।

সঈদ, যখনই তাদের বাড়িতে আসত, জহির ব্যস্ত হয়ে পড়ত কীভাবে সঈদকে আপ্যায়ন করবে ভেবে। অনেকবার সঈদ, তার জন্য কষ্ট করতে বারণ করেছে জহিরকে। কিন্তু জহির একবারও তার কথা শোনেনি। উত্তর দিয়েছে, 'কিসের অসুবিধে? আর ধরে নিন না, এটা আপনারই বাড়ি।'

সঈদ, প্রায়ই রোজই জহিরের বাড়িতে যেতে শুরু করল। সে বুঝতে পারছিল, আসলে সে বিসমিল্লার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছে। বিসমিল্লার আকর্ষণেই তার ও-বাড়িতে যাওয়া। সঈদ ভিতরে ভিতরে লজ্জিত হয়। বিবেকের কাঁটা খচ খচ করলেও জহিরের বাড়িতে

~ www.amarboi.com ~

প্রতিদিন যাওয়াটা বন্ধ করে পারে না।

বিসমিল্লাও তাদের আড্ডায় প্রায় এসে যোগ দেয়। প্রথম প্রথম সে চুপ করে শুধু বসে থাকত। ধীরে ধীরে সেও দু-একটা কথা বলা শুরু করে। তার কথা বলার ধরন মোটেই ভাল নয়। কীভাবে কথা বলতে হয় তা বিসমিল্লা জানে না। একথা বুঝতে পেরে সঈদ বিমর্ষ হয়ে পড়ে।

কোনও কোনও দিন জহির বাড়িতে থাকে না, সঈদ তার বাড়িতে গিয়ে তাকে ডাকাডাকি করলে বিসমিল্লা বলে, 'বাইরে গেছেন।' সঈদ বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করে, যদি মেয়েটি তাকে ভেতরে ঢোকার জন্য আমন্ত্রণ জানায়, জহিরের ফেরা পর্যন্ত থাকতে বলে। কিন্তু মেয়েটি তাকে ভিতরে ডাকে না।

জহিরের সিনেমা নিয়ে কথাবার্তা চলতে থাকে। বলে, 'সিনেমাটার জন্য আমার তাড়াহুড়ো নেই, সময় মত ঠিক হয়ে যাবে।'

জহিরের সিনেমা নিয়ে সঈদের তেমন আগ্রহ ছিল না। সে আসলে উদগ্রীব ছিল বিসমিল্লার জন্য, মেয়েটির বড় বড় কালো বিষণ্ণ চোখে কতবার যে সে ডুবেছে। তার আগ্রহ দিনে দিনে বাড়ছিল। বন্ধুর স্ত্রী সঙ্গে সে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করতে চায়, এই ভাবনা তাকে অশান্ত করে তুলছিল।

অনেকগুলো দিন কেটে গেছে। জহিরের সিনেমার কাজ বিন্দুমাত্র এগোয়নি। একদিন সঈদ জহিরের বাড়িতে গিয়ে দেখে, সে বাড়িতে নেই। ফিরে চলে আসার জন্য পিছন ফিরতেই সে বিসমিল্লার ডাক শুনতে পায়। 'ভিতরে আসছেন না কেন? কাছেই গেছেন, তাড়াতাড়িই চলে আসবেন।' সঈদের হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সে ঘরে ঢোকে, একটা চেয়ারে বসে পড়ে। টেবিলের ধার ঘেষে বিসমিল্লা দাঁড়িয়ে আছে। সঈদ তাকে বসতে বলে। সঈদের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়ে মেয়েটি। নীরবতার মধ্যে দিয়ে সময় এগিয়ে যায়। একসময় সঈদ বলে ওঠে, 'জহির তো এখনও আসছেন না।'

ছোট্ট উত্তর দেয় বিসমিল্লা, 'তাড়াতাড়িই ফিরে আসবেন।' আবার দীর্ঘস্থায়ী নীরবতা। সঈদ বার বার তাকায় মেয়েটির বড় কালো সুন্দর চোখদুটির দিকে। তার ইচ্ছে হয়, সেই বড় বড় উদাস চোখে চুমু দিতে, চুম্বনে চুম্বনে শুষে নিতে ইচ্ছে করে চোখের ভিতরে জমে থাকা সব বেদনা। নিজেকে সম্বরণ করে সঈদ বলে, 'সিনেমায় অভিনয় করার খুব আগ্রহ আছে আপনার, তাই না?'

লম্বা একটা হাই তুলে দায় সারা উত্তর দেয় বিসমিল্লা, 'হ্যাঁ'।

সঈদ বলে, 'এই পেশাটা খুব একটা ভাল না, লাইনটা খুব খারাপ।' তারপর উত্তেজিত হয়ে সে একটার পর একটা খারাপ দিক, যা যা সিনেমা লাইনে হয়ে থাকে তা এক নিশ্বাসে উগরে দিতে থাকে বিসমিল্লার কাছে। হঠাৎ জহিরের কথা মনে পড়ায় বলার বিষয়টা বদলে ফেলে বলে, 'অবশ্য আপনি যদি অভিনয়কে সত্যি ভালবেসে থাকেন তাহলে অসুবিধা হবে না।' সঈদ বলে যায়, 'যদি সত্যিই কেউ পরিশ্রম আর একাগ্রতা নিয়ে,

~ www.amarboi.com ~

ভালবেসে কাজে এগিয়ে যায়, সে সফল হবেই। আপনার স্বামী নিজেই যখন সিনেমাটার পরিচালক তখন কোনও অসুবিধা হবে না। তবে, আমার মতে অন্য কারুর সিনেমায় কাজ করবেন না।'

বিসমিল্লা চুপ করেই আছে। এতদিন পর, আজই প্রথম দুজনে, অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ ছিল, আর মেয়েটার কথা বলারই আগ্রহ নেই। সঈদ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। চুপচাপ সময় অতিবাহিত হতে থাকে। সঈদের দৃষ্টি ঘোরা ফেরা করে বিসমিল্লার ওপর। অনেকক্ষণ পর বিসমিল্লাকে একটা পান খাওয়াতে বলে। বিসমিল্লা উঠে যায় পান আনতে। ওঠার সময় তার ভরাট বুকের ওপর দৃষ্টি চলে যায় সঈদের, সিল্কের কুর্তার ভিতর থেকে যা সামান্য দুলে উঠেছিল। অস্বস্তিতে, উত্তেজিত সঈদ দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। পাশের ঘরে চলে যেতেই সঈদের মাথায় বাজে ভাবনা এসে ভর করে। অল্প সময়ের মধ্যে পান হাতে সঈদের কাছে এসে দাঁড়ায় সে। পানটা তার হাতে দিয়ে বলে, 'এই নিন।' সঈদ তাকে বলে 'শুকরিয়া।' পানটা বিসমিল্লার হাত থেকে নেবার সময়, আঙুলের স্পর্শে সারা শরীর শিহরিত হয় সঈদের। বিদ্যুৎ খেলে যায় তার শরীরে। সেই একই সময়ে সঈদের বিবেকের কাঁটা খচ খচ করে ওঠে। পান দিয়ে বিসমিল্লা আগের চেয়ারে গিয়ে বসে, সঈদের মুখোমুখি। ঘন কৃষ্ণ মুখের দিকে চেয়ে সঈদ কিছুই আন্দাজ করতে পারে না। এই মুহূর্তে সঈদের মনের ভিতর যে অস্থিরতা চলছে তা অন্য কোনও নারী কি বুঝে ফেলতে পারত? বিসমিল্লার মন পড়ার চেষ্টা করে সঈদ। হয়তো এই মেয়েটিও জানতে পেরেছে তার মনের কথা। আবার নাও বুঝতে পারে। ভাবলেশহীন মুখটি দেখে কিছু বুঝতে পারে না সঈদ।

সঈদ টানাপোড়েনের ভিতর রয়েছে। একদিকে বিসমিল্লার অস্বস্তিকর উপস্থিতি, তার বড় বড়, বিষণ্ণ চোখ আর ভরাট দুই স্তন। অন্যদিকে জহির, তার বিবেকের কাঁটা। সবটাই বিভ্রান্তিকর। বিসমিল্লার দিক থেকে কোনও ইশারাই নেই। সঈদ যে স্বপ্ন মনে মনে লালন করছিল, তা বাস্তব হবার কোনও আশাই নেই। তবু আকাঙ্ক্ষাভরা চোখে সে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

স্তব্ধতা ভেঙে সঈদ বলে, 'জহিরের তো দেখাই নেই, এবার আমার ওঠা উচিত।' তার স্বভাব বিরুদ্ধ ভাবে বিসমিল্লা বলে ওঠে, 'না, না যাবেন না, থাকুন।'

'আপনি তো কোনও কথাই বলছেন না।' বলে উঠে দাঁড়ায় সঈদ।

বিসমিল্লা জানতে চায়, 'সত্যিই চলে যাচ্ছেন?'

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সঈদ বোঝার চেষ্টা করে তার উদ্দেশ্য কী? সে বলে, 'না, ঠিক আছে আমি বসছি, আপনার অসুবিধা হবে না তো?'

বিসমিল্লা লম্বা একটা হাই তুলে বলে, 'কেন? অসুবিধার কী আছে?' বলেই তার চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়।

সঈদ জানতে চায়, 'আপনার কী ঘুম পাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।' সে বলে, 'গতকাল রাতে জেগেছিলাম।'

আন্তরিকভাবে জানতে চায় সঈদ, 'কেন?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লম্বা হাই তুলে বিসমিল্লা উত্তর দেয়, 'আমরা একটা জায়গায় গেছিলাম।'

সঈদ বসে থাকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিসমিল্লা ঘুমের গভীরে তলিয়ে যায়। সিল্কের কুর্তার নীচে তার ভরাট নিটোল স্তনরেখা ওঠানামা করে। বিষাদমাখা চোখদুটি এখন বুজে রয়েছে। ঘুমন্ত মেয়েটির ডান হাত সামনের দিকে সামান্য ঝুলে আছে। সঈদ লক্ষ করে বিসমিল্লার নগ্ন ডান হাতের কালচে বাদামি উন্মুক্ত মণিবন্ধের ওপর হিন্দি হরফে কিছু লেখা রয়েছে। আচমকা জহির এসে হাজির হয়।

হঠাৎ জহিরকে দেখে হতভম্ব হয়ে যায় সঈদ। সামান্য কেঁপে ওঠে। জহির তার হাত চেপে ধরে বিবির দিকে তাকিয়ে বলে, 'আরে ও তো ঘুমাচ্ছে।'

সঈদ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'আমি বলেছিলাম চলে যাই, ভাবি বললেন, আপনার ফিরতে বেশি দেরি হবে না। আমাকে বসতে বলে ভাবি নিজেই ঘুমিয়ে পড়লেন।'

জহির হা-হা করে হেসে উঠল, সঈদও সেই হাসিতে যোগ দিল। 'চলো উঠে পড়।' জহির কয়েকটি টোকা মারে বিসমিল্লার মাথায় তাকে জাগাবার জন্য। বিসমিল্লা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। তার বিষণ্ণ চোখদুটি খুলে যায়। সেখানে শুধু বেদনাই নয়, নিঃসঙ্গতাও রয়েছে।

'উঠে পড়ো, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো। আমাদের বেরোতে হবে, খুব দরকার আছে।' সঈদের দিকে ফিরে জহির বলে, 'আমাদের ক্ষমা করবেন সঈদসাব, আমাদের এখনই বেরোতে হবে, একজনের সঙ্গে দেখা করা দরকার। আল্লা মেহেরবান, আগামিকাল নিশ্চয়ই আমাদের দেখা হবে।'

জহিরের বাড়ি থেকে চলে আসে সঈদ। পরের দিন অভ্যাস মতো জহিরের বাড়ির দিকে এগোয়। খোদার কাছে প্রার্থনা জানায়, জহির বাড়িতে যেন না থাকে। জহিরের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই সে দেখতে পায়, ওদের বাড়ির দরজার সামনে অনেক লোকের ভিড়। সে জানতে পারে বিসমিল্লা জহিরের শাদি করা বিবি না। হিন্দু ঘরের মেয়ে সে। দেশভাগের দাঙ্গায় জহির তাকে কব্জা করেছিল। জহির জোরজুলুম করে তাকে দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করাত। আজ খানিকক্ষণ আগে পুলিশ এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করে এখান থেকে নিয়ে গেছে।

এরপর সঈদ যেখানেই যেত বড় বড় বেদনাময় চোখদুটি তাকে তাড়া করে ফিরত।

ভাষান্তর : সীমা বল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঘূর্ণি

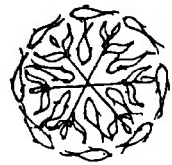

চরিত্র : বেগম সাহেব (পরিবারের কর্ত্রী, চলাফেরায় অক্ষম), আমজাদ, মজিদ (বেগমের দুই ছেলে), সঈদা (আমজাদের নতুন বউ), অসগরি (কাজের মহিলা), করিম, গুলাম মহম্মদ (চাকর)

প্রথম দৃশ্য

[নিগার ভিলার একটি ঘর। সুন্দর কাচের জানলার ওপারে ঢেউখেলানো পাহাড় দেখা যায় যা দূরে আকাশের ধূসর নীলে হারিয়ে গেছে। সকালের মৃদুমন্দ হাওয়ায় সিল্কের পর্দাগুলো দুলছে। জানলার ডানদিকে ছত্রিতে মশারি টাঙানো একটা পালঙ্ক। পাশে কাচের টেবিলের ওপর স্ফটিকের পানপাত্র, গ্লাস, ঘড়ি। টেবিলের পিছনে গোলাপি রেশমি ঢাকনায় মোড়ানো সোফাসেট। বাড়ির দুই চাকর তার ওপর কুশন সাজাচ্ছে। তাদের চেয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সাধারণ চেহারার কাজের মেয়েটি ম্যান্টেলপিসের ওপর জিনিসপত্রগুলো নতুন করে গুছিয়ে রাখছে। বেশ শুদ্ধ একটা পরিবেশ, যা সামান্য শব্দেও ভেঙে যেতে পারে। টালির মেঝের ওপর হালকা শব্দ ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। কাজের লোক তিনটি একটু সচকিত হয়ে উঠে আবার নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মধ্যবয়সি, সুন্দরী এক মহিলা ক্রাচে ভর দিয়ে ঘরে এসে ঢোকেন, চারদিকে তাকান, তাঁর মুখে তৃপ্তির ছাপ ফুটে ওঠে।]

বেগম : [স্বচ্ছন্দেই ক্রাচে ভর দিয়ে সারা ঘর ঘুরে ঘুরে দেখেন, যেখানকার যা সেখানেই তা আছে।] বেশ! [সোফায় বসার জন্য একটা ক্রাচ সরান, পরক্ষণেই না-বসে সোফার হাতলে হাত রাখেন, ওখানে কাপড়টা একটু কুঁকড়ে গেছে। সালোয়ারের এক কোণ দিয়ে কুঁকড়ে যাওয়া জায়গাটা ঠিক করেন, ক্রাচটা আবার ঠিক ক'রে ধরে কাজের মেয়েটিকে ডাকেন] অসগরি!

অসগরি : [খুব মনোযোগী হয়ে ওঠে] বলুন বেগম।

~ www.amarboi.com ~

বেগম : [কী বলতে চেয়েছিলেন মনে না করতে পেরে] কী বলতে যাচ্ছিলুম বল তো?

অসগরি : [হেসে] বলতে যাচ্ছিলেন, আপনি একেবারেই খুশি হননি। আমারও তাই মনে হয়। কনে এতই সুন্দর যে ঘরে ঢুকলে এতসব সাজসজ্জা তার রূপের কাছে মিইয়ে যাবে। [ফায়ারপ্লেসের ওপর সিল্কের দড়ি দিয়ে ঝোলানো কনের ছবির দিকে তাকায়]

বেগম : [মৃদু হাসতে হাসতে ফায়ারপ্লেসের দিকে এগোন, ছেলের বউয়ের ছবির দিকে অভিনিবেশ তাকিয়ে থাকেন। তাঁকে বেশ খুশি মনে হয়, কিন্তু মুহূর্তেই মুখে যেন মেঘের ছায়া] অসগরি!

অসগরি : বেগম।

বেগম : সকাল থেকে কী যে একটা অস্বস্তি হচ্ছে।

অসগরি : আমজাদ মিয়া যে দুলহন নিয়ে আসছেন।

বেগম : [ভাবনায় ডুবে গিয়ে] হুঁ। যে-কোনও মুহূর্তেই এসে পড়তে পারে। কামাল তো ওদের আনতে গাড়ি নিয়ে স্টেশনে গেছে।

অসগরি : আসছে বছর মজিদ মিয়ার শাদি দিয়ে দিন, তাহলেই বাড়িটা একেবারে হৈ-হুল্লোড়ে ভরে যাবে।

বেগম : আল্লার ইচ্ছে...তাঁর দয়া হলে মজিদের বিয়েও ধুমধাম করেই হবে। [ফিস ফিস করে] ইনশাল্লাহ।

অসগরি : [কনের ছবির দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে] খোদা যেন কুনজর থেকে বাঁচান।

বেগম : [প্রায় আর্তনাদ করে ওঠেন] অসগরি!

অসগরি : [ভয় পেয়ে] জি বেগম।

বেগম : কিছু না...করাচির গাড়ি কখন আসে?

অসগরি : জানি না, বেগম।

বেগম : [একজন চাকরকে] : করিম, ফোন করে দেখো তো... কিন্তু ট্রেন তো কাল রাওয়ালপিণ্ডিতে পৌঁছেছে। ওখান থেকেই তো মজিদের তার এল।

করিম : তাই তো।

বেগম : [উদ্বিগ্ন স্বরে] তাহলে কামালকে কোন স্টেশনে পাঠালাম...খোদাই জানেন, আমার মাথার যে কী হয়েছে...আমজাদ মিয়ার তো রাতে বন্ধু সঈদের কাছে রাওয়ালপিণ্ডিতেই থাকার কথা...এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওরা বেরিয়ে পড়েছে। [অন্য চাকরকে] গুলাম মহম্মদ।

গুলাম মহম্মদ : জি।

বেগম : কামাল কোথায় গেল দেখো...গাড়িটা কোথায় নিয়ে গেল?

~ www.amarboi.com ~

গুলাম মহম্মদ : এক্ষুনি দেখছি। [বেরিয়ে যায়]

বেগম : [অসগরির কাঁধের ওপর ভর দিয়ে] সকাল থেকে শরীরটা একেবারেই ভাল লাগছে না রে...ঠিকমত চলতে ফিরতে পারলে আর ডাক্তার হিদায়েতুল্লা বারণ না করলে আমি নিজেই গিয়ে বহুকে নিয়ে আসতাম। [বাইরে ফোন বেজে ওঠে] মনে হচ্ছে, আমজাদ মিয়ার বন্ধুর ফোন, ওরা তাহলে রওনা দিয়েছে। দৌড়ে যা অসগরি। [অসগরি দৌড়ে চলে যায়। করিমের দিকে তাকিয়ে বেগম বলেন] যাক, আমজাদ মিয়া এসে পড়ল বলে।

করিম : খোদা তাঁকে ভালভাবে নিয়ে আসুন।

বেগম : [প্রায় আর্তনাদ ক'রে] কী বলতে চাও তুমি?

করিম : [আতঙ্কিত] কিছু না বেগম...আল্লা...

অসগরি : [চীৎকার ক'রে] বেগম সাহেব, বেগম সাহেব...

বেগম : [হতবুদ্ধি হয়ে] কী, কী হয়েছে?

[উত্তেজিত অসগরি ঘর ঢোকে।]

অসগরি : বেগম সাহেব...বেগম সাহেব!

বেগম : [ক্রাচ চেপে ধ'রে] কী হয়েছে?

অসগরি : মজিদ মিঞার ফোন...গাড়ি...গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

বেগম : [আর জোরে ক্রাচ চেপে ধরেন] তারপর?

অসগরি : আমজাদ মিয়া আর দুলহন জখম হয়েছে, এখন হাসপাতালে।

বেগম : [ক্রাচ আলগা হয়ে পড়ে যায়। পাথরের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দরজার দিকে এগোন] কামাল কোথায়?...গাড়ি আনতে বলো... রাওয়ালপিণ্ডি যাব। [বেগম দরজার দিকে এগোন, গুলাম মহম্মদ ও অসগরি বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকে। অসগরি আর্তনাদ করে ওঠে, বেগম তার দিকে ফিরে তাকান] কী হয়েছে?

অসগরি : বেগম সাহেব...আপনি হাঁটছেন...আপনি হাঁটতে পারেন!

বেগম : আমি? [বুঝতে পারেন, তাঁর হাতে ক্রাচ নেই] আমি কী করে হাঁটতে পারি?

[ঘুরতে ঘুরতে মেঝেতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যান।]

অসগরি : [দৌড়ে গিয়ে] গুলাম মহম্মদ, ডাক্তার সাহেবকে ফোন করো তাড়াতাড়ি।

[গুলাম মহম্মদ বেরিয়ে যায়। মেঝেতে বসে অসগরি বেগমের মাথা কোলে তুলে নিয়ে হুঁশ ফেরানোর চেষ্টা চালিয়ে যায়।]

অসগরি : বেগম সাহেব, বেগম সাহেব!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সকাল। একই ঘর। সিল্কের পর্দা হালকা হাওয়ায় দুলছে। পালঙ্কের ওপর কনে সঈদা কম্বলের নীচে শুয়ে আছে। কাচের টেবিলের ওপর ঘড়িতে অ্যালার্ম বেজে ওঠে। কম্বল নড়ে ওঠে, সঈদা পাশ ফেরে, চোখ খোলে, ঝুঁকে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে। তার ভারী চোখের পাতা কাঁপে। বালিশে হেলান দিয়ে বসে দূরের পাহাড়ের দিকে শিশুর মতো তাকিয়ে থাকে। কম্বল ছুঁড়ে ফেলে সে পালঙ্ক থেকে লাফিয়ে নামে। জানলার পর্দা পুরো সরিয়ে বাইরে তাকায়। পাখির গান শোনা যায়, ভাবনায় ডুবে যায় সে। রাত্রির হাল্কা পোশাকে তার যৌবনোদ্ধত শরীরের রেখাগুলি দেখা যায়। সঈদা শুধু সুন্দরী নয়, নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতনও। পাখির গানের বিপ্রতীপে অসগরির খসখসে গলা শোনা যায়। সঈদা চমকে ওঠে।]

অসগরি : দুলহন বেগম। [সঈদা জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।] মজিদ মিয়া এখনই হাসপাতাল থেকে এলেন। বললেন, গিয়ে দেখো, আপনি ঘুম থেকে উঠেছেন কিনা?

সঈদা : কোনও খবর এনেছেন?

অসগরি : মিয়াকে এখানে আসতে বলি গিয়ে।

[অসগরি চলে যায়। জানলা থেকে সরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায় সঈদা, আয়নায় নিজেকে দেখে, দুহাতে চুল ঠিক করে, তারপর পালঙ্কের কাছে গিয়ে ওড়না তুলে কাঁধে জড়িয়ে নেয়। বাইরে থেকে পদশব্দ শোনা যায়। সঈদা চমকে উঠে দরজার দিকে তাকায়, মজিদ ঢুকছে। সুগঠিত চেহারা, হাল্কা বাদামি গায়ের রং। বয়সের চেয়ে তাকে বড় দেখায়।]

মজিদ : সালাম ভাবিজান।

সঈদা : সালাম।

মজিদ : [সোফার পাশে এসে দাঁড়ায়] শরীর কেমন?

সঈদা : [অন্যমনস্কভাবে] ঠিক আছে। [সোফায় বসে] রাওয়ালপিণ্ডি থেকে কী খবর আনলে?

মজিদ : [সঈদার সামনে দাঁড়িয়ে] তেমন কিছু না... [চাপা শ্বাস পড়ে] এখন তো ওকে বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে।

সঈদা : কেন?

মজিদ : পুরো ব্যাপারটায় তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। [একটা চেয়ারে বসে] আমি ওইরকম অবস্থায় থাকলে আত্মহত্যা করতাম।

সঈদা : [উঠে জানলার কাছে যায়] আমার ভাগ্যে এই লেখা ছিল, কে জানত? কত লোক মারা গেল, আমিও তো মরতে পারতাম।

মজিদ : খোদা তো তা চাননি।

সঈদা : [বাইরে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে] হ্যাঁ, আল্লা মঞ্জুর করেননি। তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল, আমার পায়ে সামান্য আঁচড় লাগুক আর গোটা জীবনটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চুরচুর হয়ে যাক [কাঁদতে থাকে, তারপর ওড়না দিয়ে কান্না মোছে।] খোদার ইচ্ছে ছিল, আমার শওহরের কোমর ভেঙে যাক, আর আমি সারা জীবন একটা কাটা ঘুড়ির মতো হাওয়ায় উড়তে থাকব।

মজিদ : [উঠে দাঁড়ায়] ভাবিজান, তোমাকে শক্ত হতে হবে...কে বলতে পারে, ও হয়তো ভাল হয়ে উঠবে।

সঈদা : [ক্ষুব্ধ স্বরে] মজিদ, আমাকে অন্তত বোকা বানানোর চেষ্টা করো না। ছ'মাস ধরে ও হাসপাতালের বিছানায় পড়ে আছে। ডাক্তারদের সিদ্ধান্ত আমি ভালমতই জানি... ও কখনও ভাল হবে না...ওর পা দুটো আর কোনও কাজে আসবে না...তবু, তবু একটা কথা সত্যি, ওর সাহস আছে...যখন আমি ওকে দেখতে গিয়েছি, আমাকে পাশে বসিয়ে সবসময় বলেছে, ভয় পেয়ো না সঈদা, আমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাব। তারপর আমাকে ওর প্রিয় পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যাবে। করাচিতে কতবার পাহাড়ের কথা আমাকে বলত। আমাকে সাহস জোগানোর জন্য বলেছে, এই দুনিয়ার আরেক নাম দুর্ঘটনা। আল্লার মেহেরবানি, আমি তো বেঁচে গেছি, নাহলে...তারপর ও যা বলেছে, তা ভাবতে গেলেও আমি ভয়ে কুঁকড়ে যাই।

মজিদ : কী?

সঈদা : [চোখ জলে ভেজা] বলেছে, আমি চলে গেলে, তুমি অন্য কারোর হবে। [কাঁদতে থাকে] এমন কথা ও কেন ভাবে মজিদ?

মজিদ : জানি না।

সঈদা : তোমার জানা উচিত। [কয়েক পা এগিয়ে সে সোফায় গিয়ে বসে। ওড়না খসে যায়, রাতপোশাকের আড়ালে তার স্তন দৃশ্যমান] তুমি পুরুষমানুষ... ওর ভাই... তোমার যদি এমন অ্যাকসিডেন্ট হত?

মজিদ : আমজাদ ভাইয়ের মতো আমি এসব কথা ভাবতে পারতাম না।

সঈদা : কেন?

মজিদ : আমরা দুজনেই পুরুষ...দুই ভাই...তবু আমাদের ভাবনা—আবেগ, সব আলাদা।

সঈদা : [বিড়বিড় করে] ভাবনা—আবেগ। ভাবনা—আবেগ...

[অসগরির প্রবেশ]

অসগরি : মজিদ মিয়া, বেগম সাহেব আপনাকে ডাকছেন।

মজিদ : তুমি যাও, আমি আসছি।

অসগরি : তাড়াতাড়ি যেতে বললেন।

মজিদ : ঠিক আছে। [সঈদার দিকে তাকায়] আমি এক্ষুনি আসছি।

[মজিদ বেরিয়ে যায়।]

[অসগরি ফরাসের ওপর বসে সঈদার পা টিপতে থাকে।]

সঈদা : [পা সরিয়ে নিয়ে] সরো অসগরি।

~ www.amarboi.com ~

অসগরি : [সঈদার পা জড়িয়ে ধরে] না, দুলহন বেগম, [পায়ের আঙুল টিপতে থাকে] মজিদ মিয়া কোনও খবর এনেছেন?

সঈদা : বলল, উনি বাড়িতে আসতে চান।

অসগরি : এ তো খুবই আনন্দের কথা।

সঈদা : [বিষণ্ন গলায়] হ্যাঁ।

অসগরি : বেগম সাহেব কিন্তু খুব রেগে গেছেন, মজিদ মিয়া কেন যে এত দেরি করলেন।

সঈদা : কোথায়?

অসগরি : আপনার কাছে এসে।

সঈদা : আমার কাছে? তা বেগম সাহেব কী বললেন?

অসগরি : কিছু না...ওনার মেজাজ তো আজকাল খুব খারাপ...কোনও কথাই ভাল লাগে না...আমজাদ মিয়ার চেয়ে আপনার জন্য বেগম সাহেবের খুব কষ্ট...সব সময় তো আপনাকে নিয়েই ভাবছেন...তা, আমজাদ মিয়া তো ভাল হয়ে গেছেন, না?

সঈদা : [রেগে পা সরিয়ে নেয়] হ্যাঁ, ভাল হয়ে গেছেন।

[বেগম সাহেব ঘরে ঢোকেন আসগরি উঠে দাঁড়ায়।]

সালাম খালাজান!

বেগম : সালাম বেটা... জিতে রহো... [সঈদার মাথায় খুব স্নেহের সঙ্গে হাত রাখেন] মজিদ তো তোমাকে বলেছে...

সঈদা : হ্যাঁ।

বেগম : বেচারা হাসপাতালে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। [অসগরির দিকে তাকান] তুমি যাও, অসগরি। [অসগরি চলে যায়] ওর ইচ্ছে, তোমার কাছে এসে থাকে। আমাকে বলেছে, 'যদি মরতেই হয়, চোখের সামনে যেন সঈদাকে দেখতে পাই।'

[সঈদার চোখ জলে ভরে ওঠে। সে বেগম সাহেবকে জড়িয়ে ধরে। তিনিও কাঁদছেন।]

বেগম : ও তোমাকে পাগলের মতো ভালবাসে, কিন্তু তোমাকে জিগ্যেস করতে বলেছে, ও এখানে থাকলে কোনও আপত্তি নেই তো?

সঈদা : [বিষণ্ন স্বরে] আমার আপত্তি!

বেগম : ওকে দেখলে তুমি আরও কষ্ট পাবে, সেজন্যই।

সঈদা : ও এভাবে কেন ভাবে, খালাজান? ও কেন এভাবে ভাবে?

বেগম : ও এইরকমই... সবসময় অন্যের কথা ভাবে।

সঈদা : ও এখানে আসবে... কেন আসবে না? [গলায় কান্নার রেশ] কিন্তু এমন কথা যেন না বলে।

বেগম : ডাক্তাররা বলেছেন, মন খুশ থাকলে কয়েক মাসের মধ্যেই ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে পারবে... [ডুকরে কেঁদে ওঠেন] আর ওর অ্যাকসিডেন্টের খবরে আমার আর ক্রাচের প্রয়োজন রইল না। যদি জানতাম, ক্রাচ ওর

~ www.amarboi.com ~

জীবনের সঙ্গী হতে চলেছে, তবে আমি জোরে ক্রাচ আঁকড়ে থাকতাম। বেটা, জীবন তো এক ঘূর্ণিঝড়, শক্তপোক্ত নৌকাতে বসেও ডুবে যেতে পারো, আবার একটা খড়ের কুটো ধরে কেউ তীরে পৌঁছে যায়। [একটু থেমে] আমজাদ তোমাকে আর একটা জিগ্যেস করতে বলেছে, সঈদা বেটা।

সঈদা : বলুন খালজান।

বেগম : তুমি ওকে ভালবাসবে?

সঈদা : [হতবুদ্ধি হয়ে] ভালবাসা...

বেগম : [সঈদার মাথায় হাত বোলান] তোমার ওপর আর চাপ দিতে চাই না, বেটা।

[বেগম বেরিয়ে যান।]

সঈদা : [ওড়নায় চোখের জল মুছতে মুছতে] ভালবাসা...ভালবাসা...! ভাবনা আর আবেগ...মাথা আর মন... [ধীর পায়ে ফায়ারপ্লেসের দিকে এগিয়ে যায়, যেখানে তার ছবি সিল্কের দড়ি দিয়ে দেওয়ালে টাঙানো] বল্, সঈদা, তুই ওকে ভালবাসবি?

[কাচের পাত্রের টুংটাং আওয়াজ শোনা যায়। অসগরি ব্রেকফাস্টের ট্রে নিয়ে ঢোকে, টেবিলে রাখে।]

অসগরি : দুলহন বেগম, আপনি না ভালবাসলে আমজাদ মিয়াকে কে ভালবাসবে?

সঈদা : [চমকে ওঠে] কী বললে?

অসগরি : কিছু না...নিজেকেই বলছিলাম...নাস্তা করে নিন।

সঈদা : তুমি যাও।

অসগরি : জি। [একবার সঈদার দিকে, একবার তার ছবির দিকে তাকাতে তাকাতে অসগরি চলে যায়।]

[চিন্তামগ্ন সঈদা আস্তে আস্তে সোফার দিকে এগিয়ে যায়, তারপর আবার কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ে]

সঈদা : [সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে] দুলহন বেগম আমজাদ মিয়াকে ভাল না বাসলে, আর কে ভালবাসবে... [চিৎকার করে ওঠে] আর কে ভালবাসবে? আর কে ভালবাসতে পারে?

তৃতীয় দৃশ্য

[নিগার ভিলার বাগান। মাঝখানে ছোট ছোট গাছে ঘেরা ঝরনা ; পরিচ্ছন্ন রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ। সবকিছুর মধ্যে যেন শুদ্ধতার ছোঁয়া। মৃদুমন্দ হাওয়া থমকে গেছে যাতে ফুলের কুঁড়িগুলো ফুটতে পারে। অনেকগুলো চেয়ার পাতা আছে, যার একটিতে গোলাপি পোশাকে সঈদা বসে আছে। সঈদার সৌন্দর্যে সবকিছু ঝলমল করছে। অন্য চেয়ারে শান্ত মজিদ, সিগারেট টানছে, ধোঁয়ার রিং ওড়াচ্ছে। তার মুখোমুখি হুইলচেয়ারে আমজাদ।

~ www.amarboi.com ~

চেয়ারটির মতোই তাকে অসহায় দেখায়। তার মুখ বিবর্ণ, কিন্তু চোখ উজ্জ্বল, যেন সেই চোখে সঈদার সৌন্দর্যেরই প্রতিফলন।]

আমজাদ : [চারদিকে তাকিয়ে] কী অপূর্ব আবহাওয়া!

সঈদা : [হঠাৎ মনোযোগী] হুঁ।

আমজাদ : মজিদ, যাও না, সঈদাকে একটু পাহাড়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এসো... [পিছন ফিরে দেখার চেষ্টা করে] ওঃ, কিছুতেই পাশ ফিরতে পারি না...মজিদ, আমার চেয়ারটা ওদিকে ঘুরিয়ে দাও... একটু পাহাড় দেখতে চাই...

[মজিদ উঠে দাঁড়ায়, কিন্তু সঈদা তার আগেই এসে আমজাদের হুইলচেয়ার ঘুরিয়ে দেয়। তখন তিনজনেই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে। আমজাদ যেন পাহাড়ি দৃশ্য পান করছে।]

আমজাদ : সঈদা, ওই দ্যাখো পাহাড়, আমি এত ভালবাসি, কিছুতেই বুঝিয়ে বলতে পারব না। [মজিদকে] যাও মজিদ, সঈদাকে পাহাড় দেখিয়ে নিয়ে এসো... [সঈদাকে] সঈদা, পাহাড়ে উঠতে উঠতে যখন শ্বাস নিতে কষ্ট হবে, প্রায় বন্ধ হয়ে আসবে, তখন বুঝতে পারবে, এই অনুভূতির চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছুতেই নেই। মজিদের অনিচ্ছাতেই আমি ওকে নিয়ে যেতাম, কিন্তু ও কিছুটা উঠেই থকে যেত। আমাকে বলত, 'ভাইজান, তোমার এই নেশা আমার ভাল লাগে না... শ্বাসরোধ হয়ে পাহাড়ে চড়ার মানে কী?' [হাসে] পাহাড়ে চড়ার, তাকে জয় করার আনন্দ ও কখনও বুঝতে পারবে না। সঈদা?

সঈদা : [হেসে] বলো।

আমজাদ : [মজিদকে] যাও ইয়ার, সঈদাকে নিয়ে যাও। কিছু একটা কাজ তো করো।

মজিদ : [সঈদাকে] চলো ভাবিজান...[আমজাদকে] বাজি ধরে বলছি, আজকের পর ভাবিজান আর ওমুখো হবে না।

সঈদা : না... না... এ-কথা কী করে বলছো তুমি?

মজিদ : কারণ, ভাইজানের দিল আর দিমাগ অন্যরকম।

সঈদা : দিল—দিমাগ? মাথা আর মন? ও দুটো কী জিনিস?

মজিদ : পাহাড়ে একবার চড়লেই বুঝতে পারবে।

আমজাদ : [হেসে] বাজে কথা বলো না মজিদ। সঈদার জীবনের সামনে একটা পাহাড়ই দাঁড়িয়ে আছে...একটা পাহাড়ে চড়েই ও যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ে...তাহলে...

সঈদা : চলো মজিদ মিয়া।

মজিদ : চলো।

[ওরা চলে যায়। অসগরি এক প্লেট কাটা আপেল নিয়ে আসে। জিজ্ঞাসু চোখে মজিদ ও সঈদার চলে যাওয়া দেখে, তারপর আমজাদকে বলে—]

অসগরি : একটু আপেল খান।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমজাদ : [সঈদা ও মজিদকে পাহাড়ি পথে নাবতে দেখে] খেয়ে নেব।

অসগরি : [ওদের চলে যাওয়া দেখতে দেখতে] দুলহন বেগমকে আজ কী যে সুন্দর দেখতে লাগছে!

আমজাদ : [ঘাড় ঘুরিয়ে অসগরির দিকে তাকায়] দেখতে?

অসগরি : [হতচকিত হয়ে হেসে] জি।

আমজাদ : [আবার ওদের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে] সঈদা সুন্দরী। ওকে সুন্দর দেখায় না, ও সুন্দরী। সুন্দরী হওয়া আর সুন্দর দেখতে লাগার মধ্যে জমিন-আসমান তফাত অসগরি।

অসগরি : তা ঠিকই বলেছেন।

আমজাদ : আপেল দাও।

অসগরি : [প্লেট এগিয়ে দেয়] এই যে... ছুলেই এনেছি।

আমজাদ : মানে?

অসগরি : ছুলে আনা ফল দেখলে অনেকে বুঝতে পারে না... [হেসে] ওর টুকটুকে লাল গাল তো ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে।

আমজাদ : [হাসে] অসগরি, তুমি খুব শয়তান হয়েছো দেখছি!

অসগরি : [গম্ভীর হয়ে] শয়তান? আমজাদ মিয়া, আপনি একবার আমাকে বলেছিলেন, শয়তানই খোদার সবচেয়ে প্রিয় ফরিস্তা, কিন্তু মাটি থেকে তৈরি আদমকে সে সেজদা করতে চায়নি।

আমজাদ : হ্যাঁ, বলেছিলাম বটে।

অসগরি : আর সেজন্য ফরিস্তাদের হেড মাস্টারকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

আমজাদ : ঠিক।

অসগরি : তাহলে এও কি ঠিক...

আমজাদ : কী?

অসগরি : কিছু না...ঠিকটা আসলে কী? যা আপনি ঠিক ভাবেন, নয়তো ভাবার চেষ্টার করেন। হয়তো এমন একটা ভুল, যা আপনি একসময় করেছিলেন, ভেবেছিলেন, আপনিই তা ঠিক হয়ে যাবে বা ধরুন একটা ঠিক কাজকে আপনি ভুল বানিয়ে দিচ্ছেন, ভাবছেন আবারও তাকে উল্টে দেবেন...কিন্তু এগুলো সব ফালতু কথা, আমি বুঝতে পারি না। আমি তো একটা মোটামাথা মেয়েছেলে আমজাদ মিয়া।

আমজাদ : এসব কী কথা বলছো আজ?

অসগরি : আমি মোটা মাথা ঠিকই, তবে মেয়ে তো বটে।

আমজাদ : অসগরি, তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।

অসগরি : [প্লেট থেকে এক টুকরো আপেল তুলে আমজাদের মুখের সামনে ধরে] আপেল খান।

আমজাদ : [দাঁতে আপেলের টুকরো কামড়ে ধ'রে] আগে কখনও তুমি এমন ভাবে কথা বলতে না।

~ www.amarboi.com ~

অসগরি : আজকের মৌসমই এত সুন্দর।

আমজাদ : তার মানে?

অসগরি : [আর এক টুকরো আপেল তুলে] আর এক টুকরো নিন। [মুখে ভরে দেয়]

আমজাদ : [আপেল চিবোয়, কিছুক্ষণ পরে ডাকে—] অসগরি।

অসগরি : [পাহাড়ের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে বিভোর] বলুন, আমজাদ মিয়া।

আমজাদ : তোমার শাদির ব্যবস্থা করি?

অসগরি : বিয়ে?

আমজাদ : এই তো তোমার বিয়ের সময়।

অসগরি : কেন আমজাদ মিয়া?

আমজাদ : বিয়ে খুব ভাল ব্যাপার অসগরি... জীবনে বিয়ের চেয়ে আনন্দ আর কিছুতে নেই... আম্মিজানকে বলছি, তাড়াতাড়ি তোমার বিয়ে দিতে।

অসগরি : না, আমজাদ মিয়া।

আমজাদ : কেন?

অসগরি : আমার ভয় করে।

আমজাদ : কাকে?

অসগরি : [বাগানের ঘাসে বসে উদ্বিগ্ন স্বরে বলে] শাদিকে।

আমজাদ : [হেসে] পাগলি কোথাকার!

অসগরি : সত্যি বলছি আমজাদ মিয়া, বিয়ে করতে আমার খুব ভয় করে, আমি নোকরানি, আমার বিয়ে হলেই বা কী, না-হলেই বা কী... যদি হয় আর তারপর যদি ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট...

আমজাদ : [ক্লান্ত স্বরে] অসগরি!

অসগরি : যদি ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হয়, আপনাদের অসগরি যদি মরতে মরতে বেঁচে যায়, একটা পা নেই, একটা হাত নেই, একটা চোখও নেই, অর্ধেক অসগরিই নেই, বাকি অর্ধেক বেঁচে আছে... না, না, আমজাদ মিয়া, আমার বিয়ের কথা তুলবেন না। বিয়ে মানে তো পুরোটা, অর্ধেক নয়, চার আনাও নয়।

আমজাদ : [চিন্তিত স্বরে] অসগরি!

অসগরি : [চাপা স্বরে] জি।

আমজাদ : ঠিক বলেছো... [বেদনাময় স্বরে]...কিন্তু আমাকে দুঃখ দিও না, আমি খুশি থাকতে চাই...এই ভাঙা পা নিয়েই খুশিতে থাকতে চাই... আমার সামনে এসব কথা বলো না... খুব কষ্ট হয়।

অসগরি : [আমজাদের পা জড়িয়ে ধরে] মাফ করে দিন আমজাদ মিয়া। চোখ জলে ভরে যায়, কী যে আজেবাজে কথা বলে গেলাম... আপনি সুখে থাকুন, খোদা আপনাকে খুশ রাখুন।

~ www.amarboi.com ~

আমজাদ : [সামনে নিয়ে] খোদার নাম নিও না...তিনি আমাকে খুশ রাখতে চাইলে কি এমন দুর্ঘটনার মধ্যে আমাকে ফেলতেন... আর যদি এমনটাই করলেন, তাহলে আমাকে মেরে তার শিকারের ঝোলায় কেন ফেলে দিলেন না... খোদার নাম নিও না... আমাদের মধ্যে আর দোস্তি নেই... আমাকে খুশি থাকতে হলে, নিজের মতো করেই খুশি থাকতে হবে, এই ভাঙাচোরা শরীর নিয়েই। এই শরীরেই আমাকে সুখের ঘর বানিয়ে নিতে হবে।

অসগরি : শুধু আপনার খুশির জন্য?

আমজাদ : [বেদনাবিদ্ধ স্বরে] অসগরি, তুমি এত নিষ্ঠুর কেন... কথা বলতেই যদি জানো তুমি, তবে আমাকে খুশি করার চেষ্টা করো... আমায় একটু সাহায্য করো... ভাঙা জীবনের যে-কয়েকটা দিন আমার সামনে পড়ে আছে, সেই দিনগুলোয় যাতে একটু বেঁচে থাকতে পারি।

অসগরি : এভাবে কথা বলবেন না, আমজাদ মিয়া, আমার বুক ফেটে যায়... আপনি আমার মালিক, আমাকে হুকুম করতে পারেন। আমি সবসময় আপনার পাশে আছি। [তার চোখের জল আমজাদের চটির ওপর ঝরে পড়ে... সে উঠে একপাশে সরে দাঁড়ায়।]

[আমজাদ তার চটির দিকে তাকায়, যেখানে অসগরির অশ্রু লেগে আছে। মাথা তুলে দেখে অসগরি চলে যাচ্ছে। বাড়ির দিক থেকে শাল জড়িয়ে বাগানে আসেন বেগম সাহেব, হাতে গয়নার কয়েকটা বাক্স।]

বেগম : আমজাদ বেটা।

আমজাদ : [নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে] জি।

বেগম : সইদার জন্য যেসব গয়না পছন্দ করেছিলে, এসে গেছে। দ্যাখো।

[আমজাদের কোলে বাক্সগুলো রাখেন।]

আমজাদ : [শিশুর উৎসাহে সে একে একে বাক্স খোলে, গয়না দেখে, উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে] দারুণ... অপূর্ব... খুব সুন্দর... তবে সঈদার মতো সুন্দর নয়... অসগরি... অসগরি... একবার এসো...

[অসগরি আসে। আমজাদ তাকে গয়নাগুলো দেখায়।]

আমজাদ : কেমন? কেমন লাগছে?

অসগরি : আপনি নিজেই তো বললেন, দুলহন বেগমের মতো সুন্দর নয়।

আমজাদ : [বেগমকে] আম্মিজান, জামাকাপড়গুলো কবে আসবে?

বেগম : কালকের মধ্যে এসে যাবে।

আমজাদ : ফিল্ম প্রোজেকটরটা এখনও এল না কেন?

বেগম : মজিদ অর্ডার দিয়ে এসেছে, দু'একদিনের মধ্যেই এসে যাবে।

আমজাদ : ঠিক আছে। [একটু থেমে] আম্মিজান।

বেগম : বলো বেটা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমজাদ : সঈদার জন্য আরও কিছু দরকার... আমি ওকে এক মুহূর্তের জন্যও অসুখী দেখতে চাই না...রোজ ওর জন্য নতুন কিছু না কিছু আনতেই হবে।

বেগম : তোমার যা ইচ্ছে তা-ই হবে।

আমজাদ : আমার ইচ্ছে? [ইতস্তত ক'রে] আম্মিজান...

বেগম : বলো।

আমজাদ : কামালকে কোনও স্পোর্টস স্টোরে গিয়ে সব ইনডোর গেম নিয়ে আসতে বলো। সঈদা আর মজিদ খেলবে... আমি দেখব। আর বলো, এমন দু'একটা খেলা আনতে যা আমি সঈদার সঙ্গে খেলতে পারি।

বেগম : [আমজাদের মাথা নিজের বাহুডোরে নিয়ে] বেটা... বেটা আমার!

[আমজাদ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। অসগরি মাথা নিচু করে এক কোণে গিয়ে দাঁড়ায়। বেগম নীরবে কাঁদেন।]

চতুর্থ দৃশ্য

[রাত। সেই ঘর, যা প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা গেছে। পালঙ্কে শুয়ে আছে সঈদা। তার হাল্কা সোনালি চুল বালিশে ছড়ানো। সে বই পড়ছে, কিন্তু বইতে তার মন নেই। পালঙ্কের ডানদিকে হাসপাতালের মতো একটা খাট। আমজাদ হুইলচেয়ারে বসে আছে, তার হাতেও একটা বই। তার চোখ এ-দিক ও-দিক ঘুরছে। বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে আমজাদের চোখ কখনও চলে যাচ্ছে সঈদার হাত, তার সোনালি চুলের দিকে। বইটা পাশে সরিয়ে রেখে এবার সে শান্ত স্বরে কথা বলে।]

আমজাদ : সঈদা।

সঈদা : [চমকে ওঠে] বলো।

আমজাদ : এবার ঘুমিয়ে পড়ো।

সঈদা : [আমজাদের দিকে ফিরে] তুমি শুতে চাইলে গুলাম মহম্মদ, করিমকে ডাকি। ওরা তোমাকে বিছানায় শুইয়ে দেবে।

আমজাদ : [হতাশ স্বরে] শুইয়ে দেবে? না সঈদা, শুয়ে থাকতে থাকতে আমি ক্লান্ত... আমি আজ চেয়ারেই ঘুমোব, তোমার অসুবিধে না-হলে বড় আলোটা নিভিয়ে সবুজ আলোটা জ্বালিয়ে দাও।

সঈদা : [বিছানা থেকে উঠতে উতে] আমার অসুবিধের কথা বার বার কেন বলো?

আমজাদ : আমিই তো সবসময় অস্বস্তির মধ্যে রয়েছি।

সঈদা : [বিরক্ত হয়ে] তোমার অসুবিধের কথা আমি জানি... বলো, আমি কী করব... যা বলবে, তাই করব... কিন্তু সবসময় তুমি আমার অসুবিধের কথা ভাবছ কেন? আমার তো কোনও অসুবিধে নেই।

~ www.amarboi.com ~

আমজাদ : তুমি খুব ভাল, সঈদা।

[সঈদা আলো নিভিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ অন্ধকার। হাল্কা সবুজ আলোয় ভরে যায় ঘর।]

সঈদা : যদি সত্যিই ভাল হতে পারতাম।

[সঈদা সোফায় এসে বসে। তার উত্তেজনা বোঝা যায় বুকের দ্রুত ওঠানামা দেখে।]

আমজাদ : এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারতে তুমি, সঈদা?

সঈদা : [কঠিন স্বরে] না... তুমি জানো না।

আমজাদ : [কোমল স্বরে] কোনও ভাবে তোমাকে বিরক্ত করে থাকলে ক্ষমা করে দিও।

সঈদা : [আমজাদের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ায়, মৃদু হাসে, দশ আঙুলে নিজের চুল আঁচড়ে নেয়] সত্যি বলতে কি, আমি তোমার যোগ্য নই, আমজাদ।

আমজাদ : [সঈদার হাত চেপে ধরে] ও তোমার মহানুভবতা, বাস্তব তো আসলে এর উল্টোটাই।

সঈদা : [আমজাদের মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে] ঘুমোও... কত রাত যে তুমি জেগে আছো, বাড়িতে আসার পর থেকে একবারও তোমার চোখের পাতা বোজেনি।

আমজাদ : আমি ঘুমোতে পারি না, সঈদা।

সঈদা : কেন?

আমজাদ : জানি না...মনে হয়, আর কখনও ঘুমোতে পারব না। রাতে ঘুমোনোর ব্যাপারটাই আমি ভুলে গেছি।

সঈদা : আচ্ছা, আমার ঘুম তোমাকে দিয়ে দেব।

আমজাদ : না, সঈদা। ঘুমের মতো মূল্যবান জিনিস আমি তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাই না। ঘুম এসে তোমার চোখকে ঢেকে দিক... তুমি জানো না, ঘুমিয়ে থাকলে তোমার চোখ যে কী সুন্দর দেখায়... যাও, শুয়ে পড়ো।

সঈদা : হ্যাঁ, তারপর ঘুম তো একসময় আসবেই।

আমজাদ : এভাবে বলো না...খোদা তোমাকে ভাল রাখুন...যাও শুয়ে পড়ো।

সঈদা : [বিরক্ত স্বরে] সব সময় আমার সঙ্গে এত নরম ভাবে কথা বলো কেন... আমজাদ, আমার অসহ্য লাগে... খোদা কসম, তোমার এই সবসময় নিচু গলায় কথা বলা, নিজেকে মুছে দেওয়া, তোমার এই কুঁকড়ে থাকা আমাকে একদিন পাগল করে দেবে।

[বিভ্রান্ত হয়ে নিজেকে বিছানায় ছুঁড়ে দেয়।]

আমজাদ : কী মনে হয়, জানো? যেসব কথা বলি, তাও যেন ভাঙাচোরা।

[সঈদা কথা বলে না। আমজাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকে। আমজাদ তার কোল থেকে বই তুলে পৃষ্ঠা ওল্টায়। শান্ত, সবুজ এই ঘর। অনেকক্ষণ কোনও শব্দ নেই।

~ www.amarboi.com ~

আমজাদের মুখে ছড়ানো সবুজ আলো যেন কবরে শুয়ে থাকা মৃতের ওপর সবুজ কফন। বারে বারেই বই থেকে চোখ তুলে সে সঈদার দিকে তাকাচ্ছে, তারপর উত্তেজিত হয়ে বইয়ের পৃষ্ঠায় ফিরে আসছে। কিছু সময় চলে যায়। আমজাদ বড় অস্থির।]

আমজাদ : সঈদা!

সঈদা : বলো।

আমজাদ : একটা অনুরোধ।

সঈদা : কী?

আমজাদ : আজ... আজকের রাত তো আমাদের প্রথম রাত হতে পারে... [সঈদা কেঁপে ওঠে] যে রাত এখনও আসেনি... [সঈদা নিরুত্তর] সঈদা!

সঈদা : বলো।

আমজাদ : আমার অনুরোধ রাখবে?

সঈদা : [আমজাদের দিকে ঘুরে তাকায়, তার চোখে কামনার ঘোর] কী করে আমজাদ? কেমন করে?

আমজাদ : অভিনয় করতে পারবে না? তাহলেই আমি খুশি হব। মনে করো, আমি তোমার পাশে শুয়ে আছি...আমিও ভাবব, তুমি আমার পাশে শুয়ে আছো... তারপর... প্রথম রাতে যে-কথা বলার ছিল, আমি বলতে শুরু করব... তুমিও প্রথম রাতের মতোই জবাব দেবে... শুধু আমার জন্য... আমার জন্য এই খেলাটা খেলতে পারবে না, সঈদা?

সঈদা : [কামনার ঘোর কেটে গিয়ে তার চোখ জলে ভরা] তুমি যা বলবে, তাই করব আমজাদ।

আমজাদ : ধন্যবাদ।

[নীরবতা]

আমজাদ : আজ আমাদের প্রথম রাত, সঈদা... যে-রাতে যৌবন এই দুনিয়ায় লুকিয়ে থাকা স্বর্গের দিকে পা বাড়ায়... এই রাতের রহস্যের মধ্যেই দুই আত্মা মিলেমিশে এক হয়ে যায়... লজ্জা পেয়ো না... এই সেই রাত, যখন গোপন ইচ্ছেগুলো নিজেদের মেলে ধরতে পারে।

[সঈদা উঠে বসে।]

একটা মৃদু শব্দ, হাল্কা শ্বাস, সামান্য স্পর্শে যা-কিছু গোপন ছিল, তার পর্দা উঠে যায়... এত শান্ত ভাবে ব্যাপারটা ঘটে, একটা শব্দও শোনা যায় না, যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, আমরা পুরো দৃশ্যটা দেখতে পাই... এই সেই রাত, যখন দু জোড়া চোখ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে আর তারারা আকাশ থেকে নেমে দুটি মিলনোন্মুখ মানুষের কপালে এসে আশ্রয় নেয়...এই রাতেই তো আদমের শরীর ছিন্ন করে তার পাঁজর হবাকে

~ www.amarboi.com ~

দেওয়া হয়েছিল.. কবিরা চান, এমন রাত যেন ফুরিয়ে না যায়...জেগে ওঠে যৌবনের প্রার্থনা...এই রাতেই তো প্রকৃতি জটগুলো আলগা করে দেয়, যা আমরা ভদ্রতা দিয়ে ঢেকে রাখি...প্রকৃতির কারখানায় কাজ শুরু হয়ে যায়... সারা মহাবিশ্বের জীবনকে গড়ে তোলার কাজ... এই রাতেই, সঈদা, সব শব্দ নিজেদের গুটিয়ে নেয় যাতে সৃষ্টির শুরুর মুহূর্তের শব্দটি শোনা যায়... এ-রাতের সব পর্দা আলো দিয়ে তৈরি... এই রাতের পায়ের তলায় লুকিয়ে থাকে জীবনের আসন্ন সব রাত... শরীরের সব লোমকূপ কথা বলে ওঠে, সব গোপন কথা, সব না-গাওয়া গান শোনে [আর্তনাদ করে ওঠে] ঢাকো... ঢাকো... সঈদা, তোমার শরীর ঢাকো... এই শরীর সাপের মতো আমাকে কামড়াতে চায়... তোমার শরীর... প্রত্যেকটি রেখা যেন তলোয়ারের ধারালো ফলা... আমার কামনাকে খণ্ডবিখণ্ড করছে... ঢাকো সঈদা... খোদার জন্য, ঢাকো তোমার শরীর।

সঈদা : [নরম ঘাসে তৈরি মৃতদেহের মতো সে সবুজ আলোয় পড়ে থাকে, তার শরীর থরথর করে কাঁপছে।] হ্যাঁ... এই তো...

আমজাদ : [কাঁদতে থাকে] ঢাকো, নিজেকে ঢাকো, সঈদা। [সঈদা কম্বল জড়িয়ে নেয়। আমজাদ হাত দিয়ে দুচোখ ঢেকে ফোঁপাতে থাকে।]

পঞ্চম দৃশ্য

[সন্ধ্যা। নিগার ভিলার বাগান। ছায়াময়। দূরের পর্বতশ্রেণি অস্পষ্ট। ধূসর আকাশ, চারিদিকে নীরবতা। মজিদ ও সঈদার হাসি শোনা যায়। তারা হাসতে হাসতে ঢোকে, কিন্তু ক্লান্ত। সঈদা চেয়ারে বসে পড়ে, মজিদ তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।]

সঈদা : [উরুতে চাপড় মারতে মারতে] উফ্... বাপরে বাপ...

মজিদ : [হাসতে হাসতে] একেবারে থকে গেছো, দেখছি। পা টিপে দেব?

সঈদা : না...না... অসগরিকে পাঠিয়ে দাও...এখন দু'পাও হাঁটতে পারব না।

মজিদ : [হেসে] বেশ।

[এগিয়ে এসে সঈদার মুখে এসে পড়া চুল সরিয়ে দেয়।]

সঈদা : [ভীত স্বরে] আমি ভেতরে যাচ্ছি। [ওঠার চেষ্টা করে।]

মজিদ : ওই তো অসগরি নিজেই আসছে...এসো, অসগরি, ভাবিজানের একটু পা টিপে দাও।

[অসগরির প্রবেশ]

অসগরি : দুলহন বেগম, আপনাকে আজ খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

সঈদা : [উরুতে চাপড় মেরে] হ্যাঁ।

অসগরি : [মাটিতে বসে সঈদার পা টিপতে টিপতে মজিদের উদ্দেশ্যে বলে]

~ www.amarboi.com ~

এ-সব মজিদ মিয়ার দোষ।...সবকিছু ধীরেসুস্থে করতে হয়...তাই না, দুলহন বেগম? এখন আরাম লাগছে?

সঈদা : [উত্তেজিত দেখায় তাকে] ঠিক আছে, ঠিক আছে।

অসগরি : মজিদ মিয়া, হাত-মুখ ধুয়ে আসুন। আপনাকে মাটিমাখা আলুর মতো দেখাচ্ছে।

মজিদ : [কঠিন স্বরে] তুমি বড় আজেবাজে কথা বলতে শিখেছ। যত্ত সব...

অসগরি : দুলহন বেগমেরই দোষ, আমাকে বড় আসকারা দেন। [সঈদার দিকে তাকিয়ে] কী যে সুন্দর!

[মজিদ রেগে বেরিয়ে যায়।]

মজিদ মিয়া দেখতে ভালই, কিন্তু রেগে গেলে মুখটা কেমন বদলে যায়।...আপনার কী মনে হয়?

সঈদা : আমার কাছে এসব কথা বলো না। [উঠতে যায়, কিন্তু অসগরি তাকে চেপে ধরে থাকে] যেতে দাও।

অসগরি : [সঈদার পা টিপতে টিপতে] আপনার পা টিপতে যে কী ভাল লাগে। মজিদ মিয়া বললেন, আমি আজেবাজে কথা বলি... সত্যি দুলহন বেগম?

সঈদা : একদম ঠিক।

অসগরি : এ খুব খারাপ... নোকরানির আজেবাজে কথা বলা একেবারেই ঠিক না... আমার কানে শিসে ভরে দিন, দুলহন বেগম।

সঈদা : চুপ করো।

অসগরি : এ তো জুলুম...কাউকে চুপ করিয়ে দেওয়া ঠিক না...এমন কি বলেছি, যাতে আপনি বিরক্ত হয়ে গেলেন?

সঈদা : [রাগত স্বরে] তুমি যা বলো, আমি সহ্য করতে পারি না।

অসগরি : বেচারি অসগরি তবে কী করে...ভাবতাম, বছরখানেক ধরে আপনার মতো লেখাপড়া-জানা বেগমের কাজ ক'রে আমিও কিছু শিখেছি। দেখছি, তা ভুল। আপনার কাছ থেকে আমি কিছুই শিখিনি...কিন্তু কার দোষ? মাস্টারের, না ছাত্রের?

সঈদা : [অসগরির হাত থেকে পা টেনে নিয়ে] কী বলতে চাও তুমি?

অসগরি : [ছদ্ম-বিস্ময়ে] আমি?

সঈদা : হ্যাঁ তুমি...কী বলতে চাও তুমি?

অসগরি : [কিছুক্ষণ ভেবে] আমি তো অনেক কথাই বলতে চাই।

সঈদা : [ঘাসের ওপর খালি পায়ে হাঁটে] বলো...আজকেই বলো... রোজ তোমার হাল্কা হাল্কা কথার খোঁচা আমার ভালো লাগে না... যা বলতে চাও, বলো, আমি শুনতে চাই।

অসগরি : আপনার বুকের পাটা আছে বলতে হবে।

~ www.amarboi.com ~

সঈদা : আমার সাহস আছে কি নেই, তোমাকে ভাবতে হবে না... যা বলতে চাও, উগড়ে দাও।

অসগরি : আপনার-আমার দুজনেরই মনে ব্যথা লাগবে।

সঈদা : আমার কথা ভেবো না...আমি সইতে পারব।

অসগরি : [চিন্তা করে] ভেবেছিলাম, আমার দাঁতের ধার দেখে আপনি ভয় পাবেন, কিন্তু আপনি এমন জায়গায় পৌঁছেছেন, যেখানে আঘাত পাওয়ার কোনও ভয়ই থাকে না...দুলহন বেগম, আপনাকেই আমি ভয় পাচ্ছি।

সঈদা : [উত্তেজিত হয়ে হাঁটতে হাঁটতে] অসগরি।

অসগরি : বলুন।

সঈদা : অ্যাকসিডেন্টে আমজাদ মিয়া মারা গেলে আমি কী করতাম?

অসগরি : আপনি কী করতেন, আমি কী করে বলব?

সঈদা : আমি যুবতী, আমি সুন্দরী... সতের বছর ধরে স্বপ্নের মধুতে মাখিয়ে আমার বুকের ভেতরে হাজার হাজার ইচ্ছে লালন করেছি। সেই ইচ্ছেগুলোকে আমি গলা টিপে মারতে পারি না। আমি চেষ্টা করেছি, অসগরি... আল্লা জানেন, আমি খুব চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার কামনাগুলোকে মারবার জন্য নিজেকে তৈরি করতে পারিনি... তুমি আমাকে দুর্বল বলতে পারো, ভীতু, চরিত্রহীন বলতে পার... তুমি এবাড়ির নোকরানি... আমি তোমার কাছে স্বীকার করছি, আমার যৌবনের বাগান, তার ফুল লতাপাতাকে নষ্ট হতে দিতে পারি না... আমি অপাপবিদ্ধা, সেই রক্ত আমার শিরায় শিরায় বইছে... আমি তো আমার ভাললাগাগুলোর দরজায় কড়া লাগাতে পারি না, নিজেকে বুড়ো হওয়ার কুয়োয় ফেলে দিতে পারি না... ইচ্ছের ঝড়বৃষ্টিকে থামানোর ক্ষমতা আমার নেই। আমি একটা পাহাড়ের চুড়োর ওপর দাঁড়িয়ে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করছি, সেই ঝড় আমাকে উপড়ে ফেলে দিতে চাইছে।

অসগরি : আর বলো না দুলহন বেগম।

সঈদা : আমি এক চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছি, অসগরি। আমার পায়ের তলায় পৃথিবী ঘুরছে ; যেদিকেই ঘুরি, পথ আমার থেকে দূরে সরে যায়। হয়তো কোনও সিদ্ধান্ত নিলাম, তা আমার হাতের বাইরে চলে যায়। অন্ধের মতো আমি তার পেছনে দৌড়ই, যখন ধরতে পারি, বুঝতে পারি, তা বালি দিয়ে তৈরি। ছুঁলেই তা আমার পায়ের কাছে ঝরে পড়ে... অসগরি তুমি জানো না, জ্বলন্ত কয়লার বিছানায় আমি কতদিন অস্থির হয়ে শুয়ে আছি, তার ওপর জল ছিটোই, আর শুধু কালো ধোঁয়ার মেঘ জমে, আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তারপর মাটিতে আছড়ে ফেলে... আমার হাড়গুলো ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে... অসগরি, আমজাদের

~ www.amarboi.com ~

বদলে যদি আমি একটা ভাঙাচোরা মানুষ হয়ে যেতাম। [দীর্ঘ নীরবতা। সঈদা বিভ্রান্তের মতো হাঁটছে।] আমি কী করব?

অসগরি : [যেন ঘোর থেকে জেগে ওঠে] কী করবেন? আমজাদ মিয়া মরা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

সঈদা : আমাকে তুমি পাষাণ-হৃদয় বলো, কিন্তু অসগরি, আমি জানতে চাই, উনি কবে মরবেন?

অসগরি : আল্লার ইচ্ছে। [বিড়বিড় করে] কিন্তু আমজাদ মিয়ার সঙ্গে আল্লার আর বন্ধুত্ব নেই।

সঈদা : কী বললে?

অসগরি : কিছু না।

[অসগরি চলে যায়। সঈদা একা অস্থির ভাবে হাঁটতে থাকে।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[নিগার ভিলার বসবার ঘর। পুরনো আসবাবে সাজানো। দেয়ালে পরিবারের বিভিন্ন প্রয়াতজনের তৈলচিত্র। যৌবনের বেগমের ছবিও রয়েছে। সেই ছবির নীচে সোফায় বসে আছেন বেগম। অসগরির প্রবেশ।]

বেগম : মজিদ মিয়াকে পেলি?

অসগরি : হ্যাঁ।

বেগম : কোথায়?

অসগরি : বাগানে।

বেগম : কী করছিল?

অসগরি : করছিল মানে...একা একাই বসেছিলেন।

বেগম : ও কি আসছে?

অসগরি : হ্যাঁ।

বেগম : তুই যা।

[মজিদ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে অসগরির চলে যাওয়া দেখে]

মজিদ : বলো, আম্মিজান।

বেগম : কিছু না... বোসো।

মজিদ : [বেগমের পাশের চেয়ারে বসে] এখানে বড় ঠাণ্ডা।

বেগম : হ্যাঁ... বেশ ঠাণ্ডা।

মজিদ : কিছু বলবার জন্য ডেকেছ, মনে হচ্ছে।

বেগম : হ্যাঁ।

মজিদ : বলো।

বেগম : তোমাকে অন্য কোথাও পাঠাতে চাই।

মজিদ : আমাকে? [উঠে দাঁড়ায়] কোথায়?

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

বেগম : বোসো।

মজিদ : [বসে] তারপর—

বেগম : আমজাদের সঙ্গে এখনও কথা বলিনি।

মজিদ : [আবার উঠে দাঁড়ায়] কী নিয়ে?

বেগম : এখান থেকে তোমাকে পাঠানোর ব্যাপারে।

মজিদ : কিন্তু আমাকে অন্য কোথাও পাঠাতে চাইছো কেন...কোনও বিশেষ কাজে, না...

বেগম : বোসো।

মজিদ : [বসে] বিশেষ কোনও কাজ?

বেগম : না।

মজিদ : তাহলে আমাকে বাইরে পাঠানোর দরকার কী?

বেগম : আমার মনে হয়, সেটাই ভাল হবে।

মজিদ : ভাল? কার জন্য ভাল?

বেগম : সকলের জন্য... এই পরিবারের জন্য।

মজিদ : [উঠে দাঁড়ায়] তোমার এই ধাঁধা বুঝতে পারছি না।

বেগম : মজিদ, তুমি আমার সন্তান। আমি তোমার আম্মিজান... আমাদের মধ্যে এমন কিছু থাকতে পারে না যাতে এই পবিত্র সম্পর্ক নষ্ট হয়। আমি চাই তুমি করাচি চলে যাও, আমি যতদিন না বলব, তুমি আসবে না।

মজিদ : কিন্তু আম্মিজান—

বেগম : ওখানে তোমার অনেক বন্ধু আছে, তাদের সাহায্যে তুমি এই ঘূর্ণিঝড় কাটিয়ে উঠতে পারবে। জীবনের আরেক নাম ঘূর্ণিঝড়, জান তো?

মজিদ : [কিছু বলতে গিয়েও পারে না ; বসে পড়ে] ঠিক আছে... আমি যাব।

বেগম : তোমার সিদ্ধান্ত...

[এইসময় আমজাদ হুইলচেয়ারে বসে ঘরে ঢোকে। করিম হুইলচেয়ার ঠেলছে।]

আমজাদ : [মজিদকে] আরে ইয়ার, তুমি তো ভারি অদ্ভুত। ঘরে বসে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি, সঈদার জন্মদিনে কী উপহার দেওয়া যায়, তা নিয়ে কথা বলার জন্য, আর তুমি এখানে বসে আছো! [বেগমকে] আম্মিজান, তুমি কিছু ভেবেছ...কী উপহার দেওয়া যায়? আমি তো কিছু ভাবতেই পারছি না।

বেগম : সঈদাকে জিজ্ঞেস করছ না কেন?

আমজাদ : এটা কোনও কথা হল! [হাসে] আম্মিজান, ওকেই যদি জিগ্যেস করি, তবে তো পুরো মজাটাই হারিয়ে যাবে। [মজিদকে] তাই না, মজিদ?

[মজিদ নিরুত্তর।]

আমজাদ : আরে ইয়ার, কিছু বলো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মজিদ : [উঠে দাঁড়ায়] আম্মিজানকে জিগ্যেস করো। আমি চলে যাচ্ছি।

আমজাদ : কোথায় যাচ্ছো?

মজিদ : করাচি।

আমজাদ : পাগল কোথাকার... করাচিতে গিয়ে কী করবে তুমি?

মজিদ : কেন যাচ্ছি? [তার ঠোঁটে বাঁকা হাসি।] ঘূর্ণিঝড় থেকে আমার নৌকা বাঁচানোর জন্য।

আমজাদ : [বেগমকে] ওর কী ব্যাপার আম্মিজান? [মজিদকে] বোসো ইয়ার, একদিন পরেই ওর জন্মদিন... এখনই আমাদের সব ঠিক করে নিতে হবে।

মজিদ : সব ঠিক হয়ে গেছে।

আমজাদ : কী রকম?

মজিদ : আমি করাচি যাচ্ছি। আর কখনও ফিরব না বলেই যাচ্ছি।

আমজাদ : কী আজেবাজে কথা বলছ? [বেগমকে] আম্মিজান, কী হয়েছে, বলো তো?

বেগম : কিছু না...আমাদের দুজনের মধ্যে একটু কথা-কাটাকাটি।

আমজাদ : কী নিয়ে?

বেগম : জিগ্যেস করো না।

আমজাদ : মজিদ আমার ভাই, তোমার ও ওর মধ্যে যদি কোনও জটিলতা তৈরি হয়ে থাকে, তা দূর করা আমার দায়িত্ব... মজিদকে তোমার চেয়ে বেশি ভাল করে আমি জানি... অন্যকে আঘাত দেওয়ার মতো কিছুই ও করতে পারে না। [মজিদকে] কাছে বসো মজিদ।

মজিদ : আমাকে গোছগাছ করতে হবে।

আমজাদ : সব গোল্লায় যাক! এসব কী হচ্ছে! [বেগমকে] আম্মিজান, খোদার নাম করে বলছি, ওকে যেতে দিও না। যদি আমার জন্যও না হয়, সঈদার জন্য ওকে আটকাও... এ-বাড়িতে একমাত্র মজিদের জন্যই সঈদাকে হতাশা ছুঁতে পারেনি... শুধু আমার জন্য ও কত কিছু সহ্য করছে... আম্মিজান, তুমি ওকে যেতে দিলে আমার যে কী অবস্থা হবে, জানি না... ও সঈদাকে বেড়াতে নিয়ে যায়, আর ভাবি, মজিদ নয়, আসলে আমিই সঈদার সঙ্গে আছি। সঈদার সঙ্গে ও যখন কিছু খেলে, আমার এই ভাঙা জীবনটা পূর্ণ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে ভাবি, মজিদ না থাকলে আমার এই ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাওয়া জীবনটা নর্দমাতেও ঠাঁই পেত না। আম্মিজান, ওকে থামাও। ও আমার একটা হাত, আমার থেকে আলাদা করতে চাইছো কেন? আল্লা মিয়ার জায়গায় নিজেকে বসিও না। [কাঁদতে থাকে]

~ www.amarboi.com ~

মজিদ : আমি যাচ্ছি, আম্মিজান।

বেগম : দাঁড়াও। [মজিদ থেমে যায়।]
[বেগম ওঠেন, আমজাদের মাথায় হাত বোলাতে থাকেন।] কেঁদো না আমজাদ...মজিদ যাবে না... সব আগের মতোই থাকবে... খোদার তেমনটাই ইচ্ছে। [মজিদকে] মজিদ, ভাইয়ের সঙ্গে বসে সঈদার জন্মদিনের ব্যাপারে কথা বলে নাও। [বেরিয়ে যান।]

মজিদ : [একটু ভেবে আমজাদের হুইলচেয়ারের দিকে এগিয়ে যায়।] ভাইজান, আমাকে যেতে দাও।

আমজাদ : [মাথা তোলে] কোথায় যেতে দেব? পাগলের মতো কথা বলো না।

মজিদ : তুমি কেন বুঝতে পারছ না!

আমজাদ : আমি সব বুঝি... তোমার রুমাল বের করো, আমার চোখের জল মুছিয়ে দাও। [মজিদ কিছুক্ষণ নিশ্চল, তারপর রুমাল বার করে দ্রুত আমজাদের চোখের জল মুছে দেয়] কী করছ? চোখের জলও মুছতে জানো না? [হাসে] সামান্য একটা কাজ।

মজিদ : সামান্য কাজ নয়, ভাইজান।

আমজাদ : [হেসে] মানলাম, খুবই কঠিন কাজ... আমার পাশে এসে বোসো। সঈদাকে জন্মদিনে কী উপহার দেওয়া যায়, বলো। বোসো।

মজিদ : [আমজাদের পাশে একটা চেয়ার নিয়ে বসে] তুমি ভাবো।

আমজাদ : [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] ভাবছি... ভাবছি...
আর কাজ কী আছে...কিন্তু তুমিও ভাবো।
[দুজনেই চিন্তায় ডুবে যায়।]

সপ্তম দৃশ্য

[সন্ধ্যা। নিগার ভিলার বাগান। ঝরনাটি আর কাজ করছে না, যেন সে ক্লান্ত। অন্ধকারে দূরের পাহাড়শ্রেণি ঘুমিয়ে আছে। হুইলচেয়ারে আমজাদকে নিয়ে ঢোকে অসগরি।]

আমজাদ : না, অসগরি... একটু দাঁড়াও...

অসগরি : [থামে] কিন্তু আমজাদ মিয়া...

আমজাদ : আমি আজ জীবনের শেষ আঘাতটা পেতে চাই।

অসগরি : আঘাতটা যদি পেতে চান, তবে কল্পনার মধ্যেই তো পেতে পারেন... এর মধ্যেই তো আঘাত সয়েছেন...জখমটাকে আবার খুলতে চান কেন?

আমজাদ : [হাসতে চেষ্টা করে] আমার মতো অবস্থা যার, তার মতো বুদ্ধু কল্পনারও বাইরে... নিজের জখমটা সে খুলে খুলে দেখতে চায়...নিজেকে মহান শহিদ মনে করে... [হাসে] অসগরি, কখনও তোমার কিছু ভেঙে যায়নি, তাই জানো না, ভাঙাচোরা মানুষরা কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবস্থার মধ্যে দিয়ে যায়, দুর্দশার গর্তের ভেতর শুয়ে থেকে তারা কল্পনায় আকাশছোঁয়া বাড়ি তৈরি করতে চায়।

অসগরি : [মৃদু হেসে] আমি তো এই সীমারও বাইরে চলে গেছি, আমজাদ মিয়া। এইরকম উঁচু বাড়ি আমিও তৈরি করেছিলাম, তারপর নিজের হাতেই ভেঙে ফেলেছি। এখন আমার হৃদয় একটা শূন্য গর্ত ছাড়া আর কিছু না।

আমজাদ : [কাঁপতে কাঁপতে] তুমি ভয়ঙ্কর, অসগরি!

অসগরি : [হাসে] আমজাদ মিয়া, উজাড় হয়ে যাওয়া সবকিছুই বড় ভয়ঙ্কর...কিন্তু আমি কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারি, বলুন... নিয়তি তো আমাকে শেষ করে দিয়েছে। আমি নিজেই ভয় আর লজ্জা নিয়ে বেঁচে আছি, অন্যকে ভয় দেখানোর ক্ষমতা আমার কোথায়!

আমজাদ : তোমার জীবনে কি কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে?

অসগরি : না। আমি নিজেই একটা অ্যাক্সিডেন্ট, আমার আর অ্যাক্সিডেন্টের দরকার কী?

আমজাদ : তোমার কথায় পোড়া মাংসের গন্ধ।

অসগরি : গন্ধ পাওয়ার ক্ষমতাটা আপনার জেগে উঠেছে, তাই।

আমজাদ : আগে ঘুমিয়ে ছিল?

অসগরি : হ্যাঁ, গভীর ঘুমে তলিয়ে ছিল।

আমজাদ : কে জাগাল?

অসগরি : লাইনের বাইরে পড়ে যাওয়া ট্রেনটা।

আমজাদ : [বিড়বিড় করে] ট্রেন... লাইনের বাইরে পড়ে গেল... [চেঁচিয়ে] ট্রেনটা কি আবার লাইনের বাইরে পড়ে যাবে?

অসগরি : আল্লা মিয়া যা চাইবেন, তা-ই হবে।

আমজাদ : তাঁর নাম কোরো না... আল্লা মিয়ার সঙ্গে আমার দোস্তি শেষ হয়ে গেছে।

অসগরি : না, আমজাদ মিয়া, আমাদের মতো মানুষদের কখনও তাঁর সঙ্গে দোস্তি শেষ হয় না। ভাঙতে ভাঙতে আবার জুড়ে যায়।

আমজাদ : সব—সব বাজে কথা।

[পদশব্দ শোনা যায়। মজিদ ও সঈদা ঢোকে। ক্লান্ত সঈদা ঝরনার পাশে বসে]

সঈদা : আজ একেবারে থকে গেছি।

মজিদ : কিন্তু আমরা আজ বেশিদূর যাইনি।

সঈদা : ঠিক।

মজিদ : করাচি চলে গেলেই ভাল হত।

সঈদা : সত্যিই ভাল হত।

মজিদ : জীবনে কেমন ফেঁসে গেলাম... হ্যাঁ, করাচি যদি চলে যেতাম, তবু এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঘূর্ণিঝড় থেকে আমার নৌকা কি বাঁচাতে পারতাম? না...কিছুতেই পারতাম না।

সঈদা : জানি।

মজিদ : তুমি জানো... আমি জানি... শুধু আমার ভাই ছাড়া সবাই জানে। এই গল্পের ট্র্যাজেডি এখানেই।

সঈদা : অনেকবার ভেবেছি, ওকে সব বলে দেব [উঠে দাঁড়ায়] কিন্তু ভয় হয়, এই আঘাত ও সইতে পারবে না।

মজিদ : আমারও ভয় হয়... ডাক্তাররা বলেছেন, এক বছরের বেশি ভাইজান বাঁচবে না... যেটুকু ওর জীবনে আছে, তা কেড়ে নেওয়ার মতো নিষ্ঠুরতা আর কিছুই হতে পারে না।

[আমজাদ দাঁতে দাঁত চাপে, অসগরি ওর কাঁধ চেপে ধরে থাকে, যাতে কোনও শব্দ না হয়।]

সঈদা : যতদিন ও বেঁচে আছে, ওকে সুখী রাখার চেষ্টা চালিয়ে যেতেই হবে। ওর আবেগে এতটুকু আঘাত করা যাবে না।

মজিদ : আর এর মধ্যে, আমাদের বুদ্‌বুদ্‌টা যদি ফেটে যায়?

সঈদা : [আর্তনাদ করে] এর মতো ভয়ঙ্কর আর কিছু হবে না।

মজিদ : তাই ভাবছি, আমার চলে যাওয়া উচিত... যতদিন ভাইজান...

সঈদা : এভাবে বলো না মজিদ... এত নিষ্ঠুর হয়ো না।

[হুইলচেয়ারে আমজাদ কাঁপছে। অসগরি তার অন্য কাঁধে হাত রাখে।]

মজিদ : সঈদা, ভালবাসা বড় নিষ্ঠুর আর স্বার্থপর... অন্যের মৃত্যুতে আনন্দিত হতেও লজ্জা পায় না।

সঈদা : এমন কথা আমাদের ভাবা উচিত না।

মজিদ : ঠিক। কিন্তু মনে এলে, কী করব?

[সঈদা বাড়ির দিকে এগোয়, মজিদ ধীরে তাকে অনুসরণ করে। মাথা নিচু করে আমজাদ হুইলচেয়ারে বসে। অসগরি স্ট্যাচুর মতো তার পিছনে দাঁড়িয়ে।]

অসগরি : যাবেন?

আমজাদ : [মাথা নিচু] না... এখনই না... আমি ভাবছি।

অসগরি : কী?

আমজাদ : জানি না...হয়তো কী ভাবা উচিত, তা-ই ভাবছি।

অসগরি : এইসব ভাবাভাবি অর্থহীন, আমজাদ মিয়া।

আমজাদ : [মাথা তুলে] অর্থহীন। ঠিক। কিন্তু আমি তাহলে কী করব? [নীরবতা] ওরা তোমার মতো নিষ্ঠুর নয়... তুমি আমাকে ভাবতে দিতেও চাও না... অসগরি, তুমি যে কী নিষ্ঠুর, জানো না!

অসগরি : [মৃদু হেসে] ভালবাসা নিষ্ঠুর আর স্বার্থপর আমজাদ মিয়া... কারুর মৃত্যুতেও সে আনন্দ পায়।

~ www.amarboi.com ~

আমজাদ : আমার সামনে এসো।

[অসগরি তার সামনে আসে, আমজাদ তার চোখের দিকে তাকায়, ভাবে, কিছু বিড়বিড় করে]

আমজাদ : এই বইটা এতদিন কোথায় পড়ে ছিল?

অসগরি : জঞ্জালের টুকরিতে... ওখানেই তো তার জায়গা।

আমজাদ : চলো, আমাকে ভেতরে নিয়ে চলো।

[হুইলচেয়ার টেনে অসগরি বাড়ির দিকে এগোয়।]

অষ্টম দৃশ্য

[রাত্রি। প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যের একই ঘর। সবুজ আলো। সবকিছু কেমন বদলে গেছে, মনে হয় কোনও মনোরোগীদের ওয়ার্ড ; বিছানা শূন্য, যেন সেখানে কেউ কখনও শোয়নি। আমজাদের হুইলচেয়ার ঠেলতে ঠেলতে অসগরি ঢোকে।]

অসগরি : দুলহন বেগম কেন বেগম সাহেবের ঘরে গেলেন?

আমজাদ : ও ভয় পেয়েছে।

অসগরি : আপনাকে?

আমজাদ : [হেসে] আমাকে কে ভয় পাবে? নিজেকে নিয়েই ভয়।

অসগরি : দুলহন বেগম অত দুর্বল নন।

আমজাদ : সময় পাহাড়কেও ধসিয়ে দেয়... ও তো সামান্য যুবতী।

অসগরি : [থেমে] আপনি ঘুমোতে চান?

আমজাদ : ঘুম? [হাসে] মজা করো না অসগরি... আমার ক্ষত নিয়ে হাসাহাসি করো না।

অসগরি : [ইতস্তত স্বরে] আপনি সঈদাকে ভালবাসেন?

আমজাদ : না।

অসগরি : তাহলে এই ক্ষত কিসের জন্য?

আমজাদ : ভাবতে দাও... তুমি কি আমাকে ভাবতে দেবে?

অসগরি : ভাবুন।

[আমজাদ দীর্ঘ সময় ভাবনায় ডুবে যায়।]

আমজাদ : আমি সঈদাকে ভালবাসি না... বাজার থেকে লোকে যেমন ভাল মাল কেনে, সেভাবে অনেক মেয়েদের মধ্যে থেকে আমি ওকে বেছে নিয়েছিলাম... নিজের পছন্দের জন্য আমি গর্বিত, এখনও, সঈদার সৌন্দর্য তো ভাষায় বর্ণনা করা যায় না... আমি ওকে নিজের জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম, আর আমার জীবনটা এখন চেয়ারে আটকে আছে, কারুর সাহায্য ছাড়া নড়তেও পারি না... ডাক্তাররা বলেছেন, বড় জোর এক বছর বাঁচব আমি... আমি বুঝতে পারি না, কেন ওকে শেকলে বেঁধে রাখতে চাইছি... শেকলটার প্রতিটি অংশ তো আমার জীবনের

~ www.amarboi.com ~

মতোই অনিশ্চিত... জানি না, আমি কী করব। [ভাবে] ওর যৌবন আর সৌন্দর্যের জন্যই হয়তো ওকে ধরে রাখতে চাই ; এটাই একমাত্র কারণ, আর কিছু নয়। ওর দিকে তাকিয়ে থাকা, কী করে আমি ভুলবো... ওর শুয়ে থাকার কী গভীর সৌন্দর্য, কোনও অলঙ্কার টেক্কা দিতে পারবে না... ওই ছবি আমাকে ওর সঙ্গে লেপ্টে রাখে...

অসগরি : [বিভ্রান্ত] ঠিকই তো।

আমজাদ : আমার চেতনা থেকে ওই ছবি কীভাবে সরিয়ে দেওয়া যাবে, অসগরি?

অসগরি : সব মুশকিলের চাবি তো মুশকিলের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে।

আমজাদ : সেই চাবি খুঁজতে হবে... কিন্তু... কিন্তু আমার লজ্জা হয় কেন?

অসগরি : জানি না...ঝামেলাটা তো আপনার মধ্যেই, তাকে সরাতে হলে নিজের হাতেই সরাতে হবে, আর কেউ তা পারবে না।

আমজাদ : জানি... আমার বিদ্রোহী হৃদয় যে মিথ্যে আবেগে কেঁপে কেঁপে ওঠে, তা আমি জানি... কিন্তু আজকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

অসগরি : কী সিদ্ধান্ত?

আমজাদ : আমার সামনে এসো [অসগরি সামনে এসে দাঁড়ায়।] যাও, ওই বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো।

অসগরি : আমজাদ মিয়া, আমি সুন্দর নই, আমার যৌবন নেই,...আমার যৌবন তো একটা ছেঁড়া মাদুর ছাড়া আর কিছু নয়।

আমজাদ : বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো।

অসগরি : [জল ভরে ওঠে চোখ] না, আমজাদ মিয়া, এভাবে বিছানাকে অপমান করা যায় না...দুলহন বেগমের নরম শরীরই ওই বিছানায় শুতে পারে।

আমজাদ : আমি তোমাকে শুতে বলছি। এটা আমার নির্দেশ।

অসগরি : [মাথা নিচু করে] মালিক যা বলবেন। [বিছানায় গিয়ে শোয়, তার চোখ সিলিংয়ে নিবদ্ধ।]

আমজাদ : জানো, আজ কীরকম রাত... এই রাতে ভাঙাচোরা, পঙ্গু যৌবন হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ। কয়ামতের রাত, মিলনের রাত। রাত্রির অন্ধকারে মিশে গিয়ে আজ আত্মা অমরত্ব পাবে। এর পরে আর কোনও রাত নেই।

[অসগরি বিছানায় উঠে বসে।]

এই রাতে ভাঙা স্বপ্নের ভ্রূণ থেকে বিরাট কিছু জন্মাবে, এত বড়, যা আকাশকে ছুঁতে পার। এই সেই রাত, পবিত্র ঝরনা জমজমের জল পৃথিবীর গভীরে ঢুকে যাবে, আর সেখানে জল, ধুলো তো উড়বেই, পবিত্র আত্মারা তো ধুলো দিয়েই পূজা সারবেন। এই রাত কেমন জানো? নিয়তির খাতা যিনি লেখেন, তাঁর দোয়াত উল্টে যাবে, আর আকাশে এক কোণে লুকিয়ে তিনি লুকিয়ে কাঁদবেন। এই রাতে, আমজাদ পৃথিবীর সব সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে তিন তালাক বলবে আর একজন কুরূপাকে

~ www.amarboi.com ~

নিকে করবে... [চিৎকার করে ওঠে] অসগরি... অসগরি... [অসগরি ইতিমধ্যে বিছানা থেকে নেমে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে তাকিয়ে আছে।]

আমজাদ : [চিৎকার করে] কী করছো, অসগরি?

অসগারি : [আমজাদের দিকে ফিরে তাকায়] শাদির শপথ নেবেন না?

আমজাদ : [দুহাতে চোখ ঢেকে] অসগরি! [চোখ থেকে হাত সরিয়ে জানলার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকায়] শপথ... [বিড়বিড় করে] হ্যাঁ শপথ তো নিতেই হবে... দুজনকেই... [নিজেই হুইলচেয়ার ঠেলে জানলার দিকে এগোয়] জানতাম না, সব ঝামেলা এভাবে মিটে যাবে... চাইছিলাম, কেউ আমার হাত ধরুক। [জানলার ধার দুহাতে ধরে উঠে দাঁড়ায়] ওই পর্বতশ্রেণি, কী অপূর্ব, আর কী ভাল তুমি অসগরি।

ভাষান্তর : রবিশংকর বল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঝলসানো সূর্যের তাপে

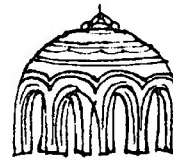

বম্বে ছেড়ে, করাচি হয়ে আমি লাহোরে পৌঁছেছিলাম ১৯৪৮-এর ৭ বা ৮ জানুয়ারি। প্রায় তিন মাস ধরে আমার মন অশান্ত ছিল। বুঝতে পারতাম না কোথায় আছি—বম্বেতে, না করাচিতে আমার বন্ধু হাসান আব্বাসের বাড়িতে, নাকি লাহোরে, যেখানে কয়েদ-ই-আজমের তহবিলের জন্য দান আদায় করতে রেস্তোরাঁগুলিতে নিয়মিত নাচ-গানের আসর বসে।

তিন মাস আমি কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। মনে হত, পরদার ওপর একই সময়ে অনেকগুলো ফিল্মের রিল চলছে—সব জট পাকানো, অপরিষ্কার। কখনও পর্দায় ফুটে উঠত বম্বের বাজার, রাস্তাঘাট, কখনও করাচির রাস্তায় ধীরে চলা ছোট ট্রাম ও গাধায়-টানা গাড়ি, আবার কখনও লাহোরের হইচই-এ ভরা রেস্তোরাঁ। কোথায় আমি? সারা দিন চেয়ারে বসে থাকতাম ভাবনায় তলিয়ে গিয়ে।

এমনটাই চলছিল। একদিন চমক ভাঙল, যখন দেখলাম বম্বে থেকে যেটুকু টাকা পয়সা নিয়ে এসেছিলাম সব ফুরিয়ে গেছে—কিছু খরচ হয়েছে বাড়িতে আর বাকিটা ক্লিফটন বার-এ। এবার নিশ্চিত হলাম, আমি লাহারেই, যেখানে একদা আদালতে হাজিরা দেওয়ার জন্য মাঝেমাঝে আসতাম, কারনাল শপ থেকে সুন্দর সুন্দর চটি কিনে ফিরে যেতাম।

ভাবতে শুরু করলাম, কী কাজ করব। দেশভাগের পর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে চূড়ান্ত অব্যবস্থা। যে-দুএকটা ফিল্ম কোম্পানি ছিল, অফিসের বাইরে ঝোলানো বোর্ড ছাড়া তাদের আর দেখানোর কিছুই ছিল না। খুব মুসড়ে পড়েছিলাম। তারপর দেখলাম 'অ্যালটমেন্টে' দ্রুত টাকা কামিয়ে নেবার সুযোগ রয়েছে। উদ্বাস্তু আর যারা উদ্বাস্তু নয়, সকলেই তাদের নামে অ্যালট করা দোকান, ফ্যাক্টরি পাওয়ার জন্য সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাকেও কেউ কেউ বলেছিল, এর মধ্যে ভিড়ে যেতে, কিন্তু ওই লুঠতরাজে আমি শামিল হতে চাইনি।

একদিন জানতে পারলাম, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ও চিরাগ হুসেন হসরত একটা নতুন

~ www.amarboi.com ~

র‍্যাডিক্যাল খবরের কাগজ বার করার পরিকল্পনা করেছেন। দুই মহৎপ্রাণ মানুষের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কাগজটার নাম 'ইমরোজ', যা আজ সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। প্রথম যখন দেখা করতে গেলাম, তখন কাগজটার ডামি তৈরি হচ্ছে। দ্বিতীয় সাক্ষাতের সময় চারটে সংখ্যা বেরিয়ে গেছে। কাগজটা দেখে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। ভেতরে লেখবার ইচ্ছে জেগে উঠল, কিন্তু লিখতে বসে দেখি, আমার মাথার ভেতরে কিচ্ছু নেই। যতই চেষ্টা করি, কিছুতেই ভারতকে পাকিস্তান থেকে বা পাকিস্তানকে ভারত থেকে আলাদা করতে পারি না। বারে বারে নাছোড় সব প্রশ্ন আমার মাথার ভিতরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

পাকিস্তানের সাহিত্য কি অন্যরকম হবে? যদি হয়, তবে তা কেমন হবে? অবিভক্ত ভারতে যা লেখা হয়েছে তার যথার্থ উত্তরাধিকারী কারা? সেইসব লেখাও কি ভাগ করা হবে? ভারত আর পাকিস্তানের মৌলিক সমস্যা কি এক নয়? 'ওখানে' কি উর্দু সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে? আর পাকিস্তানেই বা উর্দু কী চেহারা নেবে? আমাদের দেশ কি ইসলামি রাষ্ট্র হবে? আমরা রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও কি সরকারের সমালোচনা করতে পারব? ফিরিঙ্গি প্রশাসকরা চলে যাওয়ার পর আমাদের নিজেদের লোকের অধীনে কি আমাদের অবস্থা ভাল হবে?

সব দিকে আমি অসন্তোষ আর অতৃপ্তি দেখতে পাচ্ছিলাম। কিছু লোক খুব সুখী, কেননা তারা রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেছে, কিন্তু একই সঙ্গে নিজেদের সুখ নিয়ে তারা অসন্তুষ্ট আর সবসময় ভয়ে ভয়ে আছে, একদিন এসব হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। কিছু লোক অসুখী, কেননা সীমান্ত পেরিয়ে আসার সময় তারা সব হারিয়েছে। কয়েকটা উদ্বাস্তু শিবিরে গিয়ে আমি অতৃপ্তির ছবিটা দেখেছি। কেউ বলেছে, অবস্থা এখন অনেক ভাল ; কয়েক বছর আগেও এইসব শিবিরের অবস্থা ছিল করুণ। অবাক হয়ে ভেবেছি, এখন যদি ভাল হয়, তবে খারাপের সময় কী অবস্থা ছিল?

চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা চলছিল। একজনের মুখের হাসি অন্যের ক্ষেত্রে দীর্ঘশ্বাসের জন্ম দেবে। একজনের জীবন মানে অন্যের মৃত্যু। দুই স্রোত পাশাপাশি বইছিল : একটি জীবনের, অন্যটি মৃত্যুর। এর মাঝখানে সেই সুখ, যার ওপর সবসময় ক্ষুধা-তৃষ্ণা-মাতলামির খাঁড়া ঝুলছে। মৃত্যুর ছায়ায় সব ঢাকা। গ্রীষ্মের শুরুতে আকাশে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরপাক খাওয়া ঘুড়িদের আওয়াজে যেমন বিষণ্ণতা থাকে, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'কয়েদ-ই-আজম জিন্দাবাদ' স্লোগানেও সেই বিষণ্ণতা। প্রয়াত কবি ইকবালের এক বিখ্যাত কবিতার ভার দিন-রাত বইতে বইতে রেডিওর তরঙ্গকেও ক্লান্ত মনে হত। রেডিওতে বেশির ভাগ যেসব ফিচার অনুষ্ঠান হত, তা এইরকম : কীভাবে পোল্ট্রি বানানো যাবে? জুতো কীভাবে তৈরি করতে হয়? বাগান বানানো বিষয়টা কী? বা কত লোক উদ্বাস্তু শিবিরে এসেছে? কত লোক শিবির ছেড়ে চলে গেছে?

প্রায় সব গাছ একেবারে নগ্ন। সবচেয়ে গরিব উদ্বাস্তুরা ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য গাছের গায়ের ছাল ছাড়িয়ে আগুন জ্বালাত। পেটের আগুনের নেভানোর জন্য গাছের শাখাপ্রশাখা কেটে ফেলেছিল। এই নগ্ন গাছগুলির জন্য শহরটাকে অসহ্য রকম, হৃদয়-বিদারক ভাবে

~ www.amarboi.com ~

নির্জন দেখাত। বাড়িগুলো যেন শোকে ডুবে আছে। তাদের বাসিন্দারা শোকসন্তপ্ত। তারা হয়ত হাসত, খেলত বা কোনও কাজ পেলে করত, কিন্তু মনে হত, সবকিছুই যেন শূন্যের মধ্যে ঘটছে।

বন্ধু অহমদ নাদিম কাসিমি, শাহির লুদিয়ানভি ও আরও অনেকের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আমার মতো ওরাও মানসিক পক্ষাঘাতের শিকার। মনে হত, একটা ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প, যা আমাদের ধ্বংস করে দিয়ে গেছে, তার কম্পন এখনও কোথাও লুকিয়ে আছে, হয়তো কোনও আগ্নেয়গিরির ভিতরে। সেই কম্পন আবার জেগে উঠলে দুনিয়াটা হয়তো আবার ঠিকঠাক হয়ে যাবে, আগের মতো মেজাজ ফিরে আসবে, যে-অবস্থার মধ্যে ছিলাম, তাকে যথাযথ বুঝতে পারব।

এইসব ভাবনায় আমি কাতর হয়ে পড়তাম, গ্রাস করত নিরাশা। তাই আমি এলোমেলো ঘুরতে শুরু করেছিলাম। ভবঘুরের মতো সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম। নিজে চুপ করে থাকতাম, অন্যদের কথা শুনতাম। সবরকম কথা শুনতাম—একেবারে ফালতু কথা, যুক্তিহীন তর্ক, আধ-সেদ্ধ রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর। এই উদ্দেশ্যহীন ঘোরাঘুরির ভাল ফল হল এটাই যে আমার মগজে জমে থাকা ধুলো আর ধোঁয়া আস্তে আস্তে থিতিয়ে গেল ; হাল্কা, ছোট ছোট রচনা লেখার জন্য মনস্থির করে ফেললাম, 'ইমরোজ'-এর জন্য 'নানারকম নাক', 'দেওয়াল লিখন' এইসব রচনা লিখলাম। লোকের পছন্দও হল। আস্তে আস্তে, কৌতুক চেহারা নিল বিদ্রূপে। বদলটা আমি কখনও বুঝতে পারিনি। আমি লিখেই যাচ্ছিলাম, আর আমার কলম থেকে বেরিয়ে আসছিল 'প্রশ্ন ওঠে', 'গত সকালে যখন জেগে উঠেছিলাম'-এর মতো তীক্ষ্ণ, খিটখিটে সব লেখা। যখন দেখলাম, আমার কলম কুয়াশা কেটে নিজের পথে এগিয়ে চলেছে, তখন খুব ভাল লেগেছিল। নিজেকে হালকা মনে হয়েছিল। আমি পাগলের মতো লিখতে শুরু করলাম। এইসব রচনার সংকলন পরে 'তেতো নোনতা আর মিষ্টি' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

[১৯৫০-এ প্রকাশিত 'ঠান্ডা গোস্ত'-এর ভূমিকা হিসেবে ছাপা দীর্ঘ রচনার নির্বাচিত অংশ।]

ভাষান্তর : রবিশংকর বল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মন্টো কে

মন্টো সম্পর্কে অনেক কিছু বলা ও লেখা হয়েছে—তার বিরুদ্ধেই বেশি, যত না তার পক্ষে। এইসব পরস্পরাবিরোধী রিপোর্টের ভিত্তিতে যে কোনও বুদ্ধিমান লোকই কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে না। যখন আমি এই লেখাটা লিখছি, তখন আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি মন্টো সম্পর্কে সত্যিকারের কোনও মতামত দেওয়া কতটা দুরূহ কাজ। যদিও আমার ক্ষেত্রে ততটা নয়, কেননা আমি সেই ভাগ্যবানদের একজন যে মন্টোর খুব কাছের লোক। আসল কথাটাই তবে কবুল করে দিই এখানে—আমি ওর যমজ।

মন্টো সম্পর্কে এখনও অবধি যা লেখা বা বলা হয়েছে আমি তার বিরোধিতা করি না। কেবল একটা ব্যাপার এই যে সেসব প্রকৃত সত্যের থেকে অনেক অনেক দূরে। কেউ কেউ তাকে, দুশমন বলে। কেউ বলে টাকমাথা দেবদূত। দাঁড়াও, দাঁড়াও একবার দেখে নিই মন্টো আবার এইসব কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনছে নাকি। না, না, ঠিক আছে আমারই ভুল। তার তো এখন মদ গেলার সময়। প্রতিদিন নিয়ম করে সন্ধে ছ'টায় সে ওই তেতো শরবত নিয়ে বসে।

আমরা দুজন জন্মেছিলাম এক সময়। আর যদ্দুর আমার ধারণা মরবও একসঙ্গে। অবশ্য এমনটাও তো হতে পারে যে সদত হসন হয়তো মরে গেল, কিন্তু মন্টো মরল না। এই ভাবনা আমার মন মাঝে মাঝে তোলপাড় করে তোলে। সেই কারণেই আমি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা করি। যদি সে বেঁচে থাকে আর আমি মারা যাই, তবে ঘটনাটা কেমন ঘটবে জানো, খুব মজার। যেন ডিমের খোলাটা পড়ে আছে আস্ত, শুধু ভেতর থেকে হলুদ আর শাদা অংশটা বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে।

খুব বেশি পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটতে চাই না আমি, শুধু এটুকু বলব যে মন্টো হল এক নম্বরের চালাক, শয়তান, ধুরন্ধর লোক যার তুলনা আমি আর জীবনে পাইনি। একের সঙ্গে দুই যোগ করলে তিন হয়। আর ত্রিকোণ সম্পর্কে মন্টোর জ্ঞান ছিল বিস্তর, তবে সে সবের ভেতর আর বেশি ঢুকে লাভ নেই, ইশারাই কাফি।

মন্টোকে আমি জন্ম থেকেই চিনি। ১৯১২ সালের ১১ মে আমাদের জন্ম। কিন্তু মন্টো

~ www.amarboi.com ~

সবসময়ই অন্যরকম কিছু একটা করতে চেয়েছে। সে যদি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায় তবে কারো সাধ্যি নেই তাকে খুঁজে বার করে। কিন্তু আমি পারি। আমি তো তার একটা অংশ, আমি তার সমস্ত গতিবিধি নজরে রাখি।

এবার বলি শোনো কেমন করে সে এত বড় গল্প লেখক হল। লেখকরা সাধারণত তাদের জীবনের কোনও আকস্মিক ঘটনা বা তাদের চারিত্রিক লক্ষণগুলিই আসলে লিখে রাখতে চায়। তারা কথায় কথায় শোপেনহাওয়ার, ফ্রয়েড, হেগেল, নীৎসে বা মার্কস আওড়ায় যা আসলে বাস্তবতা থেকে বহু যোজন দূর। মন্টোর ক্ষমতা আদতে দুটো পরস্পরবিরোধী শক্তির মধ্যেকার দ্বন্দ্বের নীট ফল। মন্টোর বাবা ছিলেন অত্যন্ত রুক্ষ মানুষ, অপরদিকে মা ছিলেন কোমলপ্রাণা। অতএব বুঝতেই পারছো, বেচারা মন্টো এই দুই বিপরীত স্বভাবের অশান্ত তোলপাড়ের মধ্যে কেমন খানখান হয়ে বেঁচে ছিল।

এবার আমি মন্টোর স্কুল জীবনের কথা একটু সংক্ষেপে বলি। সে ছিল বুদ্ধিমান, কিন্তু ভয়ঙ্কর দুরন্ত। লম্বায় ছিল এই ধরো তিন ফুট ছ'ইঞ্চি মতো। সে ছিল বাবামায়ের কনিষ্ঠতম সন্তান। বাপমায়ের ভালবাসা পেলেও তার তিন দাদার সঙ্গে খুব ইচ্ছে সত্ত্বেও ছোটবেলা দেখা হয়নি মন্টোর, কেননা তারা বিদেশে পড়াশুনো করত। অনেকদিন পরে যখন দেখা হয় তখন সে বেশ নামজাদা লেখক। এরা তিনজন অবশ্য ছিল মন্টোর সৎ ভাই।

এবার মন্টোর গল্পের কথা একটু বলা যাক। শুনতে খারাপ লাগলেও প্রথমেই বলে রাখি যে মন্টো ছিল এক নম্বরের প্রতারক। তার প্রথম গল্প 'তামাশা' জালিয়ানওয়ালাবাগ তাণ্ডব নিয়ে লেখা। যা সে অন্য নামে ছাপিয়েছিল, পুলিশি ধর-পাকড় এড়াবার জন্যে।

এরপর হঠাৎই তার মাথায় এই ভুত চাপল যে সে আরও পড়াশোনা করবে। এর আগে অবশ্য ইন্টার পরীক্ষায় দুবার ফেল করেছে, তিনবারের বার পাশ করেছে তাও থার্ড ডিভিশনে। আর সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার হল সে ফেল করেছিল উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে। এখন আমি, সত্যি বলতে কি, হাসি চাপতে পারি না যখন চারদিকে বলাবলি হয় যে মন্টো নাকি উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক। কেননা আমি এ ব্যাপারে একদম স্থির নিশ্চিত যে এখনও উর্দু ভাষাটা তার ভাল করে রপ্ত হয়নি। শিকারি যেমন জাল হাতে প্রজাপতি ধরতে ছোটে, সে তেমন ভাষার পেছনে তাড়া করে বেড়ায়। আর ভাষা তাকে ফাঁকি দিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যায়। তাই তার লেখায় কোনও সুললিত শব্দঝঙ্কার নেই। বরঞ্চ তার লেখার ছত্রে ছত্রে হাতুড়ির আঘাত রয়েছে, যত আক্রমণ জীবনের কাছ থেকে সে পেয়েছে সব সে গ্রহণ করে নিয়েছে মাথা পেতে।

তার হাতুড়ির ঘা হিংস্র হলেও এলোপাতাড়ি নয়। বরং তার নিশানা অব্যর্থ। সে একজন পাকা তিরন্দাজ। সে এমন একটা লোক যে কখনও সিধে পথে হাঁটে না। হাঁটে বিপজ্জনক দড়ির ওপর দিয়ে। প্রতি মুহূর্তে সবাই ভাবে এই বুঝি পড়ে গেল, কিন্তু সে পড়ে না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় সে একদিন এমন মুখ থুবড়ে পড়ে যাক যেন আর কখনও উঠতে না পারে।

আমি আগেই বলেছি যে মন্টো একজন পুরোমাত্রায় প্রতারক ও ফেরেব্বাজ লোক। সে রটিয়ে বেড়ায় যে সে গল্প নিয়ে ভাবে না, গল্পেরা তাকে নিয়ে ভাবে। একদম ফালতু কথা।

~ www.amarboi.com ~

সে যখন একটা গল্প লিখতে বসে তখন যে কারো দেখে মনে হবে যে একটা মুরগি যেন ডিম পাড়তে বসল। এবং গোপনে নয়, একেবারে ফটফটে দিবালোকে। তার বন্ধুরা তার পাশে ঘোরাঘুরি করে, তার তিন মেয়ে হই হুল্লোড় করে দৌড়োদৌড়ি লাগিয়ে দেয়, যখন সে একটা বিশেষ চেয়ারে বসে ডিম প্রসব করে, যা নিমেষের মধ্যে ছোটোগল্প হয়ে কিচিরমিচির শুরু করে দেয়। মন্টোর বউ বেশির ভাগ সময়ই তিরিক্ষি মেজাজে থাকে। সে মাঝেমধ্যেই পরামর্শ দেয় এইসব গল্পটল্পের বাতিক ছেড়ে একটা দোকান খুলতে। কিন্তু মুশকিল হল মন্টোর মাথা চুড়ি আর গয়নার দোকানের চেয়েও অনেক বেশি মালপত্রে ঠাসা থাকে সবসময়। আর তাই সে সর্বদাই এই ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে যে কোনওদিন না সে কল্পনার হিমঘর হয়ে যায়।

এই নিবন্ধ যখন লিখছি, ভয় হচ্ছে, মন্টো না ক্ষেপে যায় আমার ওপর। মন্টোর সবকিছু আমি নিতে পারি, কিন্তু ওর রাগের মুখোমুখি দাঁড়ানো খুব কঠিন। রেগে গেলে ও দানবীয় আচরণ করতে থাকে। যদিও কয়েক মিনিটের ব্যাপার সেটা, কিন্তু রক্ষা করো, ওই কয়েক মিনিটই যা ভয়ঙ্কর।

গল্প লেখা সম্বন্ধে প্রচুর গুজব ছড়ায় মন্টো, কিন্তু আমি ওর যমজ ভাই হয়ে জানি ও একটা ডাহা মিথ্যেবাদী। ও একবার কোথাও একটা লিখেছিল যে গল্প নাকি ও পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু সত্যিটা একেবারে উল্টো।

যখন তার গল্প লেখার দরকার পড়ে তখন সে সারারাত তাই নিয়ে ভাবে। প্রথমে কিছুই তার মাথায় খেলে না। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে পড়ে খবরকাগজ তন্ন তন্ন করে ঘেঁটে দেখে কোনও গল্পের রসদ পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু কোনও ফল হয় না। তারপর বাথরুমে যায়। বসে বসে চিন্তা করে, কিন্তু ফল সেই শূন্য। তারপর হতাশার থেকে বউয়ের সঙ্গে বিনা কারণে ঝগড়া বাধায়। তাতেও কাজ না হলে রাস্তায় বেরিয়ে একটা পান কেনে। পানটা টেবিলে রেখে দেয় যতক্ষণ না গল্পের কোনও প্লট তার মাথায় হঠাৎ খেলে যায়। তারপর আকস্মিকভাবে সে পেন বা পেনসিল হাতের কাছে যা পায় তুলে নিয়ে লিখতে শুরু করে। 'বাবু গোপীনাথ' 'টোবা টেক সিং' 'হাটক' 'মাম্মি' 'মোজেল'—গল্পগুলো এইরকম ফেরেব্বাজির মধ্যে দিয়েই লেখা।

সবাই বলে যে মন্টো নাস্তিক, ধর্মকর্মের ধার ধারে না। এমনকি আমিও কিছুটা তা ভাবি। আর তাই সে খুব সহজেই নোংরা সব শব্দ ব্যবহার করে অপরিচ্ছন্ন বিষয়ে লিখে ফেলতে পারে। কিন্তু আমি জানি যে যখনই সে লিখতে বসে প্রথমেই সে যা লেখে তা হল ৭৮৬ সংখ্যাগুলি, যার অর্থ হল 'বিসমিল্লা'। আর যে লোকটা এমনিতে প্রকাশ্যে নাস্তিক, কাগজে কলমে কিন্তু সে হঠাৎ ধার্মিক বনে যায়। আর কাগজের মন্টোকে তুমি যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারো, কিন্তু আসল মন্টোকে তুমি হাতুড়ি পিটিয়ে মারতে পারবে না।

এবার খুব অল্প কথায় মন্টোর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলি। সে একজন মিথ্যুক, চোর, বিশ্বাসঘাতক আর অযথা চেঁচামেচি করে লোক যোগাড় করতে ওস্তাদ।

বহুবার সে তার বউয়ের অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে বেশ কয়েকশো টাকা চুরি

~ www.amarboi.com ~

করেছে। ধরো সে গটগট করে এসে তার বউয়ের হাতে ৮০০ টাকা দিল। তারপর আড়চোখে নজর করতে লাগল বউ টাকাগুলো রাখল কোথায়। আর পরের দিনই একটা নোট হাপিস। আর অবধারিতভাবে এর জন্যে বকুনি খেতে হত চাকরবাকরদের।

সবাই জানে যে মন্টো সোজাসাপটা কথা বলার মানুষ, কিন্তু আমি অন্তত তা একেবারেই মানতে নারাজ। মন্টো পয়লা নম্বরের মিথ্যেবাদী। প্রথম জীবনে সে সহজেই পার পেয়ে যেত কেননা তার মধ্যে একটা বিশেষ 'মন্টো' ছোঁয়া থাকত। কিন্তু কিছুদিন পরেই তার বউ ধরে ফেলে তার মিথ্যাচারিতা। মন্টো এত অকপটে মিথ্যে বলতে পারে যে, দুর্ভাগ্যক্রমে তার পরিবারের কেউই তার কথার এক বর্ণও আর বিশ্বাস করে না।

মন্টো অশিক্ষিত। কেননা সে মার্কস পড়েনি, ফ্রয়েডের লেখা চোখেও দেখেনি। হেগেলের নাম শুধু শুনেছে। হ্যাভলক এলিসও শুধু একটা নাম। কিন্তু মজার ব্যাপার হল তার সমালোচকরা বলে যে সে নাকি এঁদের দ্বারা প্রভাবিত। আমি যদ্দুর জানি, মন্টো অন্য কারোর চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হওয়াকে ঘেন্না করে। তার ধারণা যারা তাকে শিক্ষা দিতে যায় তারা ইডিয়ট ছাড়া কিছু নয়। কেউ অন্য কাউকে পৃথিবী সম্পর্কে শেখাতে যাবে কেন? সে নিজেই আগে ভাল করে দুনিয়াটাকে বুঝুক। মন্টো নিজেকে শেখাতে গিয়ে বা কোনও কিছু নিজের কাছে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন সব উদ্ভট কথাবার্তা বলে যে আমি না হেসে পারি না।

আমি তোমাদের খুব জোর গলায় বলতে পারি যে মন্টো, যার বিরুদ্ধে এত অশ্লীলতার অভিযোগ রয়েছে, আদতে আপাদমাথা ভদ্রলোক। কিন্তু একথাও বলে রাখি এর সঙ্গে যে সে আসলে নিরন্তর ঝাড়পোঁছ করে চলেছে নিজেকে।

ভাষান্তর : সুদীপ বসু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার পাঠকদের প্রতি

আমার লেখালিখি যাঁরা পড়েন তাঁদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাই আমি, 'ভূমিকা' বা ওই ধরনের প্রচলিত রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে। যদিও আমার গল্পে, নাটকে বা আধা-কাহিনিমূলক নিবন্ধে আমি অনেক বিষয়ই এনেছি যা খুব ব্যক্তিগত, সেগুলো কিন্তু আপনাদের কাছে কল্পকাহিনি মাত্র, কেননা সেটাই আমার পছন্দের মাধ্যম।

আজ আমার মন ভারী হয়ে আছে। এক আশ্চর্য বিষণ্ণতা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সাড়ে চার বছর আগে যেদিনটাতে আমি আমার দ্বিতীয় জন্মভূমি বম্বেকে বিদায় জানিয়ে এসেছিলাম আমার ঠিক একইরকম লেগেছিল। বম্বে, যেখানে আমি জীবনের কঠোরতম বছরগুলো কাটিয়েছিলাম, তাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছিল আমায় সেদিন। এই শহর আশ্রয় যুগিয়েছিল একজন পরিবার পরিত্যক্তকে। তাকে কানে কানে বলেছিল, 'এখানে তুমি দিনে দু-পেনি রোজগার করেও খুশি থাকতে পারো, আবার দিনে দশ হাজার টাকাও রোজগার করতে পারো। তুমি এখানে বছরের পর বছর থেকে যেতে পারো পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী মানুষ হিসেবে। যা ইচ্ছে তুমি করতে পারো এখানে। কেউ খুঁত ধরতে যাবে না। কেউ নীতিকথা কপচাতে যাবে না। তুমি নিজেই জীবনের কঠিনতম কাজগুলো করে যাবে আর কঠিনতম সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে যাবে। তুমি ফুটপাথে থাকবে কিম্বা প্রাসাদে, আমি দেখতেও যাব না। তুমি এখানে থাকতেও পারো বা চলে যেতেও পারো, তাতে আমার কিছু আসবে যাবে না। আমি যেখানে আছি সেখানেই থেকে যাব।'

বম্বেতে বারো বছর একটানা কাটানোর পর এখন আমি পাকিস্তানে। সেখানে অনেক কিছু লেখার কারণেই আজ আমি এখানে। এরপর যদি আর কোথাও যেতেও হয় আমি একইরকম থেকে যাব। আমি আসলে চলমান বম্বে শহর। যেখানেই যাই না কেন সেখানে নিজের একটা দুনিয়া আমি গড়ে নিই।

বম্বে ছেড়ে যাওয়ার পর আমার মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ওখানে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল। ওখানে আমার বিয়ে হয়েছিল। ওখানে আমার প্রথম সন্তান জন্মায়।

~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয়টিও তার জীবনের প্রথম পর্বটি শুরু করেছিল। খুব সামান্য থেকে শুরু করে হাজার হাজার টাকা আমি ওই শহরে রোজগার করেছি। ওই শহরটাকে আমি আগে যেমন ভালবাসতাম, আজও তেমনই ভালবাসি।

দেশভাগের বিরুদ্ধে আমি সবসময়ই গর্জে উঠেছি, বিদ্রোহ করেছি। আজও আমি একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছি। অবশ্য সবকিছুর পরেও আমাকে দেশভাগের ভয়ঙ্কর বাস্তবতাকে মেনে নিতে হয়েছে, কিন্তু তার জন্য আমি হতাশার সমুদ্রে ডুবে যাইনি। বরং সেই রক্তের সমুদ্রে আমি সরাসরি ঝাঁপ দিয়েছি আর মানুষ মানুষের কত বড়ো ক্ষতি করেছে তার জন্য, ভাই ভাইয়ের শিরার থেকে শেষ রক্তফোঁটা কীভাবে শুষে নিচ্ছে তার জন্য কুড়িয়ে এনেছি অনুশোচনার কয়েকটা মুক্তো। আবার কিছু মানুষ মানবিকতাকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিতে পারেনি, এর জন্যে সারা জীবন তাদের চোখের জল ঝরাতে হয়েছে। আমি সেই চোখের জল কুড়িয়ে এনেছি। এই মুক্তোর দানাগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে লিখেছি 'সিয়া হাশিয়ে' বইটি।

আমি একজন মানুষ, সেই একই মানুষ যে মানবজাতিকে ধর্ষণ করেছে, খুনোখুনিকে ক্রমাগত লাই দিয়ে গেছে, যেন এগুলোই মানুষের স্বাভাবিক কাজ। আমি সেই একই মানুষ যে মানুষের মাংস টাঙিয়ে রেখেছে দোকানের দরজায়, যেন এটা বিক্রিযোগ্য পণ্য একটা। আমি সেই একই মানুষ যে যন্ত্র বনে গিয়েছিল একদিন। আবার দেবদূতদের রক্তেও হাত চুবিয়েছিল। আমি আমার ভেতর বহন করি মানুষের তাবৎ দোষ ও গুণগুলো, দুর্বলতা ও সফলতাগুলো। আমি মনে মনে খুব আহত হয়েছিলাম যখন আমারই সমসাময়িক কয়েকজন বলেছিলেন যে আমি একজন একগুঁয়ে, উন্নাসিক, প্রতিক্রিয়াশীল, ছিদ্রান্বেষী লোক যার কাজই হল সব কিছু নিয়ে তামাসা করা। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু একথাও বলেছিল যে আমি নাকি মরা মানুষের পকেট থেকে সিগারেটের টুকরো, আংটি এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সরিয়ে থাকি। সে একটা খোলা চিঠি লিখেছিল (সে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বলতেই পারত) যেখানে সে প্রকাশ্যে 'সিয়া হাশিয়ে'-এর নিন্দে করেছিল।

আমি ভয়ানক রেগে গিয়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম যে যারা আমার গায়ে কাদা ছুঁড়েছে আমিও তাদেরকে লক্ষ করে এমনভাবে কাদা ছুঁড়ে মারব যেন অনেকদিন তাদের মনে থাকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবলাম, যে অন্যায় তারা করেছে সেই একই অন্যায় আমি ফের করব কেন? মানুষের স্বভাবই হল অপমানের জবাব আরও বড়ো অপমান দিয়ে দেওয়া, কিন্তু অপমানের বদলে তুমি যদি নৈঃশব্দ ফেরত দাও, তবে তা হবে অনেক বেশি ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

আমি রেগে গিয়েছিলাম শুধুমাত্র এই কারণে নয় যে মিস্টার 'ক' আমায় ভুল বুঝেছেন, কিন্তু এই কারণেই যে একটি ক্ষয়িষ্ণু বিদেশি আন্দোলনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি আমার কুৎসা করছেন এবং আমার সততা ও সদিচ্ছাগুলিকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন, যেন একটাই পরশপাথরের নিরিখে আমাকে বিচার করা যায়, যার গায়ের রং লাল।

~ www.amarboi.com ~

আমি রেগে গিয়েছিলাম। আমি বার বার প্রশ্ন করেছিলাম নিজেকে, কী হলটা কী এই লোকগুলোর? কী ধরনের প্রগতিশীল এরা, যারা সব সময়েই পিছিয়ে যাচ্ছে? এই 'মহান লাল' কেন হু হু করে কালো অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে? শ্রমের প্রতি কোন ধরনের প্রেম তারা প্রচার করে যা শ্রমিককে ঘাম ঝরাবার আগেই মাইনে চাইতে শেখায়? পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই কতটা যৌক্তিক যখন তারা নিজেরাই পুঁজির দখল নিতে চায়? তারা কি তাদের অস্ত্রগুলি (কাস্তে ও হাতুড়ি) তাদের শত্রুদের কাছে ইতিমধ্যেই সমর্পণ করে বসে নেই? কীভাবে তারা দাবি করে যে তাদের সাহিত্য প্রচেষ্টা অত্যন্ত আধুনিক, যখন আদতে যা তারা করে তা হল মেশিনকে কবিতা ও কবিতাকে মেশিন বানানো?

আমি ভয়ঙ্কর রেগে গিয়েছিলাম তাদের ম্যানিফেস্টোগুলো পড়ে, যা একদিন অন্তর একদিন বদলে যায়, আর তাদের লম্বা-চওড়া বক্তৃতা শুনে, যার মালমশলাগুলো রাশিয়ার ক্রেমলিন শহর থেকে বম্বের খেতোয়ারি হয়ে লাহোরের ম্যাকলিয়ড রোডে পৌঁছয়। অমুক রুশ কবি এই কথা বলেছেন, তমুক রুশ গল্পকার ও বুদ্ধিজীবী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন... আমার খুব রাগ হত। কেন আমাদের দেশে কি চিন্তাশীল মানুষ পয়দা হওয়া বন্ধ গেছে নাকি? কেন এরা নিজের দেশের দিকে তাকিয়ে দেখে না?

আমি রেগে গিয়েছিলাম, কেননা কেউ আমার কথা শুনছিল না। দেশভাগ হয়ে যাওয়ার পর যে যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছিল। যারা লোভীর মতো, উন্মাদের মতো পরিত্যক্ত বাড়িঘর কলকারখানার দখল নিচ্ছিল, তাদের একবারও মাথায় খেলল না যে, দেশে এত বড় একটা পরিবর্তনের পর সবকিছুই পাল্টাতে হবে। পুরোনো পায়ে-হাঁটা রাস্তাগুলো নয় হাইওয়ে হবে নয়তো বেমালুম হাপিশ হয়ে যাবে। কেউ নিশ্চিতভাবে কিছু জানত না। কেউ ধারণাই করতে পারত না যে একটা বিদেশি শাসন আর আমাদের নিজেদের সরকারের মধ্যে ফারাকটা কী হবে! কী ধরনের আবহাওয়া আসবে দেশে? রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে এবং ব্যক্তি ও নাগরিক সমাজের মধ্যে সম্পর্কের কী ধরনের পুনর্বিন্যাস হবে, এসব সম্পর্কে ভাবা দরকার ছিল। দেখা দরকার ছিল যেন বিদেশি চিন্তাভাবনা আমাদের সমাজের দিকনির্দেশ না করে দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এটাই যে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা অযথা অধৈর্য হয়ে পড়লেন এবং উচ্চাকাঙ্খায় অন্ধ হয়ে তাদের চটুল সিদ্ধান্তের অগভীর সারবস্তু একটা পাত্রে রাখলেন যেখানে সেটা অচিরেই পচতে শুরু করল।

প্রথম যে সিদ্ধান্তটি তাঁরা নিলেন তা হল কোনও প্রগতিশীল লেখক সরকারি প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না বা তার হয়ে লিখবেন না। আমি এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে প্রগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের এই সিদ্ধান্ত ভুল ও হাস্যকর। অবশ্য উল্টো দিক থেকে উল্টো সিদ্ধান্তও আসতে পারত যা হত সমানভাবে ভুল ও হাস্যকর। কেননা একটা সরকার সেই পথই বেছে নেয় যা তার স্বার্থসিদ্ধি ঘটাবে।

আমাদের সরকার এই হাস্যকর সিদ্ধান্তটিই নিল, তা-ও অনেক পরে, যখন প্রগতিশীল লেখকরা সরকারকে বয়কটের ডাক দিয়েছেন, অতএব রেডিয়ো স্টেশন এবং সরকারি মুখপত্রগুলিতে তাঁদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। পরে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আইনে কয়েকজন

~ www.amarboi.com ~

প্রগতিশীল লেখককে পুলিশ তুলে নিয়ে গেল এবং চালান করে দিল কয়েদখানায়। এব্যাপারে আমি কোনও মন্তব্য করব না, কেবল বলব যে আহমদ নাদিম কাসিমি এবং জাহির কাশ্মীরির মতো সাদাসরল মানুষকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে জেলে পাঠানোর সরকারি সিদ্ধান্ত আমাকে আহত করেছিল।

শুধুমাত্র অন্ধ রাগে সরকার এই লেখকদের জেলে পাঠিয়েছে, অনেকটা নাপিতের কাছে পাঠানোর মতো। কে বলতে পারে কী হাল হবে ওঁদের যখন মুক্তি পাবেন ওঁরা। মাথা থেকে গোড়ালি কামানো হবে তাঁদের, নাকি চুলে ঢেকে যাবে গোটা শরীর। কী নামে ডাকা হবে তাঁদের? পবিত্র যোদ্ধা নাকি শহিদ? জেল থেকে বেরিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁরা? আর কোনওদিন গল্প-কবিতায় আঙুল ছোঁয়াবেন না? নাকি আরও বেশি করে লিখবেন, সেই বুড়ো লেখকটির মতো যে এক তরুণকে অনুরোধ করেছিল কাঁধে করে নদীটা পার করে দিতে, কিন্তু ওপারে পৌঁছে কিছুতেই ঘাড় থেকে নামতে রাজি হচ্ছিল না। আমি কাউকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু বলতে চাই না, কিন্তু আমাকে যদি জেলে পাঠানো হত, আমি বেরিয়ে এসে ওই বুড়োটার মতোই আচরণ করতাম।

সরকার এবং প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, দুপক্ষই আসলে ছিল হীনমন্যতার শিকার। এটা আমাকে আগেও কষ্ট দিত, আজও কষ্ট দেয়। প্রগতিশীল লেখকরা অযথাই নিজেদের রাজনীতিতে জড়ালেন এবং তারপর সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে রোগীর পালস্ ও হার্টবিট না দেখেই ক্রেমলিন-নির্দেশিত ওষুধ খাইয়ে দিলেন রোগীকে, যার জন্যে আজ তারা পস্তাচ্ছেন, আজ বলছেন এদেশের সাহিত্য একেবারে বদ্ধ জলাশয়ে আটকে গেছে।

আজ আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। যেসব সাহিত্যপত্রিকা প্রগতিশীলদের মুখপত্র ছিল সেগুলো এখন ভোল বদলাচ্ছে। প্রগতিশীলরাও তাঁদের পুরোনো বক্তব্য ও সিদ্ধান্তে ফিরে যাচ্ছেন এবং অনেক রকম দোহাই পাড়ছেন সেইসব লেখকদের সহযোগিতা ফিরে পাবার জন্যে যাঁদের নাম তাঁরা একদিন কালো তালিকায় রেখেছিলেন।

আজ আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, যখন দেখছি যাঁরা একদিন সরকারকে বয়কট করেছিলেন, তাঁরা আবার সুড়সুড় করে সরকারের কাছে ফিরে যাচ্ছেন। কেন তাঁরা বোঝেন না যে মানুষের সবচেয়ে বড় লড়াই হল নিজের খাদ্য সংগ্রহের লড়াই। আমাদের দুঃসাহস আমাদের নক্ষত্রের রাজ্যে পৌঁছে দিতে পারে কিম্বা আমাদের কল্পনাশক্তি দিয়ে আমরা আল্লাকেও জেলবন্দি করতে পারি। কিন্তু এই মুহূর্তের বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করবার ভয়ঙ্কর গোপন বাস্তবতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এক একটা সময় আসে যখন কোনও মানুষ একটা বদমায়েস ও গবেট বড়লোকেরও প্রশংসা করতে বাধ্য হয়, শুধুমাত্র তার নিজের আশু প্রয়োজন মেটাবার জন্যে। এটাই মানুষের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি তবে কিনা 'ট্র্যাজেডি' তো 'মানুষ'-এরই অপর একটা নাম।

যে-সমস্ত রাগ এতদিন ধরে আমার বুকের মধ্যে জমেছিল, তা এখন দুঃখে পরিণত হয়েছে। আমি বিষণ্ণ, ভীষণ বিষণ্ণ। আমার এখনকার জীবন দারুণ, দারুণ কঠিন। দিনরাত খাটুনির পরও আমার সারাদিনের চাহিদার ন্যূনতম অংশটুকু জোগাড় হয় না। এখন

~ www.amarboi.com ~

সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকি যে হঠাৎ যদি আমি মরে যাই আমার বউ ও তিনটে বাচ্চা মেয়ের কী হবে। হতে পারি আমি অশ্লীল গল্পের লেখক, একজন উন্নাসিক, একটা ভাঁড়, একজন প্রতিক্রিয়াশীল, কিন্তু পাশাপাশি আমি তো একজন স্ত্রীর স্বামী এবং তিনটে বাচ্চা মেয়ের বাবা। যদি তাদের কেউ একজন অসুস্থ হয়ে পড়ে আর আমাকে দোরে দোরে ভিক্ষে করতে হয়, ঘটনাটা হবে সত্যিই দুঃখজনক। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে, কিন্তু তারা আমার চেয়েও খারাপ অবস্থায় থাকে। তাদের বিপদে যদি পাশে দাঁড়াতে না পারি সেটাও হবে সমান দুঃখজনক। যদি আমার মৃত্যুর পর সরকারি লাইব্রেরি আর সরকারি রেডিয়োর দরজা খুলে দেওয়া হয় আমার লেখা পড়বার জন্যে, আমার আত্মা আনন্দে পাগলের মতো দৌড়দৌড়ি করবে। আমার এমন মানসিক পর্যুদস্ততার মধ্যেও আমি খুশি যেভাবে আমাকে এতদিন দেখা হয়েছে তার জন্যে। কবরে শুয়ে শুয়ে আমার হাড়গুলো যেন পচে না যায়, আল্লা সেটা দেখবেন।

আমার হৃদয় আজ ভার হয়ে আছে, কারণ সমালোচকরা চারদিকে বলে বেড়াচ্ছেন যে সাহিত্য একেবারে বদ্ধ হয়ে গেছে, সাহিত্য গভীর কোমায় চলে গেছে, এটা অনেকটা ওই শ্লোগানটার মতো—'ইসলামধর্ম এখন গভীর সঙ্কটে।' সাহিত্যর একটা নিজস্ব জান আছে, স্পন্দন আছে, যেমন ইসলামের আছে নিজস্ব শক্তি। এদের কেউ-ই বদ্ধ হয়ে যাবে না বা সঙ্কটে পড়বে না কোনওদিন। পরমাণু শক্তি আবিষ্কার হওয়ার আগেও ছিল এবং ভবিষ্যতে থাকবেও। তাকে খারাপ কাজে ব্যবহার করা হলেও তার মৃত্যু হবে না।

সাহিত্যও তেমনই। সে কখনোই দুর্বল হয়ে পড়বে না বা এক জায়গায় আটকে যাবে না। এটা আসলে আমাদের নিজেদেরই দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা।

চারপাশের সঙ্কটের কারণ খুঁজতে চারদিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই, তাকাতে হবে নিজের ভেতরে। এটা খুব কঠিন কাজ নয়। যদি আমরা সাহিত্যের সোজা রাস্তা থেকে নিজেরাই সরে আসি, তবে এ অভিযোগ তুলতে পারি না যে সাহিত্যই আমাকে বাঁকাপথে ঠেলে দিয়েছে। রাজনীতির একটা নিজস্ব অবস্থান আছে, আর সেখানে সাহিত্যকে জোর করে ঢোকানোটা অন্যায়, যেমন সাহিত্যের মধ্যে রাজনীতিকে।

আর একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে সোভিয়েত সাহিত্যের পক্ষে হাজার দামামা বাজালেও হাজার হাজার টন কাগজের ওপর লেখা শস্তা, অসৎ লেখালিখি কোনওদিন সাহিত্য হবে না। সাহিত্য কোনওদিনই কারো একার সম্পত্তি নয় আর কোনওদিনই তা হবে না। যাঁরা আজ চেঁচাচ্ছেন এ-কথা বলে যে সাহিত্য এক জায়গায় আবদ্ধ হয়ে গেছে তাঁরাই দুদিন আগে বলতেন যে প্রগ্রেসিভ রাইটার্স আসোসিয়েশনই দেশভাগের পর সাহিত্যে নতুন প্রাণসঞ্চার করেছে। ভাবতে অদ্ভুত লাগে যে তাঁদেরই এক-একজন নেতা গ্রেফতার হওয়ার পর কী করে সাহিত্যও বদ্ধ জলাশয় হয়ে গেল?

আজ আমার খুব মন খারাপের দিন। একটা সময় ছিল যখন আমাকে খুব প্রগতিশীল বলা হত। কিন্তু তারপর আমার গায়ে প্রতিক্রিয়াশীল তকমা মারা হল। এখন আবার ওই 'প্রতিক্রিয়াশীল' আখ্যা দেওয়া লোকগুলোই আমাকে বলছে 'প্রগতিশীল' আর আমাদের

~ www.amarboi.com ~

সরকার আমাকে শেষ পর্যন্ত 'প্রগতিশীল' হিসেবেই দেখল, অর্থাৎ 'লালপার্টির লোক' হিসেবে, মানে 'কম্যুনিস্ট।' কখনও কখনও দিশেহারা হয়ে সরকার আমাকে পর্নো সাহিত্যের লেখক বলে। আবার কখনও বা বিজ্ঞাপনে লেখে 'সদত হসন মন্টো একজন মহান লেখক, ছোটগল্পের জাদুকর, যিনি আমাদের এই সাম্প্রতিককালের সঙ্কটের সময়ও তাঁর কলমকে বিশ্রাম দেননি।' আমার বুক কেঁপে ওঠে যখন ভাবি যে এই সরকারই হয়তো একদিন আমার কফিনের ওপর একটুকরো সোনার মেডেল রেখে আসবে, যা হবে আমার সারা জীবনের বিশ্বাসের মূলে সবচেয়ে বড় আঘাত।

দেশভাগের পর থেকে আজ অবধি আমার আটটা বই বেরিয়েছে। শেষেরটায় দুটো গল্প বাদে বাকি সবগুলোই অপ্রকাশিত। এগুলো লিখতে আমার কতটা সময় লেগেছে তা গল্পগুলোর নীচে লেখা তারিখ থেকেই বোঝা যাবে। শেষ গল্প 'মাম্মি' আমি লিখতে শুরু করি ১৬ অক্টোবর ১৯৫১ যেদিন আমি প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁ-এর হত্যাকাণ্ডের খবর পাই, যা আমাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। কিন্তু মাঝখানে আমার মেজ মেয়ের টাইফয়েড হয়ে যাওয়ায় আমি বেশ কিছুদিন উদ্বেগের মধ্যে ছিলাম, এই কারণে গল্পটা শেষ করতে আমার একটু বেশি সময় লেগে যায়।

সদত হসন মন্টো
২৮ অক্টোবর, ১৯৫১

ভাষান্তর : সুদীপ বসু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শ্যামচাচাকে লেখা চিঠি

৩১ লক্ষ্মী মানসন
মল রোড
লাহোর

১৬ ডিসেম্বর
১৯৫১

শ্রদ্ধেয় শ্যামচাচা,

আসসালাম-ওয়া-আলেকুম!

এই চিঠিটি আপনার কাছে পৌঁছবে আপনার এক দূরসম্পর্কীয় ভাইপোর কাছ থেকে, যে পাকিস্তানে থাকে আর যাকে আপনি চেনেনই না। আপনার দেশের অন্য আর কেউই চেনে না তাকে।

আপনি ভাল করেই জানেন কীভাবে আমার দেশ পাকিস্তান তৈরি হয়েছে, কীভাবে তাকে কেটে বের করে আনা হয়েছে হিন্দুস্থান থেকে। কীভাবে স্বাধীন হয়েছে সে। এবং সে জন্যেই আমার এই চিঠি লেখা আপনার কাছে। যেভাবে আমার দেশকে কেটে নেওয়া হয়েছিল আর স্বাধীন ঘোষণা করা হয়েছিল ঠিক সেভাবেই আমাকেও খণ্ডিত করে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আপনি একজন বিদ্বান ব্যক্তি। আপনি জানেন একটা পাখির ডানা ক্লিপ দিয়ে আটকে তাকে স্বাধীনভাবে উড়তে দেওয়ার অর্থ কী দাঁড়ায়। যাই হোক আপাতত এ সব বিষয় থাক।

আমার নাম সদত হসন মন্টো। আমি জন্মেছিলাম এমন একটা শহরে যেটা এখন হিন্দুস্থানে চলে গেছে। আমার মা'কে গোর দেওয়া হয়েছে এদেশে, আমার বাবাকে ওদেশে। আমার প্রথম সন্তান ঘুমিয়ে আছে ওদেশের মাটির অনেক গভীরে, যে মাটির অধিকার আর আমার হাতের মুঠোয় নেই। আমার এখন স্থায়ী ঠিকানা পাকিস্তান, যেখানে এর আগে আমি পাঁচ ছ'বার এসেছি। তখন এদেশ ব্রিটিশ শাসনে ছিল।

হিন্দুস্থানে আমি একজন বিখ্যাত ছোটগল্প লেখক ছিলাম, এখন পাকিস্তানের বিখ্যাত সাহিত্যিক। আমার প্রচুর ছোটগল্পের বই আছে। অবিভক্ত হিন্দুস্থানে আমার নামে তিনটে মামলা চলছিল, পাকিস্তানে মাত্র একটি। তবে মনে রাখা দরকার যে পাকিস্তান একটি সম্পূর্ণ নতুন দেশ।

আমার দেশ
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্রিটিশ সরকার মনে করত যে আমি একজন নেহাতই পর্নোগ্রাফি লেখক। আমার সরকারও একই মত পোষণ করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার আমাকে বিশেষ একটা ঘাঁটায়নি। আমার মনে হয় না আমার সরকার ছেড়ে কথা বলবে। ট্রায়াল কোর্ট ইতিমধ্যেই আমাকে তিন মাস জেল ও তিনশো টাকা জরিমানা ধার্য করেছিল। আমি সেশনস্ কোর্টে আপিল করে ছাড়া পেয়েছি। কিন্তু সরকার এতে খুশি হয়নি। সে সেশনস্ কোর্টে আপিল করেছে যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। এখন দেখা যাক হাইকোর্ট কী বলে।

আমার দুঃখ হয় এই ভেবে যে আমার দেশ আপনার দেশের মতো নয়। যদি হাইকোর্টের রায় আমার বিরুদ্ধে যায় এদেশের একটাও সংবাদপত্রে আমার ছবি ছাপাবে না। নিদেনপক্ষে আমার খবরটাও দেবে না।

আমার দেশ অত্যন্ত গরিব। এখানে কোনও আর্ট পেপার নেই। কোনও ভাল ছাপাখানা নেই। আমিই সেই দারিদ্রের চরম নমুনা। আপনি বিশ্বাস করবেন না শ্যামচাচা, আমি জীবনে বাইশটা বই লিখেছি, কিন্তু আমার নিজের কোনও থাকবার জায়গা নেই। একটা 'প্যাকার্ড' বা 'ডজ্' নেই, এমনকি সেকেন্ড হ্যান্ডও নয়।

যখন কোথাও যাবার থাকে তখন আমি একটা সাইকেল ভাড়া করি। আর যখন খবরের কাগজে আর্টিকেল লিখে আমার কুড়ি পঁচিশ টাকা রোজগার হয় (সাত টাকা প্রতি কলম) তখন আমি টাঙ্গা ভাড়া করি আর দেশি মদ খাই। যদি এই মদ আপনার দেশে তৈরি হত, তবে এতদিনে ওই কোম্পানির ওপর হয়ত আপনারা অ্যাটম বোম ফেলে দিতেন, কেননা যেভাবে ওটা তৈরি হয় তা একজন মানুষকে এক বছরের মধ্যে সাবাড় করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

তাহলে ভাবুন কী লজ্জা আর অবহেলার মধ্যে আমি আছি এখানে। আসলে আমি আপনার মাধ্যমে আরস্কিন কল্ডওয়েলকে আমার শ্রদ্ধা পাঠাতে চাইছিলাম। তাঁকে অবশ্যই আপনি চেনেন। আপনি তাঁর 'গডস লিটল্ একর'-এর বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছেন, ঠিক যে অভিযোগ আমার বিরুদ্ধেও আনা হয়েছে।

সত্যিই বিশ্বাস করুন, শ্যামচাচা, আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এ কথা ভেবে যে আপনাদের দেশ যে নাকি সাত সাতটা স্বাধীনতা যুদ্ধ দেখেছে সে অশ্লীলতার দায়ে আরস্কিন কল্ডওয়েল-এর নামে মামলা করল। আপনাদের দেশে সবই তো নগ্ন, খোলামেলা, খোসা ছাড়ানো, সে ফলই হোক বা নারী, মেশিন কিম্বা পশুপাখি, বই ও ক্যালেন্ডার। আপনারা তো নগ্নতার সম্রাট। আমার মনে হত পবিত্রতাই ওদেশে অশ্লীলতা। কিন্তু কী অবিশ্বাস্য কাজ আপনি করেছেন শ্যামচাচা—কল্ডওয়েলের বিরুদ্ধে মামলা করে!

এ খবরটা শুনে হয়তো আমি অতিরিক্ত মদ্যপানের (দেশি) ফলে মারাই যেতাম যদি না আমি কোর্টের রায়টাও শুনতাম। এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যের যে আমাদের দেশ আমাকে কিছুতেই ছাড়ছে না। কিন্তু যদি মরেই যেতাম কীভাবে চিঠি লিখতাম আপনাকে? সাধারণভাবে আমি খুব বাধ্য প্রকৃতির লোক। আমি আমার দেশকে ভালবাসি। আমার আশা, আল্লার মেহেরবানি, আমি খুব শিগগিরই মরে যাব। যদি অসুখে না হয়, তবে এমনি এমনিই, কেননা যে-দেশে গমের দাম দু'টাকা পঁচাত্তর প্রতি সের সেখানে পুরো জীবনটা বেঁচে থাকা লজ্জাজনক।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যা বলছিলাম, কল্ডওয়েলের মামলার রায় শোনবার পর আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, না দেশি মদ খেয়ে আর আত্মহত্যা করব না। শ্যামচাচা আপনাদের দেশে সবকিছুই তো রুপোর আস্তরণ দেওয়া। কিন্তু যে বিচারক কল্ডওয়েলকে মুক্তি দিয়েছেন তিনি নিশ্চয়ই এই মেকি রুপোর প্লেটিং-এর উর্ধে। তাঁকে আমার উষ্ণ অভিনন্দন জানাবেন।

তাঁর রায় তাঁর উদার মনেরই পরিচায়ক : 'আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে এই সব বই বাজেয়াপ্ত করার ঘটনা মানুষের মধ্যে অনর্থক কৌতূহলের সৃষ্টি করে এবং বাজে শস্তা বইয়ের দিকে ঠেলে দেয়। এই বইটি শস্তা জনপ্রিয়তার জন্যে রচিত হয়নি এবং এর লেখক আমেরিকার সমাজের কিছু কিছু বিষয়ে অনুপ্রাণিত হয়েই লিখেছেন। আমি মনে করি যে সত্য সবসময়ই সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হবে।'

আমি ওই একই কথা ট্রায়াল কোর্টের সামনে বলেছিলাম, কিন্তু তবুও এই তিন মাসের জেল ও তিনশো টাকা জরিমানা। ট্রায়াল কোর্টের মত হল সত্য আর সাহিত্যকে আলাদা করে দেখা দরকার। হায়, সবারই আবার একটা নিজস্ব মতামত আছে।

তিন মাসের জেল খাটতে আমি এক পায়ে খাড়া কিন্তু তিনশো টাকা কোথা থেকে দেব। শ্যামচাচা, আপনি জানেন না আমি কতখানি গরিব।

আমি কঠোর পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত, কিন্তু টাকা রোজগার করতে পারি না। এখন আমার ঊনচল্লিশ বছর বয়স এবং বেশির ভাগ সময়টা কঠিন শ্রম করেছি, কিন্তু এখনও অবধি আমার একটা 'প্যাকার্ড' নেই।

আমি গরিব কেননা আমার দেশটাই গরিব। আমি তবু দুবেলা দুমুঠো ভাত জোগাড় করতে পারি, অনেকে তাও পারে না।

কিন্তু কেন আমার দেশ গরিব? কেন বেশিরভাগ মানুষ অশিক্ষিত? আপনি এর উত্তর ভাল করেই জানেন। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, এটা আপনি আর আপনার ভাই জন বুলের ভেতরকার ষড়যন্ত্রের ফসল। তবে এসব কথা এখানে তুলতে চাই না। কেননা তাহলে আপনার খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হবে। আমি আপনার ভৃত্য আর আজীবন ভৃত্যই থেকে যেতে চাই।

আপনি হয়তো প্রশ্ন করবেন কী করে তুমি তোমার দেশকে গরিব বলো যখন এত এত 'প্যাকার্ড' 'বুইক' ও 'ম্যাক্স ফ্যাক্টর' আমাদের দেশ থেকে ওদেশে নিয়মিত রপ্তানি করা হয়? এর উত্তরটা আপনি নিজেই জানতে পারবেন যদি আপনি নিজেকেই এই প্রশ্নটা করেন।

আমাদের দেশের যে সব মানুষ 'প্যাকার্ড' চড়ে ঘুরে বেড়ায় তারা আমাদের জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধি নয়। আমাদের দেশের জনগণ আমারই মতো কিম্বা আমার চেয়েও দরিদ্র।

এগুলি খুব তেতো বিষয়। যাক ভুলে যান এসব কথা। যেটা বলতে চাইছি সেটা হল খুব সম্প্রতি আমি ইভলিন ওয়া-র 'দা লাভড্ ওয়ানস্' বইটা পড়ে উঠলাম। পড়েই এমন মোহিত হয়ে গেলাম যে সঙ্গে সঙ্গে এই চিঠিটা লিখতে বসে গেলাম।

আমি অনেকদিন ধরেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের কথা বলে আসছি যা আপনার দেশে আছে, তবে এই বইটা পড়ার পর আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম 'সত্যিই কী আশ্চর্য, দারুণ।'

সত্যি বলছি, শ্যামচাচা আমি অভিভূত হয়ে গেছি। কী সুন্দরভাবে মানুষ বেঁচে আছে আপনার দেশে। ইভলিন ওয়া লিখছেন আপনাদের দেশ ক্যালিফোর্নিয়ায় কীভাবে মৃত

~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিকেও সাজানো হয়। যদি মৃত ব্যক্তিটি কুৎসিত হয় তবে তাঁর আত্মীয়রা বিশেষ কিছু কেন্দ্রে ফর্ম পূরণ করে কী কী পরিবর্তন করতে হবে লিখে দেন। বিভিন্ন এক্সপার্টরা মৃতের মুখের অপারেশন করে সেখানে মুখে স্মিত হাস্য ফুটিয়ে তুলতে পারেন। চোখে খেলিয়ে দিতে পারেন আলোর ঝিলিক, সারা মুখে আশ্চর্য জ্যোতি। এতে এতটাই পাল্টে যায় মৃতের চেহারা যে দেবদূতরা এসে ভিমরি খেয়ে যায় এ কথা ভেবে যে বোধহয় ভুল জায়গায় ভুল লোককে তারা নিতে এসেছে।

সত্যিই শ্যামচাচা আপনার দেশের জবাব নেই। জীবিত লোকের অপারেশন খুব সাধারণ ব্যাপার, প্ল্যাস্টিক সার্জারি করে চেহারার পরিবর্তন—তাও শুনেছি। কিন্তু মৃতের ওপর প্লাস্টিক সার্জারি...সত্যিই অদ্ভুত!

আপনার দেশ থেকে একজন এখানে এসেছিলেন। ততদিনে আমি ইডলিনের বইটা পড়ে ফেলেছি, তাঁর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তাঁকে আমি এই দুটি লাইন শোনালাম : 'একদিকে আমি আমার মুখ নিজের হাতে ধ্বংস করেছি, অন্যদিকে সে আছে যে ছবি তৈরি করতে পারে।' সেই বিদেশি ভদ্রলোক এর কিছুই বুঝতে পারলেন না। কিন্তু সত্যিই শ্যামচাচা আমরা আমাদের নিজেদের মুখ নষ্ট করে দিয়েছি। এতটাই যে নিজেরাও আর নিজেদের চিনতে পারি না। আর যেখানে আপনারা দেখুন, মৃতমানুষকেও কী সুন্দর সাজাবার ব্যবস্থা করেছেন। আপনাদের সত্যি পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার অধিকার রয়েছে। আর বাকিরা সব পোকামাকড় আর মাছির মতো বেঁচে আছে। গালিব নামে এক উর্দু কবি ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—

হুয়ে মর কে হাম জো রুশোয়া হুয়ে কয়োঁ না ঘরক্-এ-দরিয়া
না কহিঁ জানাজা উঠা না কহিঁ মাজার হোতা।

এই গরিব কবির কুখ্যাতির ভয় ছিল না, কেননা তাঁর জীবনটাকেই ঘিরে ছিল নানারকম কেচ্ছা কেলেঙ্কারির গল্প। তাঁর ভয় ছিল মৃত্যুর পর কুখ্যাতি আর রটনাকে নিয়ে। তিনি একজন সত্যিকারের সম্মাননীয় ভদ্রলোক ছিলেন এবং সেজন্যই তিনি চেয়েছিলেন মৃত্যুর পর যেন তাঁকে গোর না দিয়ে বা দাহ না করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এ যদি আপনার দেশ হত তবে হয়তো মহা ধুমধাম করে তাঁর শেষকৃত্য হত অথবা আকাশচুম্বী সমাধি হত তাঁর নামে। কিম্বা তাঁর শেষ ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে তাঁকে কাচের ট্যাঙ্কে ভাসিয়ে রাখা হত যাতে লোকে ভিড় করে দেখতে পারে, যেমন চিড়িয়াখানা হয়।

ইভলিন ওয়া লিখছেন, আপনাদের দেশে এমন সব পার্লার আছে যেখানে শুধু মৃত মানুষ নয়, মৃত পশুদেরও নতুন সাজে সাজানো হয়, নতুন রূপ ফিরে পায় তারা। একটা কুকুর যদি দুর্ঘটনায় তার লেজটা হারায়, তবে তাকে নতুন লেজ জুড়ে দেওয়া যায়। যদি কোনও মানুষের জীবদ্দশায় কোনও শারীরিক খুঁত থেকে থাকে তবে মৃত্যুর পর সেটা মেরামত করে দেওয়া যেতে পারে এবং ধুমধাম করে তাকে গোর দেওয়া হয়। তারপর ধরুন যদি কারো পোষা কুকুর বিড়াল মারা যায়, এইসব পার্লার থেকে তাকে একটা কার্ড পাঠানো হয় যেখানে লেখা থাকে, 'আপনার টেমি বা জেফি স্বর্গে বসে আপনার কথা ভাবছে আর আনন্দে লেজ আর কান নাড়াচ্ছে।'

আমাদের দেশে আমরা কুকুরেরও অধম হয়ে বেঁচে আছি। আমরা একদিন মরে যাই

~ www.amarboi.com ~

এবং ব্যস ওই পর্যন্তই। কারোর প্রিয় বা ঘনিষ্ঠ কেউ মারা গেলে সে শুধু একা একা বিলাপ করে—ও কেন গেল? এর চেয়ে আমি চলে গেলে পারতাম। সত্যিই কথাটা হল, শ্যামচাচা, আমি না জানি বাঁচবার শিল্প, না জানি মরবার।

সেদিন 'লাইফ'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যাটা (৫ নভেম্বর ১৯৫১, আন্তর্জাতিক সংস্করণ) দেখছিলাম। যেন একটা নতুন দিক উন্মোচিত হল আমার চোখের সামনে। দু-পাতা ধরে সেখানে লেখা হয়েছে (ঝকঝকে ছবিশুদ্ধ) আপনাদের দেশের বিখ্যাত গ্যাংস্টারের শেষকৃত্যের বর্ণনা। উইলি মোরেত্তির ছবি দেখলাম—আল্লা যেন ওঁকে জন্নতে সুখে রাখেন। সম্প্রতি পঞ্চান্ন হাজার ডলার দিয়ে কেনা ওঁর নতুন বাড়িটার ছবি দেখলাম। দেখলাম সেই পাঁচ একর এস্টেটের ছবি যেখানে উনি পালিয়ে গিয়ে শান্তিতে দুদণ্ড বাঁচতে চেয়েছিলেন। তাছাড়াও দেখলাম, তাঁর শবদেহের ছবি, চোখদুটো বোজা, পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের কফিনে শোয়া তিনি, পিছনে এগারোটা ভ্যানভর্তি ফুল আর ফুল। তার পেছনে পঞ্চান্নটা গাড়ি। দেখে আমার দুচোখের জল বাঁধ ভেঙে দিল।

আল্লা না করুন, যদি আপনি মারা যান, যেন উইলি মোরেত্তির চেয়েও বড় করে শেষকৃত্য হয় আপনার। এটা পাকিস্তানের এই গরিব লেখকের আন্তরিক কামনা।

পাশাপাশি বলব, আপনার মৃত্যুর আগেই আপনিই আপনার শোভাযাত্রার সমস্ত আয়োজন যেন করে রাখেন—কেননা আপনারা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জাত। মানুষ মাত্রেই ভুল হয়, আর হয়তো এমনও হতে পারে যে মৃত্যুর পর আপনার মুখের কোনও খুঁত কেউ মেরামত করতে ভুলে গেল। তখন কী হবে? আপনার আত্মা কি শান্তি পাবে? তার চেয়ে জীবদ্দশায় এ-সব ব্যবস্থা করে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি? অবশ্য আমার থেকে আপনি অনেক বেশি বুদ্ধিমান, আপনি এসব আরও ভাল বুঝবেন আর তাছাড়া সবার উপরে আপনি আমার কাকা।

আরস্কিন কল্ডওয়েল এবং ওই বিচারককে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন, আমার কোথাও কোনো ভুল হয়ে থাকলে দয়া করে মাফ করে দেবেন।

ইতি
আপনার গরিব ভাইপো
সদত হসন মন্টো
পাকিস্তানবাসী

(ডাকটিকিট কেনার পয়সা না-থাকায় এই চিঠিটি শেষ পর্যন্ত পাঠানো যায়নি)

ভাষান্তর : সুদীপ বসু

আরস্কিন কল্ডওয়েল (১৯০৩—১৯৮৭) : আমেরিকান লেখক। টোব্যাকো রোড, গডস লিটল একর উপন্যাসে দক্ষিণাঞ্চলের দারিদ্র, জাতিবিদ্বেষ ও সামাজিক সমস্যা তুলে ধরে বিতর্কিত হয়েছিলেন।

ইভলিন ওয়া (১৯০৩—১৯৬৬) : ব্রিটিশ লেখক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ট্রিলজি সোর্ড অফ অনার উপন্যাসের জন্য বিখ্যাত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
# সদত হসন মন্টো

(১৯১২—১৯৫৫)

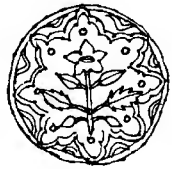

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সদত হসন মন্টোর জীবনকথার ভিতরে যাওয়ার আগে একবার তাঁর গোটা নামটাকে দু'ভাগে ভেঙে একটা ছোট্ট মজা করা যেতে পারে, যে-মজা তিনি নিজেকে নিয়েই করেছেন অসংখ্যবার। নিজের নামটাকে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন তিনি, একপ্রান্তে 'সদত হসন', অন্যপ্রান্তে 'মন্টো'।

মন্টোর পূর্বপুরুষরা ছিলেন কাশ্মীরি পণ্ডিত, যাঁরা বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে কাশ্মীরে বসবাস করতেন। আঠারশো শতকের শেষভাগে কিম্বা উনবিংশের প্রথম দিকে তাঁরা পঞ্জাবে চলে আসেন এবং লাহোরে পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করেন। মন্টো ছিলেন 'সদত হসন' জাতির বংশোদ্ভূত। যাঁদের সম্বন্ধে ইতিহাসে কিছুই নিশ্চিতভাবে বলা নেই, মন্টোরও তেমন আগ্রহ ছিল না কোনওদিন। উৎসাহ বা উদ্বেগ যা ছিল তা ওই মন্টো অংশটাকে ঘিরে। তিনি নিজে এক জায়গায় লিখেছেন, 'মান্ট শব্দটার কাশ্মীরি ভাষায় অর্থ হল কোনও বস্তু ওজন করবার জন্য ব্যবহৃত সামগ্রী বা এককথায় বাটখারা। আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন প্রবল ঐশ্বর্যের অধিকারী এবং শস্য মাপবার সময় তারা সোনা বা রুপোকে বাটখারা হিসাবে ব্যবহার করতেন।' 'মন্টো' শব্দের উৎস জানতে তিনি এমনকী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকেও চিঠি লেখেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, 'মন্টো' শব্দের মন্টোকৃত অর্থের কোনও বাস্তব ভিত্তিই নেই। সম্ভবত মন্টোর প্রাণপণ চেষ্টা ছিল নিজেকে বিত্তবান বংশের প্রতিভূ হিসাবে প্রমাণ করা। অপরিসীম দারিদ্র ও সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়িয়ে এটাই মন্টোর প্রথম মজা।

লেখার জন্য মন্টোর কোনও গোপন আশ্রয়ের প্রয়োজন হত না। বাড়িতে কিংবা অফিসে তুমুল হট্টগোলের মধ্যেও মন্টো নিরলস লিখে যেতে পারতেন। সোফায় বসে, কলমটা হাতে তুলে নিয়ে সাদা পাতার মাথায় সাংকেতিক বিসমিল্লা অর্থাৎ '৭৮৬' সংখ্যাগুলো লিখে তিনি লিখতে শুরু করতেন। তারপর গল্প লেখা হত ঝড়ের বেগে। একবার মন্টো বলেছিলেন, যখন তাঁর হাতে কলম ধরা নেই, তখন তিনি নেহাতই 'সদত হসন'। কিন্তু কলম হাতে তোলামাত্রই তিনি 'মন্টো'।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা দু'জন (সদত হসন এবং মন্টো)

~ www.amarboi.com ~

একসঙ্গে জন্মেছিলাম এবং সম্ভবত একই সময় মারা যাব। তবে এমনও তো হতে পারে যে সদত হসন হয়তো মারা গেল কিন্তু মন্টো মরল না। এই চিন্তা আমাকে সব সময় কুরে কুরে খায় যে তাহলে আমাদের এই আজন্মকাল বন্ধুত্বের কী হবে।' কালের এমনই খেলা যে সত্যি সত্যিই ১৯৫৫ সালের ১৮ জানুয়ারি সদত হসন চলে যান। কিন্তু মন্টো রয়ে গিয়েছেন আজও। এবছর তাঁর জন্মের শতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে।

মন্টো নিজে 'মন্টোর প্রার্থনা'-তে দাবি করেছেন যে, 'তিনি স্বর্গ থেকে পতিত দেবদূত'। তাঁর জন্ম হয়েছিল সমরালায় ১১ মে ১৯১২-তে। পঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলা থেকে প্রায় ২২ মাইল দূরে। খাজা জামালউদ্দিন-এর কনিষ্ঠ সন্তান মৌলবি গুলাম হসন মন্টোর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে। সদত হসন মন্টোরা ছিলেন সবমিলিয়ে চার ভাই ও আট বোন। তাঁর তিন দাদা মহম্মদ হসন, সঈদ হসন ও সালিম হসন ছিলেন তাঁর বাবার প্রথম পক্ষের সন্তান। বোনেদের মধ্যে একমাত্র নিজের বোন (দিদি) ইকবাল বেগম।

মন্টোর বাবা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, সমরালা-তে সরকারি পদাধিকারী। পরে তিনি অমৃতসরে বদলি হয়ে যান এবং ওয়াকিলন মহল্লায় বাড়ি নেন। উপ-বিচারপতি হিসাবে তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন। ১৯৩৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সত্তর বছর বয়সে মৌলবি গুলাম হসনের মৃত্যু ঘটে। সে বছর মন্টো পা রেখেছেন একুশে।

গুলাম হসন ছিলেন কঠোর ও বদমেজাজি। তাঁর থেকে শতহস্ত দূরে থাকত শিশু মন্টো। বাবার তিক্ত স্মৃতি শেষ দিন পর্যন্ত মন্টোকে তাড়া করে ফিরেছে। পরিবারে এক আশ্চর্য অবহেলা ও উদাসীনতার শিকার ছিলেন তিনি। তাঁর মা ছিলেন ধর্মপ্রাণা ও মিষ্টভাষী। মন্টোর একমাত্র আশ্রয় ছিলেন তাঁর মা। আদর করে মন্টো তাঁকে ডাকতেন 'বিবিজান' বলে। বাবার মৃত্যুর পর মাকে আরও নিবিড়ভাবে কাছে পান মন্টো। তাঁর 'বিবিজান' তাঁকে পারিপার্শ্বিক উপেক্ষার অন্ধকার থেকে আগলে রাখতেন। এমনকী শফিয়ার সঙ্গে তাঁর বিয়ের বন্দোবস্তও করেন তিনি। ১৯৪০ সালে অল্প অসুস্থতার পরেই চলে যান তিনিও।

মন্টোর তিন বৈমাত্রেয় দাদা মহম্মদ, সঈদ ও সালিম হসন ছিলেন অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত, বনেদি ও ধর্মপ্রাণ। তাঁরা বিদেশে থাকতেন। মহম্মদ ও সঈদ ছিলেন পেশায় নামডাকওয়ালা ব্যারিস্টার। সমাজের উঁচু মহলে ছিল তাঁদের অবাধ যাতায়াত, মেলামেশা। এরই পাশাপাশি মন্টো অস্থির,ছন্নছাড়া, শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। প্রথম দিকে তিনি অমৃতসরের এম.এ.ও মিডল ও হাই স্কুলে পড়াশোনার পাট শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে অমৃতসরের শরিফপুরায় মুসলিম হাই স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু পুথিগত বিদ্যা তাঁকে কোনওদিনই এক মুহূর্তের জন্যে টানেনি। বই তিনি পড়তেন তবে সমাজে নিষিদ্ধ বইগুলোর দিকেই ছিল তাঁর তীব্র আকর্ষণ। ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত ছিল তাঁর দৌড়। তা-ও পাস করেছিলেন কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তৃতীয়বারের চেষ্টায়, তৃতীয় বিভাগে। এবং সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার হল, একমাত্র উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে পাস মার্কও জোটেনি তাঁর কপালে। পরিবারে বারোজন ভাইবোনের মধ্যে কোনওদিনও সম্মানের জায়গা না পাওয়ার দরুণই হয়তো চিরকাল একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন, বিকল্প পথ কেটে নিয়ে হাঁটতে চেষ্টা করেছেন

~ www.amarboi.com ~

তিনি। সে পথ নগ্ন ও বেআব্রু, ঘাম ও অশ্রুতে ভেজা, সমাজের অন্ধকার কর্দমাক্ত কুখ্যাত অলিগলি।

কোনও ক্রমে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর পড়াশোনায় সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন সদত হসন মন্টো। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নিজের কাটা রাস্তা তাঁকে এনে ফেলে বদসঙ্গে, পয়সা রোজগারের জন্য নানারকম ফেরেব্বাজির আশ্রয়ে, সুরার কবলে, গাঁজা-ভাঙের সান্নিধ্যে এবং শেষমেশ তাঁকে এনে হাজির করে কাটরা জয়মল সিং-এ দেনু কিম্বা ফজলু কুমোরের ভয়াবহ জুয়ার ঠেকে। প্রথম প্রথম জুয়া তাঁর কাছে দুর্ভেদ্য জগত বলে মনে হত। পরে তার গোপন গলিঘুঁজির সুলুকসন্ধান পেয়ে যাওয়ার পর তিনি প্রকৃতপক্ষে দিনরাত্রির হিসাব ভুলে নিমজ্জিত হয়ে যান এই খেলায়। কিন্তু এই উন্মাদনার মেয়াদ ছিল মাত্র এক বছর। জুয়ার আসক্তি ছেড়ে গেলেও তীব্র মানসিক অস্থিরতা তাঁকে ছাড়ল না। অর্থপূর্ণ কিছু একটা করতে হবে জীবনে, এই চিন্তা সর্বক্ষণ মাথার ভিতর ঘাই মারলেও সেই 'অর্থপূর্ণ কিছু'-টিকে বাস্তব রূপ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই শুরু হল ভবঘুরের জীবন, অমৃতসরের রাস্তায় রাস্তায়, গোরস্তানে, ফকিরদের ডেরায়, মার্গসঙ্গীত বিশারদদের সাহচর্যে এবং আজিজের হোটেলে। এই আজিজের হোটেলেই দিনের বেশিক্ষণ সময় কেটে যেতে থাকে মন্টোর। একদল উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী বোহেমিয়ান বেপথু প্রতিভার সংস্পর্শে। তাদের মধ্যে ছিল ফটোগ্রাফার আশিক, উঠতি কবি ফকির হুসেন সালিশ, চিত্রকর আনোয়ার, ক্যাপ্টেন ওয়াহিদ এবং দাঁতের ডাক্তার জ্ঞানি আরুর সিং। আজিজের হোটেলে গান ও কাব্যচর্চা এবং অসংযত নেশায় মশগুল হয়ে ওঠে এই বোহেমিয়ান গোষ্ঠী।

ঠিক এই সময়ে মন্টোর সঙ্গে আলাপ হয় বারি আলিগ এবং আতা মহম্মদ চিহাতির, এই আজিজ হোটেলেই। এঁরা দু'জন এসেছিলেন দৈনিক 'শিব'-এর সম্পাদনার কাজে। এবং এসে 'মসওয়াত' পত্রিকার কাজ শুরু করেন। বারি আলিগ মন্টোকে প্রথম ইউরোপীয় সাহিত্যের আলোয় আলোকিত করেন। মন্টোর জীবনের একটা বড় ঐতিহাসিক মুহূর্ত, বাঁক ঘোরার সন্ধিক্ষণ ছিল এটি। ধীরে ধীরে ভিক্টর উগো, গোর্কি, চেকভ, অস্কার ওয়াইল্ড, পুশকিন, সমারসেট মম্ এবং মপাসঁর লেখার সংস্পর্শে আসেন। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণার জগতে নীরব বিপ্লব ঘটে যায়। উগোর উপন্যাস, ওয়াইল্ডের নাটক, গোর্কির গল্প উর্দুতে অনুবাদ করেন মন্টো। বারি সাহেবের স্নেহচ্ছায়ায় 'মসওয়াত'-এ ফিল্ম ক্রিটিকের কাজও করেন সাফল্যের সঙ্গে। 'মসওয়াত' বন্ধ হয়ে যায় হঠাৎ। বারি আলিগ 'খুল্‌ক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা শুরু করেন। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বারি সাহেবের একটি বিতর্কিত প্রবন্ধের পাশাপাশি ছাপা হয় সদত হসন মন্টোর লেখা প্রথম ছোট গল্প 'তামাসা'।

এখানেই এক লেখক জীবনের ইতিহাসের শুরু। বারি সাহেবের সযত্ন লালনে মন্টো এবার পুরোমাত্রায় গল্প লেখায় মন দেন। পাশাপাশি চলে অসংযমী জীবনযাপন ও অপরিসীম মদ্যপান। বিরোধ বাঁধে আবার। এবার মুখোমুখি দু'জন—একদিকে গল্প লেখক মন্টো অন্যদিকে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে এফ এ পরিক্ষার্থী মন্টো। ঠিক এই সময় দিল্লিতে একটি শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে ধরা পড়ে যে দুরারোগ্য যক্ষ্মায় আক্রান্ত তিনি। দিদি

~ www.amarboi.com ~

ইকবাল বেগমের মধ্যস্থতায় বিশ্রামের জন্যে তাঁকে জম্মু-কাশ্মীরের বাটোট অঞ্চলে পাঠানো হয়। এখানেই মন্টোর জীবনের প্রথম প্রেম এক পাহাড়ি মেয়ের সঙ্গে যাকে তিনি বেগু বলে ডাকতেন। কিছুটা সুস্থ হয়ে অমৃতসর ফিরে আসেন মন্টো। সেটা ১৯৩৫ সাল। মন্টো তখন তেইশ। পরের বছর জানুয়ারিতে 'মুস্‌সাবের' পত্রিকার সম্পাদনার আমন্ত্রণ আসে হঠাৎই বম্বে থেকে। মন্টো বম্বে চলে যান। চার বছর পর 'মুস্‌সাবের'-এর দায়িত্ব ছেড়ে যোগ দেন 'ক্যারাভান' পত্রিকায়। ১৯৪১-এ হঠাৎই এই কাজে ছেদ ঘটিয়ে তিনি দিল্লি চলে যান এবং সেখানে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'য় নাট্যকার হিসাবে যোগ দেন। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি আবার বম্বে ফিরে আসবেন, এমনই নিয়তি তাঁর। কিন্তু এই দেড় বছরে শতাধিক রেডিও-নাটক লিখে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে যান তিনি। পাশাপাশি চলে গল্প লেখা।

বম্বে প্রত্যাবর্তন সদত হসন মন্টোর জীবনে আবার একটা বড় বাঁকের মুখে এসে দাঁড়ানো। আবার 'মুস্‌সাবের'-এ যোগ দেন তিনি এবং এর সূত্র ধরে পা রাখেন ফিল্ম দুনিয়ায়। ইম্পেরিয়াল ফিল্ম কোম্পানি, ফিল্ম সিটি, সরোজ মুভিটোন, হিন্দুস্থান সিনেটোন ঘুরে ১৯৪৩-এর জুলাই-এ বিখ্যাত ফিল্মিস্তান-এ গল্পলেখক হিসাবে মাসিক ৩০০ টাকা পারিশ্রমিকে যোগ দেন। প্রায় সাড়ে চার বছরের সময়কালে ফিল্মিস্তান এবং বম্বে টকিজ-এ কাজের সুবাদে ভারতীয় চলচ্চিত্রের বহু উজ্জ্বল নক্ষত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় মন্টোর। এ সময় তাঁর বহু গল্প চলচ্চিত্রায়িতও হয়। বম্বের বহু নামজাদা অভিনেত্রী ছিলেন মন্টোর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। পারো দেবী, পদ্মা দেবী, কুলদীপ কউর, নীলম প্রমুখ। শোনা যায় শফিয়ার সঙ্গে মন্টোর বিবাহ অনুষ্ঠানে (২৬ এপ্রিল, ১৯৩৯) বম্বের রুপোলি পর্দার জগতের বহু নামী নক্ষত্রের সমাবেশ ঘটেছিল। বিয়ের পর নববধূ শফিয়া বেগমের জন্যে একটা বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন মন্টোর অন্তরঙ্গ বন্ধু অভিনেতা অশোককুমার। পরবর্তীকালে অশোককুমারের স্ত্রী শোভাদেবীর সঙ্গে শফিয়ার গভীর বন্ধুত্ব হয়। কর্মসূত্রে মন্টো বিখ্যাত অভিনেতা নওয়াজ কাশ্মীরি ও ভি এইচ দেশাই-এর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। বম্বে থাকাকালীন এই প্রথম ও শেষবার স্বচ্ছলতার মুখ দেখে মন্টো পরিবার।

ফিল্মিস্তানে যোগ দেওয়ার সাড়ে চার বছরের মাথায় দেশ স্বাধীন হয়। একই সঙ্গে নেমে আসে দেশভাগের অভিশাপ। দেশভাগের পর বম্বের ফিল্ম দুনিয়ায় এক অদ্ভুত পটপরিবর্তন ঘটে যায়। অর্থ ও প্রতিপত্তির এই কেন্দ্রবিন্দুতে পারস্পরিক সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হয়। মন্টো টের পান এই জাতিগত বিদ্বেষ ও হিংসার আবহাওয়ায় তাঁর টিকে থাকার আশা ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। ঠিক এই সময় অশোককুমারের জন্য লেখা তাঁর একটি গল্প খারিজ করে দেওয়া হয়। নির্বাচিত হয় তাঁরই বান্ধবী বিশিষ্ট উর্দু লেখিকা ইসমত চুঘতাই-এর গল্প 'জিদ্দি'।

১৯৪৮ সালের ৭ জানুয়ারি মন্টো করাচি হয়ে পাকিস্তানের লাহোরে চলে যান। তাঁর পরিবার আগেই লাহোরে চলে গিয়েছিল এবং তাঁরা মন্টোকে বারবার সেখানে চলে যাওয়ার কথা বলছিলেন। পিছনে পড়ে থাকে ভারতবর্ষে ফেলে আসা আর্থিক স্বচ্ছলতা ও

~ www.amarboi.com ~

তুমুল খ্যাতি (গল্পকার ও চিত্রনাট্যকার হিসাবে), ফিল্ম দুনিয়ার নক্ষত্রে ঠাসা বন্ধুমহল এবং রাজিন্দর সিং বেদী, ইসমত চুঘতাই, খাজা আহমেদ আব্বাস, কৃষণ চন্দর-সহ অন্যান্য লেখকবন্ধুরা।

দেশভাগ মন্টো আমৃত্যু মেনে নিতে পারেননি। তিনি প্রবল দুঃস্বপ্নেও কোনওদিন কল্পনা করেননি যে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান দুটো আলাদা সংস্কৃতি, আলাদা সমাজ, আলাদা দেশ হয়ে যাবে। দেশভাগের পর ভারতবর্ষের জমিতে তেমন উর্বরতার আশ্বাস না খুঁজে পেয়ে যে আশায় বুক বেঁধে পাকিস্তানে রওনা দিয়েছিলেন, পাকিস্তান তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা চুরমার করে দিয়েছে। পাকিস্তান তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল পর্নোগ্রাফির লেখকের তকমা উপহার দিয়েছে। খবরের কাগজে ও অন্যান্য পত্রিকায় কার্যত একঘরে হয়ে যাওয়া মন্টো একাধিকবার বম্বের সেই উজ্জ্বল অতীতকে ফিরে পেতে চেয়ে নিষ্ফল হয়েছেন।

আড়াইশোর বেশি ছোট গল্প লিখেছেন মন্টো। প্রায় বাইশটা সঙ্কলনে ধরা আছে সেগুলি। মন্টোর লেখক জীবনকে মূলত তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বটি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত—১৯৩৪ এবং ১৯৩৫ এই দু'টি সালকে ঘিরে। এ সময় মন্টো সবে লিখতে শুরু করেছেন।

পরবর্তী অধ্যায় ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। মাঝে দেড় বছর দিল্লিতে থাকা বাদ দিলে এই সময়ের পুরোটাই মন্টো বম্বেতে ছিলেন। এই সময় তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির জগৎ প্রথমতম ছিল। এই সময়কালের মধ্যে লেখা গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কালি শালোয়ার, ধুঁয়া, বু, হটক, খুশিয়া, বাবু গোপীনাথ, নয়া কানুন, চুগাধ, ডরপোক, বেগু, মিসরি কি ডালি, সূরজ কী লিয়ে, দশ রুপয়া, উস্ কা পতি। এর পাশাপাশি লিখেছেন রেডিও নাটক এবং চিত্রনাট্য।

তৃতীয় পর্বের শুরু ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫-তে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত, অর্থাৎ তাঁর পাকিস্তানের দিনগুলি। এ-সময় মন্টো দারিদ্রলাঞ্ছিত, উপেক্ষিত, স্বপ্নহত, বিমর্ষ, বিধ্বস্ত। পাশাপাশি দেশভাগের যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত। এ-সময় লেখা উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল : ১৯১৯ কী এক রাত, রাম খিলবান, সহায়, আখরি স্যালুট, টিটওয়াল কা কুত্তা, মোজেল, ঠান্ডা গোস্ত, গুলাব কী ফুল, টোবা টেক সিং, উপর নিচে আউর দরমিয়া, খোল দো, এবং পার্টিশনের ও দাঙ্গার উপর লেখা সিয়া হাশিয়ে রচনাগুচ্ছ। মৃত্যুর ঠিক আগের দিন লেখেন 'কবুতর অউর কবুতরি' গল্পটি।

শহিদ আহমেদ সম্পাদিত সাকী পত্রিকায় মন্টোর কালি সালোয়ার ও ধুঁয়া গল্প দুটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যে অশ্লীলতার দায়ে গল্পদুটিকে লাহোর সেশনস্ আদালতের কাঠগড়ায় তোলা হয়। প্রথমে গল্প দুটির পাশাপাশি গল্পলেখক, পত্রিকা সম্পাদক, প্রকাশক এমনকি মুদ্রকের বিরুদ্ধেও অভিযোগ জমা পড়ে আদালতে। মন্টো তখন দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া রেডিও-তে কর্মরত। ১৯৪৪-সালের ৫ ডিসেম্বর গুরগাঁও থানায় ডেকে পাঠিয়ে মন্টোকে গ্রেফতার করা হয়। পাঁচ পাতার একটি বয়ানে, আত্মপক্ষ সমর্থনে মটো লেখেন, 'নরনারীর সম্পর্কের ভেতর অশ্লীল বা কর্কশ কিছু থাকতে পারে না।... একমাত্র অসুস্থ মন ও শরীরের একজন মানুষই সাহিত্যে অসুস্থতার সন্ধান পেতে

~ www.amarboi.com ~

পারেন।' মন্টো-বিরোধীরা অবশ্য এ-গল্পদুটি নিয়ে লেখককে খুব বড় বিপদে ফেলতে পারে না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ওই একই বছরে বার্ষিক অদব-এ-লতিফ-এ প্রকাশিত বু গল্পটিতে অশ্লীলতা ও অপ্রয়োজনীয় যৌনতার দায়ে লাহোরের একটি বিশেষ কোর্টে আবার মামলা করা হয়। এই মামলাতেও যথেষ্ট নাস্তানাবুদ হতে হয় সদত হসন মন্টোকে। পাকিস্তানে পৌঁছানোর পর তাঁর প্রথম লেখা গল্প 'ঠান্ডা গোস্ত'। ছাপা হয় আরিফ আবদুল মতিন সম্পাদিত 'জাভেদ' পত্রিকায় ১৯৪৯-এর মার্চ সংখ্যায়। প্রকাশিত হবার কিছুদিনের পর এই গল্পটিকেও সাহিত্যে শুদ্ধতাবাদী পাকিস্তানি কট্টরপন্থীদের কোপে পড়ে আদালতের মুখোমুখি হতে হয়। এই গল্পের জন্যে মন্টোর কারাদণ্ডও ঘোষণা করা হয়। পাকিস্তানে তাঁর শেষ বছরগুলোতে আর একবার (এবার এই শেষবার) তাঁকে আদালতে হাজিরা দিতে হয়। উপর, নিচে আউর দরমিয়া গল্পে অশ্লীলতার অভিযোগে। সেবার পঁচিশ টাকা জরিমানায় মুক্তি পান মন্টো। বেয়াল্লিশ বছরের জীবনে বাইশ বছরের লেখকজীবন, তার মধ্যে গল্পসংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমার জেরে প্রায় দশ বছর অবিভক্ত ভারত ও পাকিস্তানের আদালতের গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়াতে হয় গত শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ উর্দু গল্পরচয়িতাকে।

জীবনের শেষ সাত বছরের মন্টো, অথৈ সমুদ্রের মধ্যে বাতিঘর ধসে পড়া, চোখের সামনে স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাওয়া, উদ্‌ভ্রান্ত, দিশেহারা, অতিরিক্ত মাত্রায় নেশাস কজন ভাঙাচোরা মানুষ। কবি মীর-এর ভাষায় 'লাহোরে মন্টো ঘুরে বেড়াতেন এদিক সেদিক উদ্দেশ্যহীনভাবে, অচেনা, অবাঞ্ছিতের মতো।' একদিকে এই তীব্র মানসিক অবসাদ তাঁকে উন্মাদের মতো লেখার দিকে টেনেছে। আবার এই লেখা তাঁকে সংসারে ক্রমবর্ধমান চাহিদার যোগান দিতে বিফল হয়েছে। স্ত্রী শফিয়া ও তিন মেয়ে নিঘাত, নজত ও নসরতকে নিয়ে সরু সুতোর উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয়েছে। ভাঙা মনে, ভাঙা শরীরে, যকৃতের অসুখে, মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে মারা যান সদত হসন মন্টো ১৯৫৫ সালের ১৮ জানুয়ারি, লাহোরে। মৃত্যুর পর মিয়াসাহেতার গোরস্থানে তাঁর বন্ধু ও শিক্ষক বারি আলিগের পাশেই স্থান হয় তাঁর।

সুদীপ বসু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও